কায়কোবাদ-সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা

(USAGE OF ARABIC WORDS AND ISLAMIC TRENDS IN KAIKOBAD - LITERATURE)

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত)

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আজম কুতুবুল ইসলাম নোমানী

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মুহাম্মদ রুহুল আমীন

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিঃ নং ৫০/২০১৫-২০১৬ (পুনঃ)

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

অক্টোবর, ২০১৯

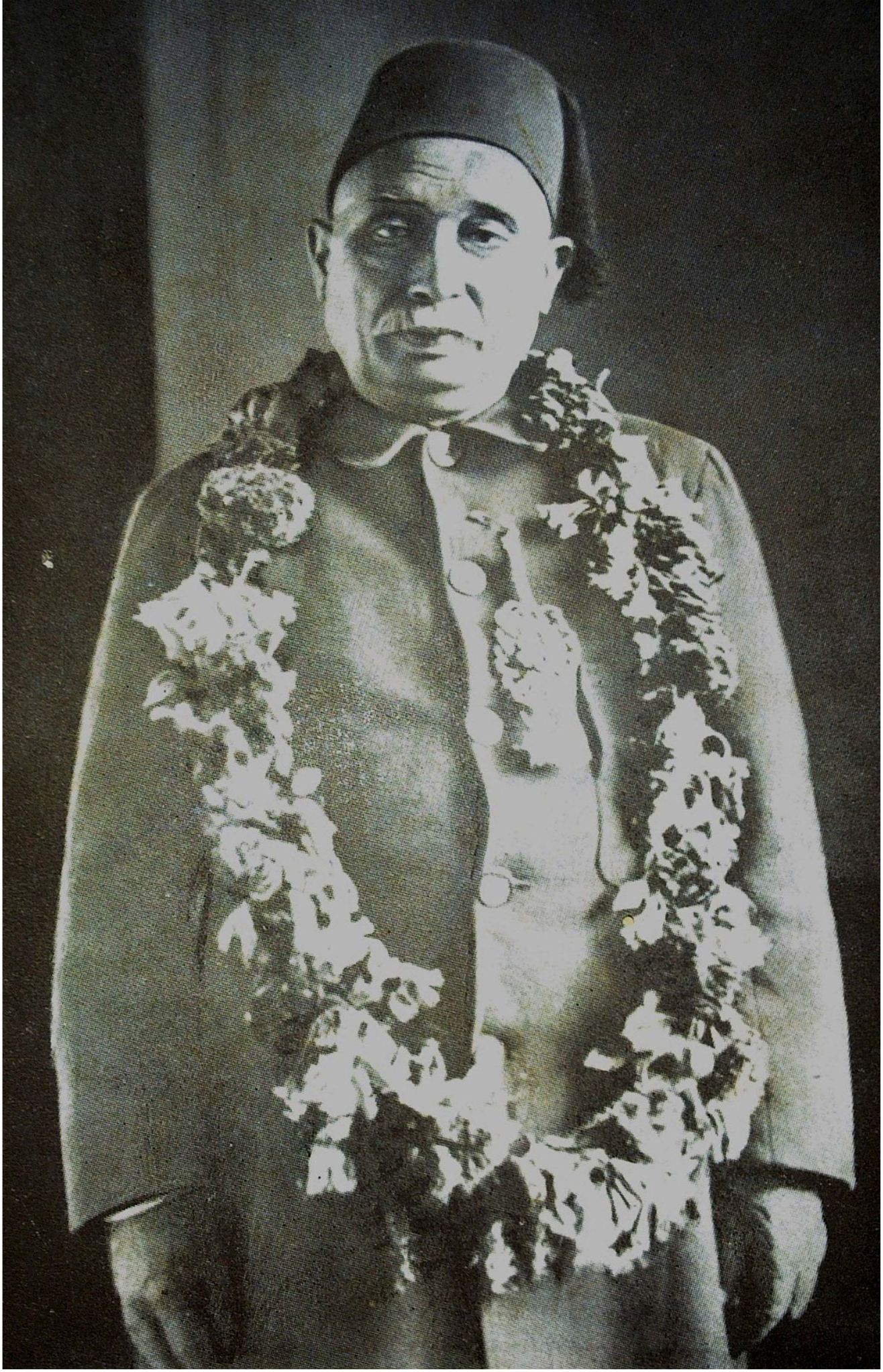

২৫ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭-২১ শে জুলাই ১৯৫১

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমীন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত **"কায়কোবাদ-সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভটির অত্যন্ত সন্তোষজনক। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **"কায়কোবাদ-সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা"** শীর্ষক সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানামতে এ শিরোনামে ইতঃপূর্বে কোথাও কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমি সম্পূর্ণ রূপে বা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশনার জন্য বা অন্যকোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং ৫০/২০১৫-২০১৬ (পুনঃ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁর অপার করুণা ও মেহেরবানীতে **"কায়কোবাদ-সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা সম্পন্ন হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি রাহমাতুল্লিল 'আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে মানুষ তার স্রষ্টার সন্ধান পেয়েছে। এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা হোসনেয়ারা বেগমকে, যার অশ্রু ও দু'আ আমার সকল সফলতার নিয়ামক। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন এবং আমাকে নিয়ে তাঁর সকল স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করুন। অনুরূপভাবে আমি স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মুহাম্মদ কঞ্চন আলীকে যার দু'আ আমার জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে পাথেয় হিসেবে কাজ করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নেক হায়াত ও মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নো'মানী স্যারের প্রতি, যিনি একজন প্রকৃত গবেষক, গবেষণা যার নেশা। তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহসহ সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যেপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রদান করেছেন। ফলে আমার এ গবেষণা কর্মটি যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউসুফ স্যারের প্রতি যিনি আমার থিসিস সম্পাদন করা এবং জমা দেয়া পর্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে সাহস যুগিয়েছেন। এ গবেষণা কর্মে তাঁর সৃজনশীল দিকনির্দেশনা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, যিনি এ অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্বাচন এবং

সম্পাদন সম্পন্ন করতে আমাকে সদা-সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, বিশেষত, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাদির, সহকারী অধ্যাপক ড. কামরুজ্জামান শামীম প্রমুখ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পরিবারের সদস্যবৃন্দের প্রতি, যারা আমাকে তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন।

আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার সহধর্মিনী ডা. শারমিন সুলতানাকে, যে সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম ভালবাসার ও স্নেহের দুই কন্যা নুয়াইরা আরওয়া ও নুসাইবা আযওয়া কে, গবেষণাকর্ম চলাকালীন সময়ে তাদেরকে স্নেহ, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছি।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রতি যারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সেবা দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। এছাড়া যেসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে আমি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি সে সব লেখকের অবদানও আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব কামরুল ইসলামকে সে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সাথে এ অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে আমাকে সহায়তা করেছে। আরো যারা আমাকে সহায়তা করেছে তাদের সকলের প্রতি রইল আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

গবেষক

মুহাম্মদ রুহুল আমীন

সংকেত পরিচয়

আল-কুরআন, ৩০ : ১৫: প্রথম সংখ্যা সুরাহর আর দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের

ই. ফা. বা. : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইবি : ইসলামী বিশ্বকোষ

সা. : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আ. : আলাইহিস সালাম

রা. : রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

রহ. : রহমাতুল্লাহি আলাইহি

হি. : হিজরী

খ্রি. : খ্রিস্টাব্দ

বাং : বাংলা

জ. : জন্ম

মৃ. : মৃত্যু

পৃ. : পৃষ্ঠা

দ্র. : দ্রষ্টব্য

সং : সংস্কৃত

খ. : খণ্ড

ড. : ডক্টর

অনূ : অনূবাদ বা অনূবাদক

সং : সংস্করণ/ সংখ্যা

বং : বঙ্গাব্দ

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালা ((الحروف الهجائية العربية এর বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অত্র অভিসন্দর্ভে অনুসৃত নিয়ম অনুসরন করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا=ء	উর্ধ্ব কমা’	ز	যা	ق	ক্বা
ب	বা	س	ছা	ك	কা
ت	তা	ش	শা	ل	লা
ث	ছা	ص	সা	م	মা
ج	জ্বা	ض	দ্বা	ن	না
ح	হা	ط	ত্বা	و	ওয়া
خ	খা	ظ	জা	ه	হা/হ্
د	দা	ع	‘আ	ي	ইয়া/য়া
ذ	যা	غ	গা/ঘা		
ر	রা	ف	ফা		

সূচীপত্র

ভূমিকা..... ০০১

প্রথম অধ্যায়ঃ মহাকবি কায়কোবাদের জীবনকথা.....০০৫-০৫০

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নাম ও বংশ পরিচয়..... ০০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ জন্ম ও শৈশব..... ০১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ শিক্ষা জীবন..... ০১৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ প্রেম ও পরিণয়..... ০১৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কর্মজীবন..... ০২৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন..... ০২৮

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ অনুপম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য..... ০৩৩

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ স্বীকৃতি ও সম্মাননা..... ০৩৭

নবম পরিচ্ছেদঃ কবি সর্ম্পকে বিশিষ্টজনের মন্তব্য..... ০৪৫

দশম পরিচ্ছেদঃ শেষ জীবন ও মৃত্যু..... ০৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ মহাকবি কায়কোবাদের সাহিত্যের পরিচয়.....০৫১-১১০

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সাহিত্যের পরিচয়..... ০৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের সাহিত্য ভাবনা..... ০৫৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের খণ্ড কাব্য বা গীতি কাব্য..... ০৫৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের কাহিনীকাব্য..... ০৭৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের চম্পু ও জীবনীকাব্য..... ১০৯

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কায়কোবাদের সাহিত্যে বিষয়বস্তু.....১১১-১৮০

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বিষয়বস্তুর ভূমিকা..... ১১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ প্রেম বা আধ্যাত্মিক কবিতা..... ১১৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নারী-প্রেম ও বিরহ..... ১২০

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ প্রকৃতির বিবরণ..... ১৫০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দেশপ্রেম ও জাতীয় জাগরণ..... ১৬১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: মানব প্রেম..... ১৬৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ: নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা..... ১৭৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ: দুনিয়াবিমুখতা..... ১৭৭

নবম পরিচ্ছেদ: শোকগাঁথা..... ১৮৯

দশম পরিচ্ছেদ: শোক গাঁথা শ্রেণিহীন কবিতা..... ১৮০

চতুর্থ অধ্যায়: কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার.....১৮১-২১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ: আরবী শব্দের ব্যবহার পরিচিতি..... ১৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দ..... ১৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্যাংশ..... ২০৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্য..... ২০৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কায়কোবাদের সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারের নমুনা.... ২১১

পঞ্চম অধ্যায়: কায়কোবাদ সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা.....২১৫-২৫৮

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ভাবধারার পটভূমি ও কায়কোবাদের ভাবনা..... ২১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: স্রষ্টার প্রশংসা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা..... ২২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামের স্তম্ভসমূহের বিবরণ..... ২২৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: মৃত্যু ও পরকালীন জীবনের বর্ণনা..... ২৩৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: মুসলিম পর্বসমূহের বর্ণনা..... ২৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: উপকার ও কল্যাণ কামনা..... ২৪৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ: ইসলামের কতিপয় অনুশাসনের বিবরণ..... ২৪৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ: ইসলামের গৌরব ও জাতীয় ঐতিহ্য..... ২৫৬

উপসংহার..... ২৫৯

গ্রন্থপঞ্জি..... ২৬১

ভূমিকা

মোহাম্মাদ কাজেম আল-কোরেশী কায়কোবাদ বাংলা সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী মাতার নাম জরিফ উন্নেসা। পিতৃ বংশের পূর্বপুরুষ হাফিজ উল্লাহ আল-কোরেশী দিল্লীর শাহী মসজিদের সহকারী ইমাম আর মাতৃ বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন মুঘল সম্রাট মহামতি আকবরের অন্যতম সেনাপতি। বংশীয় ঐতিহ্য নয়নাভিরাম আগলা পূর্ব পাড়া গ্রামের উদার ও মুক্ত পরিবেশে কায়কোবাদের শৈশব কাটে। গ্রামের অসাধারণ নৈসর্গিক সবুজ প্রকৃতি আর খরশ্রোতা ইছামতি নদীর উত্তাল ঢেউ কবির হৃদয়কে অভিভূত ও বিমুগ্ধ করেছিল। কায়কোবাদ জন্মেছিলেন এমন এক পরিবারে যেখানে জ্ঞানচর্চা ছিল পারিবারিক ঐতিহ্য। বংশ পরম্পরায় তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে সমসাময়িক বোদ্ধা মহলে সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিলেন। পিতার দিক থেকে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানের উত্তরাধিকার আর মাতার দিক থেকে পেয়েছিলেন শৌর্যবীর্য আর সাহসিকতার ঐতিহ্য। আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশ আর ইছামতি নদীর পাগল করা উত্তাল তরঙ্গ কায়কোবাদের হৃদয় মানসকে কাব্যিক হিসেবে গড়ে তুলেছিল। প্রতিবেশী জমিদার কন্যা গিরিবালা দেবীর সাথে কবির প্রণয় গড়ে ওঠে। গিরিবালার প্রেম কবির কাব্য প্রতিভাকে আরো বিকশিত করে। কবির এ প্রেম বিরহ আর বেদনায় পর্যবসিত হয়। কবি ভুলতে পারেননি প্রথম প্রেমের সুরভিত পরশ। বাল্যপ্রেমের সমাধি কবিকে উদাসীন করেছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তা আর ভোলেননি। বহু কবিতায় বেদনাহত কবির ব্যকুল হৃদয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে। কবিতার পঙক্তিতে বৃষ্টির ফোটার ন্যায় ঝরে পড়েছে কবি হৃদয়ের দুঃখ আর বেদনা। ঢাকা মাদরাসার অধ্যক্ষ স্যার ওবায়দুল্লাহ আল-ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫) ছিলেন কায়কোবাদের প্রিয় শিক্ষক। তিনি তাকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি ছিলেন কাব্যরসিক, জ্ঞানতাপস ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। কবি প্রিয় শিক্ষকের প্রভাবেও কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঢাকা মাদরাসায় অধ্যয়নকালে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও হেমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৯০৩) কবিতার সাথে পরিচিত হন। এরপর তিনি নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) কবিতার প্রেমে পড়েন । এঁদের রচনার

প্রভাবে কায়কোবাদ কবি হয়ে উঠতে থাকেন। এক সময় অনুরাগী থেকে নিজেই আবির্ভূত হন শক্তিমান কবি হিসেবে - লিখে ফেলেন 'মহাশ্মশান'-এর মতো মহাকাব্য। কায়কোবাদ মোট তেরটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে পাঁচটি খন্ড কবিতার সংকলন। এগুলো হচ্ছে: বিরহ বিলাপ (১৮৭০), কুসুম কানন (১৮৭৩), অশ্রুমালা (১৮৯৬), অমিয় ধারা (১৯২৩) ও প্রেমের ফুল (১৯৪৬)। কায়কোবাদের কাহিনী কাব্যের সংখ্যা ছয়টি। এগুলো হচ্ছে: মহাশ্মশান (১৯০৫), শিব মন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯২১), মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩), শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮), প্রেমের রাণী (১৯৭০) ও প্রেম পারিজাত (১৯৭০) । কায়কোবাদ ছিলেন সচেতন স্বভাব কবি। কবিতাই ছিল তাঁর ভালোবাসা, কবিতাই ছিল প্রাণ। সুদীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন – কাব্য রচনাও করেছেন বিস্তর। বাংলা সাহিত্য বিনির্মাণকালে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তাঁর যথার্থ দায়িত্ব পালন করে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। কায়কোবাদের কাব্য প্রতিভা এবং এর মূল্যায়নের চেয়ে তিনি কখন এবং কোন ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম মুসলিম কবি যিনি দোভাষী পুঁথি সাহিত্য থেকে বেরিয়ে শুদ্ধ বাংলায় কবিতা নির্মাণ করেছেন। কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে তিনি পথিকৃত হিসেবে আবির্ভূত হন। বিশেষত মহাকাব্যে তিনিই প্রথম আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ঐতিহ্য চেতনা কায়কোবাদের কাব্যের আরেকটি দিক। মুসলিম জাতিসত্ত্বার পতনোম্মুখ অবস্থা তিনি অবলোকন করে ব্যথিত হয়েছেন। তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণের সাথে ঝরে পড়েছে বেদনা বিধুর পঙ্‌ক্তিমালা। তাঁর ঐতিহ্য চেতনা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আঘাত করেনি। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐতিহ্য চেতনা – দুটিই সমান্তরালভাবে তাঁর কাব্যে লক্ষ্যণীয়। কবির কাব্যে ইসলামী ভাবধারাও ফুটে উঠেছে অসাধারণ মহিমায়। বাংলা সাহিত্য নির্মাণকালে কায়কোবাদ মুসলিম সমাজের শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রতিনিধি হিসেবেই সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এমন একজন কবিকে নিয়ে গবেষণা হয়নি বললেই চলে। বিশেষ করে কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা নিয়ে আমার জানা মতে আজ পর্যন্ত কেউ গবেষণা করেনি। অথচ তিনিই বাংলা কবিতায় আরবী শব্দের সার্থক প্রয়োগ করেছিলেন এবং ইসলামী ভাবধারাকে কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। অতএব এটা সময়ের দাবি যে, 'কায়কোবাদ-সাহিত্যে আরবী শব্দের

ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা' নিয়ে গবেষণা হওয়া। এরই প্রেক্ষিতে এ গবেষণাকর্মটি প্রণিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মহাকবি কায়কোবাদের জীবনকথা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়টি নয়টি পরিচ্ছেদে সাজানো। পরিচ্ছেদগুলোর শিরোনামগুলো হচ্ছে, নাম ও বংশ পরিচয়, জন্ম ও শৈশব, শিক্ষা জীবন, প্রেম ও পরিণয়, কর্মজীবন, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, অনুপম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, স্বীকৃতি ও সম্মাননা, কবি সর্ম্পকে বিশিষ্টজনের মন্তব্য, শেষ জীবন ও মৃত্যু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁর রচনাবলীর উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি আটটি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। এ অধ্যায়ে সাহিত্যের পরিচয়, কায়কোবাদের সাহিত্য ভাবনা, প্রথম পর্ব বা উন্মেষ পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব বা আখ্যান পর্ব, তৃতীয় পর্ব বা বৈচিত্র পর্ব, কায়কোবাদের খণ্ড কাব্য বা গীতি কাব্যের পাঁচটি বইয়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কায়কোবাদের কাহিনীকাব্যের ছয়টি বইয়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত আলোচনা, চম্পু ও জীবনীকাব্যের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বিদৃত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কবি কায়কোবাদের কবিতার বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি নয়টি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। এ অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে সে গুলো হচ্ছে, খোদা প্রেম বা আধ্যাত্মিক কবিতা, নারী-প্রেম ও বিরহ, প্রকৃতির বর্ণনা, দেশপ্রেম ও জাতীয় জাগরণ, মানবপ্রেম, নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, দুনিয়াবিমুখতা, শোকগাঁথা, শ্রেণিহীন কবিতা ইত্যাদি।

চর্তুথ অধ্যায়ে কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার সর্ম্পকে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। এ সব পরিচ্ছেদের শিরোনামগুলো হচ্ছে, কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দ, কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্যাংশ, কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্য, কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারের নমুনা।

পঞ্চম অধ্যায়ে কায়কোবাদ কাব্যে ইসলামী ভাবধার বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়টি আটটি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। পরিচ্ছেদগুলো হচ্ছে, ইসলামী ভাবধারার পটভূমি ও

কায়কোবাদের ভাবনা, স্রষ্টার প্রশংসা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা, ইসলামের স্তম্ভসমূহের বিবরণ, মৃত্যু ও পরকালীন জীবনের বর্ণনা, মুসলিম পর্বসমূহের বর্ণনা, উপকার ও কল্যাণ কামনা, ইসলামের কতিপয় অনুশাসনের বিবরণ ও ইসলামের গৌরব ও জাতীয় ঐতিহ্য। অতঃপর উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি দিয়ে অভিসন্দর্ভটির সমাপ্তি টানা হয়েছে।

আমার প্রত্যাশা, এ গবেষণাকর্মটি বাংলাভাষী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকগণের নিকট কবি কায়কোবাদ ও তাঁর সাহিত্য, তাঁর সাহিত্যে আরবী শব্দ প্রয়োগ ও ইসলামী ভাবধারা সম্পর্কে নতুন গবেষণার পথ দেখাবে। সে সাথে সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও বিদগ্ধ পাঠক জানতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমার জ্ঞান ও যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা, মানবীয় স্বভাবজাত ভুল-ত্রুটি এবং গবেষণার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান সত্ত্বেও এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের দ্বারা পাঠকগণ সামান্যতম উপকৃত হলে নিজের শ্রম সফল ও সার্থক হবে বলে মনে করি।

প্রথম অধ্যায়ঃ

মহাকবি কায়কোবাদের জীবনকথা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নাম ও বংশ পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ জন্ম ও শৈশব

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ শিক্ষা জীবন

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ প্রেম ও পরিণয়

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কর্মজীবন

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পরিবার ও পারিবারিক জীবন

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ অনুপম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ স্বীকৃতি ও সম্মাননা

নবম পরিচ্ছেদঃ কবি সর্ম্পকে বিশিষ্টজনের মন্তব্য

দশম পরিচ্ছেদঃ শেষ জীবন ও মৃত্যু

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম ও বংশ পরিচয়

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরশী।[১] কায়কোবাদ তাঁর কলমী নাম। এ নামেই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত।[২] এ নামের আড়ালেই কবির প্রকৃত নাম ঢাকা পড়ে যায়।[৩] উৎসর্গ পত্রে কবি তাঁর কাব্য নামকে আরো সংক্ষিপ্ত করে অর্থাৎ শুধু 'কোবাদ' লিখতেন।[৪] কবির উপাধি ছিল কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন। এ উপাধিগুলো নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ তাঁকে প্রদান করেছিল।[৫] কবি কায়কোবাদের উপর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৬] মাইকেলের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করে কায়কোবাদ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। এজন্য তাকে 'মাইকেল দি সেকেন্ড'ও বলা হতো।[৭] কবির নামের শেষে কোরেশী শব্দটি মূলতঃ তাঁর বংশীয় পরিচয়। তাঁর পূর্বপুরুষগণ আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশীয় ছিলেন।[৮] এ বংশটি আরব উপদ্বীপের হিজাজের একটি বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত গোত্র। পবিত্র মক্কা নগরী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল তাদের আবাসভূমি। ফিহর ইব্ন মালিক ইব্ন নাদরের উপাধি ছিল কুরাইশ। তাঁর থেকেই এ বংশের নামকরণ করা হয়।[৯] মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এ বংশেই জন্মগ্রহণ করেন।[১০] এর একটি

---

১. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ* (ঢাকা: নাজিম এন্টারপ্রাইজ এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১৪; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ১৪০; ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭; এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৫

২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪০; এম এ মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

৩. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৪. আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), *কায়কোবাদ রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৬০; এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৫. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, *ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪০,

৭. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৯, পৃ. ৫৫

১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭; আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারাকপুরী, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, *আর রাহিকুল মাখতুম* (লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, ২০১৩ খ্রি.), ২১ তম প্রকাশ, পৃ. ৭৪

শাখা বাগদাদ ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো। সেখান থেকে মুঘল সম্রাট শাহজাহান (১৫৯২-১৬৬৬) এর রাজত্বকালে তাঁরা দিল্লী এসে বসতি স্থাপন করেন।[১১] তবে গবেষক এম.এ মজিদের মতে কবি কায়কোবাদের পূর্বপুরুষগণ পারস্য থেকে দিল্লী আগমন করেন।[১২] এ মতটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ কবি প্রদত্ত বংশ পরিচয় থেকে জানা যায় যে, কবির পূর্বপুরুষগণ আরবী ও ফারসী ভাষার পণ্ডিত ছিলেন এবং জ্ঞান সাধনায় তাঁরা ছিলেন অগ্রগামী।

কবির পুর্বপুরুষগণ কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করেন তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। জীবিকা অথবা ইসলামপ্রচারের উদ্দেশ্য হতে পারে। তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম চর্চার উপযুক্ত স্থান ছিল দিল্লী। ফলে জ্ঞান সাধনার অনন্য স্পৃহা নিয়ে তাঁরা দিল্লী আগমন করেন পারেন বলে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মত পোষণ করেছেন।[১৩]

দিল্লীতে আগমনকারী পূর্বপুরুষদের মধ্যে হাফিজুল্লাহ আল-কোরেশী ছিলেন কবির পঞ্চম উর্ধ্বতন পুরুষ। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের খবর সম্রাট শাহজাহানের দরবারে পৌঁছে যায়। সম্রাট তাঁকে রাজদরবারে ডেকে পাঠান এবং কথা বলে তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তারই নির্মিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি দিল্লীর শাহী মসজিদের সহকারী ইমাম পদে নিযুক্ত করেন।[১৪] তিনি আজীবন কৃতিত্বের সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। হাফিজুল্লাহ আল-কোরশীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এনায়েতুল্লাহ আল-কোরেশী পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় সুষ্ঠুভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে দিল্লীতেই জীবন অতিবাহিত করেন। কুরাইশ বংশের এ সকল ব্যক্তিবর্গ দিল্লীর সম্রাটের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এনায়েতুল্লাহ আল-কোরশীর পুত্র মোহিব উল্লাহ আল-কোরেশী দিল্লীর সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা ও পিতা-পিতামহের সূত্রেপ্রাপ্ত মর্যাদাপূর্ণ নিশ্চিত জীবন ছেড়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন।[১৫] তিনি দিল্লীর সম্মান ও নিশ্চিত দরবারী জীবন থেকে

---

১১. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৩. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

১৪. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

বাংলাদেশের অজপাড়ার সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনকেই প্রাধান্য দেন। এর মূল কারণ ছিল ইসলামের প্রচার ও নিরিবিলি অনাড়ম্বর জীবন-যাপন। কেননা, সে সময় মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও বহুবিধ বিশৃংখলা এবং বিদ্রোহ দিল্লীর বাতাসকে দূষিত করে তুলে ছিল। মোহিব উল্লাহ আল-কোরেশী বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় গোড়াইল নামক গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। মোহিব উল্লাহ আল-কোরশীর পুত্র নেয়ামত উল্লাহ আল-কোরেশী আরবী এবং ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জ্ঞান গরিমা ও অনুপম চরিত্র মাধুরীতে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর পুত্র শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী। শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশীর পুত্রই আমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মহাকবি কায়কোবাদ। কবি নিজেই এ সব তথ্যের অনুকূলে ‘স্মৃতি লিপি’ নামক কবিতা রচনা করেন। যেমন:

কায়কোবাদের জন্মভূমি

আগলা পূর্বপাড়া

ইছামতি নদীর তীরে

সকল গ্রামের সেরা

পিতা তাহার এমদাদ আলী

জরিফ উন্নেসা মাতা

গোড়াইল তাহার পৈত্রিক ধাম

তাঁহার জন্ম হেথা।[১৬]

কবি নিজেই তাঁর বংশ লতিকা তৈরি করেছেন এভাবে:

হাফিজ উল্লাহ আল-কোরেশী

⇩

১৬. এম. এ. মজিদ, মহাকবি কায়কোবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

এনায়েত উল্লাহ আল-কোরেশী

মোহিব উল্লাহ আল-কোরেশী

নেয়ামত উল্লাহ আল-কোরেশী

শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী

মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরেশী ।[১৭]

কায়কোবাদের পিতা শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। তিনি প্রথমে ফরিদপুরের ভাঙা কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। সেখানে ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত সফলতা না পাওয়ায় ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার জয়কৃষ্ণপুরে চলে আসেন।[১৮]পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু জয়কৃষ্ণপুরে ফরিদপুরের মুন্সেফ কোর্টঅবস্থিত ছিল। শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী এখানে প্র্যাক্টিস শুরু করেন।[১৯]

কবির পিতা শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী খাঁপুরা গ্রামের রাজা মনির উদ্দীন খাঁ ঠাকুরের এক কন্যাকে বিয়ে করেন। বিয়ের অল্পদিন পর স্ত্রীর মৃত্যুঘটে। অতঃপর তিনি মহিমপুরা গ্রামের খোন্দকার বাড়ির খোন্দকার সাদ উদ্দীন সাহেবের কন্যা আছিয়া খাতুনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় স্ত্রীকে গোড়াইলে রেখে তিনি জয়কৃষ্ণপুরের মুন্সেফ কোর্টে প্র্যাক্টিস করছিলেন। এ কোর্টে প্র্যাক্টিসরত দু'জন মুসলিম আইনজীবীর সাথে তাঁর অসাধারণ হৃদ্যতার

১৭. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৮. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

সৃষ্টি হয়। তাঁরা হলেন মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা মুক্তার নবাবগঞ্জের আগলা পূর্বপাড়ার দৌলত চৌধুরী আর অপরজন দোহার এর সাইন পুকুর গ্রামের উকিল ওসমান ভুঁইয়া।

এখানে আসার কিছুদিন পর শাহমতউল্লাহ আল-কোরশীর জীবনে আবার পারিবারিক দুর্যোগ নেমে আসে। সংবাদ আসে দ্বিতীয় স্ত্রী আছিয়া খাতুন ইন্তেকাল করেছেন। তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং দু' দু'বার সংসার বিপণ্ন হওয়ায় মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। সেই সাথে যুক্ত হয় বিয়ের উপযুক্ত বোনকে পাত্রস্থ করার বিষয়টি।

শাহমত উল্লাহ আল-কোরশীর এ দুঃসময়ে এগিয়ে আসেন সহকর্মী ওসমান ভুঁইয়া। আগলা পূর্বপাড়ার দৌলত চৌধুরীর বিবাহযোগ্য পুত্র ও কন্যা ছিল। পুত্রের নাম আমজাদ আলী চৌধুরী আর কন্যার নাম জরিফ উন্নেসা। ওসমান ভুঁইয়ার মধ্যস্থতায় শাহমত উল্লাহ আল-কোরশীর সাথে জরিফ উন্নেসা এবং আমজাদ আলী চৌধুরীর সাথে শাহমত উল্লাহ আল-কোরশীর বোন জমির উন্নেসার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়।[২০]

শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী তাঁর পূর্বপুরুষের পাণ্ডিত্য, সততা ও অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারী ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। বিয়ের আসরে তিনি নিজেই তাঁর বিয়ের কাবিননামা লিখেছিলেন। ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কেউ কাজটি করতে সাহস করেননি। পরবর্তীকালে কবি কায়কোবাদ এই কাবিননামাটি এবং পিতার স্বহস্তে লিখিত একখানা কোরআন মাজীদ স্বযত্নে সংরক্ষণ করেছিলেন।[২১]

উল্লেখ্য কায়কোবাদের মাতা জরিফ উন্নেসার পূর্বপুরুষ ছিলেন সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি শাহবাজ খান। তাঁর বংশ লতিকা নিম্নরূপ:

শাহবাজ খাঁ

⇩

আলী মুরাদ খাঁ

⇩

২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

২১. দেওয়ান আব্দুল্লাহ হাফিজ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৭

কালে খাঁ বা কালু খাঁ

জমিদার আলী আকবর খাঁ চৌধুরী

দৌলত চৌধুরী

জরিফ উন্নেসা+স্বামী: শাহমতউল্লাহ আল-কোরশী

মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরেশী কায়কোবাদ[২২]

বিয়ের পর কবির পিতা ফরিদপুর থেকে স্থায়ীভাবে আগলা পূর্বপাড়ায় চলে আসেন এবং স্বস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অপর দুই ভাই ও এক বোন জন্মগ্রহণ করেন। কবির নানা দৌলত চৌধুরী দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যার জনক ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কন্যা জরিফ উন্নেসা কবির মাতা। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমজাদ আলী চৌধুরী কবির মামা ও ফুফা। আর কনিষ্ঠ পুত্র হেদায়েত আলী চৌধুরীর কন্যা তাহের উন্নেসার সাথে পরবর্তীতে কবির বিয়ে সম্পন্ন হয়। সেই সূত্রে তিনি কবির মামা ও শ্বশুর ছিলেন।

২২. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম ও শৈশব

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে শাহমত উল্লাহ আল-কোরেশী ও জরিফ উন্নেসা খাতুনের ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন মুসলিম ভারতের গৌরব মহাকবি মোহাম্মদ কাজেম আল-কোরেশী কায়কোবাদ।[২৩] কায়কোবাদের জন্ম সন নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। দেওয়ান আব্দুল হামিদ, আব্দুল লতিফ চৌধুরী, এ কে এম আমিনুল ইসলাম, কাজী দীন মুহাম্মদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রত্যেকে ১৮৫৭ সনকে কায়কোবাদের জন্ম সন হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৪] বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপুঞ্জি, চরিতাভিধান, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা পিডিয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষে কায়কোবাদের পরিচিতিতেও জন্ম সন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।[২৫]মুহাম্মদ আব্দুল হাই, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন ও আহমদ শরীফের মতে তাঁর জন্ম ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে।[২৬] আনিসুজ্জামানের মতে কায়কোবাদের জন্ম সন ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দ।[২৭] সুকুমার সেনের মতে

---

২৩. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

২৪. দেওয়ান আব্দুল হামিদ, সম্পা. আব্দুস সাত্তার, *ছোটদের জীবনীগ্রন্থ* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫১; আব্দুল লতিফ চৌধুরী, *কায়কোবাদ* (খুলনা: অরিয়েন্টাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৫ খ্রি.), ২য় সং, পৃ. ১; এ কে এম আমিনুল ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য* (ঢাকা: বুক স্টল, ১৯৬৯ খ্রি.), ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৪৯; কাজী দীন মুহাম্মদ, *সাহিত্য সম্ভার* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ৬০; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২৫১; মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা সমকালের দর্পণে* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১০৭; আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *ভূমিকা*, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

২৫. *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭১; আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫৫; শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), *চরিতাভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৯; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলা পিডিয়া* (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, খ. ৩, পৃ. ১২; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪০

২৬. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন, *কায়কোবাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮৫; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪০

২৭. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৩ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২২৪

তাঁর জন্ম ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ।[২৮] আবুল ফজল তাঁর জন্ম সন ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৯] এটি তিনি কবির লিখিত খণ্ড আত্মজীবনী তথা মহাশ্মশানের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে গ্রহণ করেছেন। তবে কবির এ আত্মজীবনীর তথ্যটি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমনকি মহাশ্মশানের ৪র্থ সংস্করণ থেকে তা আর মুদ্রিতও হয়নি। কবি তাঁর খণ্ড আত্মজীবনীতে 'খুব সম্ভব' শব্দ দুইটি ব্যবহার করে বক্তব্যটিকে সংশয়মুক্ত করতে পারেননি। তিনি লিখেছেন 'এখানে ঢাকায় খুব সম্ভব ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম।'[৩০] কবি অন্যত্র তাঁর জন্ম সন ১২৬৬ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১] এ সূত্রে অনেকে ১২৬৬বঙ্গাব্দ তথা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের কথাও বলেছেন।[৩২] কায়কোবাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ও দেওয়ান আব্দুল হামিদ সাহিত্যরত্ন (১৯২৪-১৯৮৯)। দেওয়ান আব্দুল হামিদ কবির খণ্ড জীবনীতে উল্লেখিত জন্ম সন ১৮৬৩ খিস্টাব্দকে মূদ্রণ প্রমাদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] দেওয়ান আব্দুল হামিদ বলেন, মহাকবি স্বয়ং বলেছেন: "যে বছর সিপাহী যুদ্ধ সংগঠিত হয়, সে বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম।"[৩৪] দেওয়ান আব্দুল হামিদ মহাকবি কায়কোবাদের স্নেহধন্য ভাবশিষ্য হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তিনি কবির বহূ পাণ্ডুলিপি নিজ হাতে তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি শুধু কবির সান্নিধ্য লাভ করেননি, বরং তিনিই কবিকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি লেখালেখি ও গবেষণা করেছেন।[৩৫] তিনি যখন ১৮৬৩ কে মূদ্রণ প্রমাদ মনে করছেন এবং ১৮৫৭ সালকেই জন্ম সাল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন বিষয়টির সমাধান এখানেই হতে পারে বলে আমরা মনে করি। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কবির খুবই প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দকে কবির জন্ম সন উল্লেখ করলেও পরবর্তীতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দকেই গ্রহণ করেছেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে কবি জানিয়েছিলেন যে, তাঁর

---

২৮. সুকুমার সেন, *বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (কলিকাতা: ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), ৩য় সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ৪৬৪

২৯. আবুল ফজল (সম্পাদিত), *কাব্য সংকল:* কায়কোবাদ (চট্টগ্রাম: বাংলা একাডেমীর পক্ষে বইঘর, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৪

৩০. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৩১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৩৩. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭

জন্ম ১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস রবিবার।[৩৬] কবির মৃত্যুর পর 'মাহে নও' পত্রিকায় নিম্নোক্ত মন্তব্য লক্ষ্যণীয়, কায়কোবাদ ১৮৫৭ সালে ঢাকা জেলার আগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর।[৩৭] কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসার ও এম. এ. মজিদ কবির জন্ম সাল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করেছেন। ফাতেমা কাওসার তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'কায়কোবাদ: কবি ও কবিতায়' এ সম্পর্কে বলেন: "প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটি যথার্থভাবে প্রমাণিত হয় যে, কায়কোবাদের জন্ম ১২৬৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের জুন মাস। কবির জীবিত কাল ৯৪ বছর দুই মাস প্রায়।[৩৮]"

কবির শৈশব কেটেছে আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে। এখানকার অসাধারণ নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির হৃদয়কে কাব্যিক হিসেবে তৈরি করেছে। আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের সবুজ প্রকৃতি, উদার মুক্ত পরিবেশ আর খরস্রোতা ইছামতী নদীর আকর্ষণ কবির ছোট্ট হৃদয়কে অভিভূত করেছিল। আগলা গ্রামে মাতা-পিতার স্নেহ-বাৎসল্যে কবির শৈশবের দিনগুলো ভালই কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৮৬৯ সালে কবির পরম মমতাময়ী মাতা জরিফ উন্নেসা খাতুন পরপারে যাত্রা করেন।[৩৯] কবির তখন তিন ভাই এক বোন। কবির বয়স ১১ বছর এবং ভাই বোনদের বয়স যথাক্রমে আজিজুন্নেসার ৯, আব্দুল বারীর ৭ ও আব্দুল খালেকের বয়স ৫ বছর। মাতৃহারা সন্তানদের নিয়ে শাহমতউল্লাহ আল-কোরেশী চরম অসহায় অবস্থায় পতিত হন এবং এরই সাথে শ্বশুর বাড়ীর অমানবিক অসদাচরণের সম্মুখীন হন। বারবার পত্নী বিয়োগ, প্রিয়জনদের অসহযোগিতা ও অবুঝ অসহায় সন্তানদের দুঃখ ও বেদনাহত মুখগুলো তাঁকে চিন্তিত ও হতাশ করে তোলে। যার ফলে সহসাই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৮৭০ সালে তিনিও চলে যান না ফেরার দেশে।[৪০]

---

৩৬. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জুলাই, ১৯৬৬ খ্রি.

৩৭. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৫১ খ্রি./ ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১১৬

৩৮. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩৯. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, ৮৫

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা জীবন

কবির প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি হয় নিজ পরিবারেই। আরবী পড়ার মাধ্যমে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাজীবন। কবির পিতার ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র পিতা ও পিতামহের মতো আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত হবে।[৪১] তখন ঢাকায় উল্লেখযোগ্য চারটি স্কুল ছিল। যথা: জগন্নাথ স্কুল, পগোজ স্কুল, কোর্ট গ্রেগরী স্কুল ও মুসলিম হাই স্কুল। পারিবারিক পরিমণ্ডলে আরবী শিক্ষার পর তিনি এ চারটি স্কুলেই অধ্যয়ন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর কবি এবং তাঁর ভাই আব্দুল বারী ঢাকার মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হন। ডাফরিন হোস্টেলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৪২] স্কুলের ধরা-বাধা নিয়ম কানুন কবির একেবারেই ভালো লাগত না। পাঠ্য পুস্তকের চেয়ে অন্যান্য বইয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি। স্কুলের নিয়ম কানুন ভঙ্গ করতে তাঁর খুবই ভাল লাগতো। প্রাকৃতিক নৈসর্গিকদৃশ্য তাঁকে আকৃষ্ট করতো। তাই কবি স্কুল থেকে পালিয়ে রমনার সবুজ বনানীর স্নিগ্ধ, সুশীতল ও নির্জন পরিবেশে সময় কাটাতেন এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে কাব্যচর্চা করতেন। এভাবেই আস্তে আস্তে তাঁর মাঝে কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।

অসাধারণ মেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভালো ছাত্র হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। কেননা তিনি ছিলেন একজন অমনোযোগী ছাত্র। এ বিষয়ে তিনি কুসুম কানন কাব্যে 'শৈশব কাহিনী' নামক কবিতায় বলেন:

প্রাণাধিক পিতা মোরে বাঁধিয়া ছাদিয়া জোরে,
বড় এক পাঠশালে দিয়াছিল পড়িতে।
গুরু মহাশয় কত রোষ ভরে অবিরত
পিঠ ফাটাইয়া দিত কসা কসা বাড়িতে।
আমিও সময় পেলে পুস্তক সেলেট ফেলে
পলাতেম চুপে চুপে গোল্লাছুট খেলিতে।
আবার বৃষ্টি পয়ে, ভিজায়ে বসনচয়ে
শিক্ষকেরে ফাঁকি দিয়া, আসিতাম বাড়ীতে।[৪৩]

৪১. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৪২. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, পৃ. ২৯০
৪৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ভূমিকা, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৮৫

কবির মাতা জরিফ উন্নেসার মৃত্যুর এক বছর পর ১৮৭০ সালে কবির পিতা শাহমতউল্লাহ আল-কোরেশী ওরফে এমদাদ আলী মৃত্যু বরণ করেন।[৪৪] ফলে কবি ছোট ভাই বোনদের নিয়ে চরম বিপাকে পড়েন। তাঁর পড়ালেখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কবি অবস্থান করতে থাকেন আগলা পূর্বপাড়ায়। আগলাতে এক বছর কাটিয়ে কবি ঢাকা মাদরাসায় ভর্তি হন। এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতার বন্ধু ডা. আজিমজান আর্থিক সহযোগিতা করেন। কবি হোস্টেলে অবস্থান করে লেখাপড়া করতে থাকেন। মাদরাসা বোর্ডিংয়ে থাকতে হলে তখন শরাফতের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হতো। কেননা তৎকালীন সময়ে শরীফ বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদেরই মাদরাসা বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা ছিল। ঢাকার নওয়াব পরিবারের মীর্জা ক্বলবে আলী এবং ঢাকার জমিদার চামারা মীর্জা কবির অনুকূলে শরাফতের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন।[৪৫]

ঢাকা মাদরাসায় একবার তাঁকে শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি মাদরাসা বোর্ডিংয়ে থাকা অবস্থায় এক শিক্ষককে অন্যায় কাজ করতে দেখে ভর্ৎসনা করেন। নিজ শিক্ষার্থীরএই তিরস্কার তাকে দারূণ ব্যথিত করে। তিনি এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে কবিকে কিছু না বললেও প্রতিশোধ নেয়ার মানসিকতা থেকে পিছু হটেননি। কিছু দিন পর তিনি সামান্য অজুহাতে কবির উপর অনাহূত শাস্তি চাঁপিয়ে দেন। শাস্তি হিসেবে কবিকে পরের দিন বোর্ডিংয়ে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং কোন প্রকার খাবার দেওয়া হবে না। সেই সাথে এক টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। কবি এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং বোর্ডিং ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (১৮৯২-১৯৬৩) পিতা বিচারপতি জাহিদুর রহিম জাহিদ সোহরাওয়ার্দী(১৮৭০-১৯৪৯) কবির সহপাঠী ছিলেন। মাদরাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন ডা. লে. কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দীর (১৮৮৪-১৯৪৬) পিতা ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৫)। তিনি কবির সহপাঠী জাহিদ সোহরাওয়ার্দীর চাচা ছিলেন। অধ্যক্ষ মহোদয় কবিকে বিশেষ স্নেহ করতেন। বিষয়টি তাঁর কর্ণগোচর হলে কবির উপর উপর্যুক্ত দণ্ডাদেশ রহিত করেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষককেই বোর্ডিং থেকে বিতাড়িত করেন।[৪৬]

পিতা-মাতার মৃত্যু ও প্রিয়জনদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ কবির হৃদয় মানসে চরম আঘাত হানে। কবির ছোট বোন আজিজুন্নেসার বিয়ে হয় বিক্রমপুরের খিলগাঁও নিবাসী ফরিদপুরের কার্তিকপুর স্টেটের নায়েব মুনশী নাছির উদ্দীনের সুযোগ্য পুত্র মুনশী আফতাব উদ্দীনের সাথে। মুনশী আফতাব উদ্দীন যেমন ছিলেন সুদর্শন যুবক তেমন মার্জিত রুচি ও উন্নত

৪৪. এম. এ মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৫. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

চরিত্রের অধিকারী। শিক্ষিত ও চৌকস এ তরুণ মোক্তারের সাথে আজিজুন্নেসার বিয়ের সিদ্ধান্ত কবির পিতাই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৭১ সালে ১০/১১ বছর বয়সে আজিজুন্নেসা ও আফতাব উদ্দীনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়।[৪৭]

বোনের বিয়ের পর কবি আরো একাকী হয়ে পড়েন। সেই সাথে যুক্ত হয় নানা বাড়ীর একান্ত প্রিয়জন কর্তৃক লোভ ও স্বার্থপরতার এক অচিন্তনীয় নাটক। কাব্য প্রীতি, কল্পনা বিলাসী ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর কবির সরলতা ও বৈষয়িক জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতা পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। বেহাত হয়ে যায় প্রিয়জন কর্তৃক পৈত্রিক সহায়-সম্বল। সহজ-সরল কবি হেরে যান জীবন ও জগতের রূঢ় বাস্তবতার কাছে। আর্থিক সংকট তীব্র আঘাত হানে কবির জীবনে। এ সময় ভগ্নীপতি কবির প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। প্রিয় জন্মভূমি আগলা পূর্বপাড়া ত্যাগ করে ছোট দুই ভাইকে নিয়ে কবি বোনের শ্বশুর বাড়ি খিলগাঁও গিয়ে বসবাস করতে থাকেন।[৪৮]

কবি জীবনের নির্মম কঠোর বাস্তবতার কারণে এন্ট্রাস পরীক্ষার পূর্বেই লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের এখানেই ইতি ঘটে। শুরু হয় জীবনের আরেক অধ্যায় তথা বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম।[৪৯] কবি এক আলাপচারিতায় লেখা-পড়ায় তাঁর অমনোযোগ ও সহপাঠীদের বিষয়ে বলেন:

> "...কবিতার নেশায় পড়িয়া লেখা-পড়া শিক্ষা করিতে পারি নাই। স্কুলে বহি নিয়া গিয়াছি আর ফিরিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টি বাদলের দিনে ইচ্ছা করিয়া কাপড় ভিজাইয়া ছুটি লইয়া আসিয়াছি...আমার Class friend- দের মধ্যে মিঃ জাহেদ সোহরাওয়ার্দী কলিকাতা হাইকোর্টের জাস্টিস হইয়াছিলেন। আমার আরেক Class friend মিঃ কাজী জহুরুল হক ঢাকা বারের B.L. Pleader এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ বাহাদুরের Private Teacher, পরে তিনি ওকালতি ছাড়িয়া হাইকোর্টের Interpret হইয়াছিলেন।[৫০]"

---

৪৭. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

৪৯. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৫০. *ঘরোয়া বৈঠকে কবির আলাপ অংশ*, মাসিক মোহাম্মদী, ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেম ও পরিণয়

বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় কবির জীবনে প্রেম এসেছে। এসেছে নারীর অকৃত্রিম ভালোবাসা। কেউ কেউ আরাধ্য প্রেয়সীকে পেয়েছেন আবার অনেকে পেয়েও হারিয়েছেন। দগ্ধ হয়েছেন শাশ্বত প্রেমের বহ্নিশিখায়। রচনা করেছেন কালজয়ী সব কবিতা। কবির ব্যাথাতুর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বিশ্বসাহিত্যের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরাউল কায়স (আনুমানিক জন্ম ৫০১-৫৪৫) ও উনাইযার প্রেম, আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (৫২৫-৬০৮) ও আবলার প্রণয়, কাব বিন যুহায়র (মৃত্যু ৬৬২) ও সু'আদের প্রেমোপাখ্যান ইতিহাস হয়ে আছে। ফারসী সাহিত্যের অমর কবি হাফিজ সিরাজীর (১৩১৫-১৩৯০) সাথে পাইরিয়্যার প্রেম আরেক দৃষ্টান্ত। এ ব্যাপারে কবি কায়কোবাদ বলেছেন, "পারস্যের কবি হাফিজও এই প্রেমের তপস্যা করিয়া কবি হইয়াছিলেন। তাই কেবল প্রেমের গীতই গাহিয়া গিয়াছেন।[৫১]" হাফিজ সিরাজী তাঁর প্রেয়সীর শুভ্র মুখমণ্ডলের কালো তিলের বিনিময়ে সমরখন্দ ও বুখারা দান করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কবির ভাষায়:

"আগর আঁ তুর্কে শিরাজী ব-দস্ত

আরদ দিলে মরা

বখালে হিন্দুয়শ বখশয

সমরখন্দ ও বুখারারা।"[৫২]

"সেই শিরাজী তুর্কী বালা

নেয় যদি মোর এ হিয়ারে

তার এক তিলে বিলিয়ে দিব

সমরখন্দ ও বুখারারে।" (অনু. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ)

---

৫১. এম.এ. মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৫২ . অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম, *মধ্যপ্রাচ্যের দুটি ঐতিহ্যবাহী মুসলিম দেশ: ইরান ও ইরাক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্বসংখ্যা, বর্ষ: ২৩, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪, পৃ. ৭৮৩

কবি গুরুর জীবনেও প্রেম এসেছিল। প্রেম এসেছিল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) জীবনে। কায়কোবাদের সাথে নজরুলের অসাধারণ মিল লক্ষ্যণীয়। নজরুলের জীবনে এসেছিল সৈয়দা আসার খানম ওরফে নার্গিস নিগার খানম পরবর্তীতে আশালতা সেন গুপ্ত ওরফে দুলি বা দোলনচাপা। কায়কোবাদের জীবনে এসেছিল প্রথমে গিরিবালা দেবী পরবর্তীতে তাহেরুন্নেসা বেগম। বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার জৈনসার ইউনিয়ন। তারই অন্তর্গত ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, প্রকৃতির চাদরে আচ্ছাদিত গ্রাম খিলগাওঁ। এ গ্রামে সহাবস্থানে ছিল দু'টি বনেদী পরিবার। একটি কুলীণ ব্রাহ্মণ জমিদারের বাড়ি অন্যটি ফরিদপুর জেলার কার্তিকপুর স্টেটের নায়েব মুনশী আনছার উদ্দীনের বাড়ি। শেষোক্ত ব্যক্তির সুযোগ্য পুত্র তৎকালীন মুসলিম বাংলার খ্যাতনামা মুক্তার আফতাব উদ্দীন ছিলেন কবির ছোট ভগ্নিপতি। এরই সুবাদে কবি ও তাঁর ছোট দুই ভাই বোনের আশ্রয়ে এখানে অবস্থান করতে থাকেন। কবি এখানে কাটিয়েছেন দুই বা তিন বছর।[৫৩] এখানে অবস্থান করার সময় কবির সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর এক ভক্তের। তিনি মুনশী আনছার উদ্দীন সাহেবের প্রতিবেশী জমিদার কন্যা গিরিবালা দেবী।[৫৪]

উল্লেখ্য, বোনের বাড়িতে বসবাস করার আগেই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিরহ বিলাপ বা বিরহ বিলাস' প্রকাশিত হয়।[৫৫] গিরিবালা দেবী ছিলেন শিক্ষিতা কিশোরী ও সেই সাথে কাব্য রসিক। তিনি কবির 'বিরহ বিলাপ' কাব্য পড়ে কবির ভক্ত হয়ে যান। গিরিবালার বয়স তখন তের বছর আর কায়কোবাদের বয়স ষোল। গিরিবালা কবির 'বিরহ বিলাপ' পাঠ করে তাঁর অনুরক্ত হয়ে কবির সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অতঃপর নবীন কবি এবং তাঁর ভক্তের পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর থেকে প্রতিদিন বাড়ির বালক ভৃত্য ইশ্বর ভাণ্ডারীকে দিয়ে গিরিবালা কবির জন্য ফুল পাঠাতেন।[৫৬]

---

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২

৫৫. ফাতেমা কাওসার, আবুল ফজল ও আব্দুল মান্নান সৈয়দের ভাষ্য মতে কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম বিরহ বিলাপ। অন্যদিকে কায়কোবাদ গবেষক এম. এ. মজিদের মতে বিরহ বিলাস।

৫৬. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

গিরিবালা দেবীর সাথে কবির কোথায় প্রথম পরিচয় হয়েছিল এ বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসারের মতে, ঢাকার আসক জমাদার লেনে তাঁদের পরিচয় হয়। কায়কোবাদ তখন পড়াশুনা ছেড়ে আসক জমাদার লেনে এক আত্নীয়ের বাড়িতে বসবাস করতেন। এখানেই গিরিবালা বসবাস করতেন। তিনি 'বিরহ বিলাপ' পড়ে কবির ভক্ত হয়ে যান এবং কবিকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতঃ পরিচিত হন।[৫৭] অন্যদিকে গবেষক এম. এ. মজিদ এর মতে, কবির সাথে গিরিবালার সাক্ষাৎ ঘটে বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার খিলগাঁও গ্রামে। এখানে গিরিবালার গ্রামের বাড়ী আর কবির বোনের বাড়ি। সেখানেই গিরিবালা একভাইয়ের মাধ্যমে কবিকে ডেকে নিয়ে পরিচিত হন। পরিচিত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি কবির জন্য ফুল পাঠাতেন।[৫৮]

গিরিবালা দেবী কবিকে কবিতা লেখার ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত করতেন। আর পিতৃ-মাতৃহারা অসহায় কবি ভক্ত প্রেয়সীর উৎসাহে নব উদ্যমে কবিতা রচনা করতেন। এরপর কবি ঢাকায় চলে আসেন। তাঁর অবস্থান ডাফরিন ছাত্রাবাস। কিন্তু মানস-প্রিয়াকে গ্রামে রেখে আসায় মন তাঁর টেকে না হোস্টেলে। কবি বিরহ তাপিত হয়ে ছুটেন খিলগাঁওয়ে। কিন্তু বিধিবাম গিরিবালা সেখানে নেই। ঢাকার বাসায় চলে এসেছেন। প্রণয়ীর দেখা না পেয়ে কবি পেরেশান হয়ে পড়েন। চলে আসেন ঢাকা, খুঁজতে থাকেন প্রিয় মানুষটিকে। বিরহের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে প্রিয়তমাকে নিয়ে রচনা করেন আসাধারণ এক কবিতা 'ভুল'। পরবর্তীতে কবিতাটি 'অশ্রুমালা' কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। কবি লিখেছেন:

গি-য়াছিনু প্রিয়তমে প্রেমের নিকুঞ্জ বনে,
রি-ক্ত করে ফিরে এনু না পাইনু ফুল!
বা-তাসে গিয়াছে ঝ'রে, নাই আর বৃন্ত পরে,
লা-বণ্য মাটির সনে হ'য়ে গেছে ধূল।
দে-খিনু সুগন্ধ তার সমীর নিয়াছে ধার
বি-ষাদে হৃদয় মোর মরু সমতুল![৫৯]

---

৫৭. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৫৮. এম.এ. মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪
৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

উপর্যুক্ত কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তির আদ্যক্ষর মিলে হয় "গিরিবালা দেবি"। এ ব্যাপারে কবি নিজেই লিখেছেন:

> "এ কবিতাতে আপনারা গিরিবালা দেবী নাম্মী একটি বালিকার নাম পাইবেন। ইহার বয়স যখন ত্রয়োদশ বৎসর, সেই সময় এই বালিকাটি আমার প্রথম কাব্য 'বিরহ-বিলাস' পাঠ করে নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিল। এবং সম্পর্কিত একটি ভ্রাতার দ্বারা তাহাদের বাসায় ডেকে নিয়েছিল। তাহার বাসার নিকটেই আমাদের বাসা ছিল। সেই তাহার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই অবধি সে প্রত্যেক দিন তাদের 'ইশ্বর ভাণ্ডারী' নাম ধেয় একটি বালক ভৃত্যের দ্বারা আমাকে কিছু কিছু ফুল পাঠাইয়া দিত। সে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদারের কন্যা। ইহা দেখিয়া আমার বন্ধু-বান্ধব এবং আত্নীয়-স্বজন অনেকেই মনে করিতেন, সে আমাকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। তাঁহার সেই ভালোবাসাতে কোন কলঙ্ক ছিল না, উহা ছিল নির্মল, নিস্কাম ও পবিত্র। তার সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা দর্শনে আমার হৃদয়েও একটু স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল। তাহাতেই আমার এই কবিত্ব শক্তির উন্মেষ এবং উপরের লিখিত ঐ কবিতাটির জন্ম।[৬০]"

কবি গিরিবালা দেবীকে খিলগাঁওয়ে গিয়ে পাননি। দেখা হয়নি দু'জনার। তাই বরাবরের মত যে ফুল দ্বারা কবি বরিত হতেন তাও নেই। কবির অতৃপ্ত হৃদয় বেদনায় মর্মাহত। কবি লিখলেন:

প্রেম নাই ফুল নাই কী দিয়া পূজিব ছাই
হল না প্রতিমা পূজা হৃদয় আকূল।
হ্যাঁ প্রেয়সী সুখে থাক, মনে রেখ ভু'ল নাক।
জীবন মন্দিরে তুমি আলোক অতুল
প্রতিমা গড়িয়া ধূলে ভেঙ্গেছি মনের ভুলে
ক্ষমিও প্রেয়সি, আহা সকলি যে ভুল।[৬১]

---

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩
৬১ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩

এ কবিতায় কবির প্রথম প্রেমের স্মৃতি অম্লান হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি ভুলতে পারেননি প্রথম প্রেমের সুরভিত পরশ। কবিতায় বেদনাহত কবির ব্যকুল হৃদয়ের আকুতি লক্ষ্যণীয়। প্রতিটি পঙক্তিতে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়েছে কবির হৃদয়ের দুঃখ আর বেদনা। গিরিবালা দেবী তখন কোথায়! তিনি তখন ঢাকার আসক জমাদার লেনে। তিনি খিলগাঁও ছেড়েছেন কবির প্রতি ভালোবাসার তীব্রতা এবং বিরহের যন্ত্রণায়। তিনি আসলেন ঢাকায় আর কবি গেলেন প্রেয়সীর বাস্তুভিটায়– কীভাবে হবে দেখা!

প্রেয়সী যেখানে নাই, সেখানে কি থাকা যায়? কবি ভগ্ন মনোরথে ফিরে এলেন ডাফরিন ছাত্রাবাসে। এক বুক বেদনা আর অভিমান তাঁকে ভুলাতে পারেনি প্রেয়সীর নিস্পাপ ও দীপ্যমান চেহারাটি। কবি খুঁজতে থাকেন তার হৃদয় রাণীকে। অব্যাহত প্রচেষ্টায় জয় হয় স্বর্গীয় প্রেমের। আবার দেখা হয় দু'জনার। হোস্টেলে থেকে আসক জমাদার লেনে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয় কবির। অন্যদিকে গিরিবালা সময় মতো প্রিয়তমকে দেখতে পান না। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন কবি। ছেড়ে দিলেন হোস্টেল। প্রিয় শিক্ষক কাজী জহুরুল হকের বাসা তথা জিন্দাবাহারের কাজী ভিলায় উঠে আসেন। এখন আর বাঁধা নেই, নেই কোন আইন-কানুনের শৃংখল। বহু কষ্ট আর যাতনার পর গিরিবালা দেবী কবিকে শুধু ফুল নয় বরণ করেন ফুলের মালা দিয়ে।[৬২] মালা পড়ানোর সময় কায়কোবাদের একটি কবিতা কিছু রদবদল করে আবৃত্তি করলেন:

ধর ধর কবিবর
ক্ষুদ্র উপহার
অর্পণ করিণু ইহা
গলেতে তোমার।
বড় সাধ ছিল মনে
গেঁথে মালা সযতনে
পরাইব একদিন
কণ্ঠেতে তোমার।

৬২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

সেদিনের সাধ মম
পুরিয়েছে প্রিয়তম।
ধর ধর কবিবর
ক্ষুদ্র উপহার।[৬৩]

স্বর্গীয় ভালোবাসা তীব্র থেকে হয় তীব্রতর। বিষয়টি জানাজানি হলে এক সময় খবর পৌঁছে যায় কবির মাতুলালয় আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে। যাঁরা কবির বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা শাসন করার লোভ সামলাতে পারেননি। প্রথমত ছেলে-মেয়ের প্রেম তৎকালীন মুসলিম সমাজে নিষিদ্ধ বিষয়। তার সাথে যুক্ত হয়েছে ধর্মের ভিন্নতা! নানা বাড়ীর লোকজন এসে কবিকে জোর করে নিয়ে যায় আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে। হিন্দু বালিকার সাথে প্রণয়ে জড়ানোর অপরাধে আসামী সাব্যস্ত হন কবি। তাঁকে প্রদান করা হয় নির্মম শাস্তি। ছোট মামা হেদায়াত আলী চৌধুরীর কন্যা তাহের উন্নেসার সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়া হয়। দু'টি হৃদয়ের স্বপ্ন-সাধ ও অকৃত্রিম বন্ধন মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ।[৬৪]

কবির প্রণয়ী গিরিবালার পরিণতি হয় আরো করুণ ও মর্মান্তিক। গিরিবালার অভিভাবক মহল তাঁকে নিয়ে যায় কলকাতা। সেখানে তাঁর জন্য পাত্র ঠিক করা হয়। কুলীণ ব্রাহ্মণ সুশিক্ষিত সুপাত্র। কিন্তু গিরিবালা দেবী! যিনি তাঁর হৃদয়-মন সঁপে দিয়েছেন কায়কোবাদকে। কায়কোবাদই তাঁর একমাত্র আরাধ্য ব্যক্তি। তিনি কঠিন শপথ করলেন যে, কবিকে না পেলে জল স্পর্শ করবেন না। কোন অনুরোধ উপরোধে কাজ হয়নি। আহার ও নিদ্রা পরিত্যাগ করে নিজের জীবনকে তিনি ঝুঁকির মুখে ফেলে দেন। একপর্যায়ে সকলের অজ্ঞাতে চলে যান না ফেরার দেশে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তাঁর মুখ থেকে অনুচ্চস্বরে কায়কোবাদের নামই উচ্চারিত হতো বলে জানা যায়।[৬৫] মহাকবি কায়কোবাদ কোনদিন ভুলেননি তাঁর প্রেয়সী গিরিবালা দেবীকে। 'অশ্রুমালা' কাব্যে বেশ কয়েকটি কবিতায় কবির বিদগ্ধ হৃদয়ের হুতাশন আমরা লক্ষ্য করেছি। এসব কবিতায় কবির প্রণয়ী গিরিবালা দেবীর প্রতি ভালোবাসার তীব্রতাই

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১
৬৪. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭

প্রতিভাত হয়েছে। কায়কোবাদের কাব্য প্রতিভার উন্মেষের অন্যতম কারণ প্রেয়সী গিরিবালা দেবী।[৬৬]

বাল্য প্রেমের সমাধি কবিকে উদাসীন করেছিল যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আর কাটেনি। তাঁর কাব্যের পরতে পরতে প্রেমের জয়গান গাওয়া হয়েছে। ঘুরে ফিরে প্রথম প্রেমের দীপ্যমাণ আলোকবর্তিকা আরো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বারবার তিনি প্রেয়সীকে স্মরণ করেছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'অশ্রুমালা' কাব্য উৎসর্গ করেছেন গিরিবালা দেবীকে। উৎসর্গে কবি লিখেছেন:

> "প্রাণের-
>
> আজ অনেক দিনের সেই অশ্রুজল ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলি একত্র করিয়া একছড়া মালা গাঁথিয়াছি। বড় আশা, তোমাকে পরাইয়া গত জীবনের সমুদয় দুঃখ-সমুদয় যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব! মনে করিয়াছিলাম, একদিন সৌভাগ্যের উন্নত সিংহসানে আরোহণ করিয়া তোমাকে হৈম-ভূষণে সাজাইব, আমার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। শৈশব হইতে কবিতা-দেবীর সেবা করিয়া যাহা পাইয়াছি, আজ তাহাই লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত। এ'স প্রিয়তমে, তুমি দাঁড়াও! এ জীবনে তোমাকে কোন উপহার দিতে সক্ষম হই নাই, আজ আমার মনের সেই সমুদয় দুঃখ-সমুদয় ক্ষোভ, সমুদয় সাধ মিটাইয়া আমার এই অতি যত্নের "অশ্রুমালা"টি তোমাকে পরাইয়া দিই। ইহাই আমার প্রেম-ইহাই আমার ভালবাসা-ইহাই আমার মরুময় জীবনের একমাত্র শান্তি-প্রস্রবণ! তুমি সুখে থাক, আমি বিদায় হই।
>
> তোমারই-
>
> "কোবাদ"[৬৭]"

কায়কোবাদ প্রেমিক কবি। তাঁর কাব্য প্রেম নির্ভর। প্রেমকে উপজীব্য করেই তাঁর কাব্য সাধনা। বিশেষত 'অশ্রুমালা' কাব্যের মূল সুর প্রেম। এ প্রেম অপার্থিব বা অশরীরী নয়। কবির ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা তথা তাঁর ও গিরিবালার প্রেম। কবির মহাকাব্যের নানা সর্গে উপসর্গে প্রেমের জয়-জয়কার। এব্রাহিম কার্দী-জোহরা বেগম, হিরণ-আতা খাঁ, লবঙ্গ-রত্নজী,

---

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

বিশ্বনাথ-কৌমুদী ও সুজাউদ্দৌলা-সেলিনার প্রেম ও বিরহের ভিতর দিয়ে কবির শাশ্বত প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

কবি তাঁর বাল্যপ্রেম কখনও ভুলতে পারেননি। এ প্রেম তাঁকে মানবতার প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর হৃদয়কে করেছে বিকশিত। তিনি ভালোবেসেছেন মানুষকে, ভালোবেসেছেন দেশকে, জাতিকে, ভালোবেসেছেন বাংলা ভাষাকে-সর্বোপরি বিশ্বমানবতাকে। তাই কবির কাব্যে মানবতার কথাই ফুটে উঠেছে।

গিরিবালার প্রেম কবির হৃদয়কে আলোড়িত করে শুদ্ধ করেছে, দিয়েছে অপরূপ সৌন্দর্য, সেই সাথে কবি হৃদয়কে করেছে বিদগ্ধ। তার বিরহের যন্ত্রণায় কবি বারবার অনিঃশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন। কবি ব্যকুল হয়েছেন না পাওয়ার বেদনায়। কবিতাকে আঁকড়ে ধরেছেন এই দহণ জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে। এক সময় কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর আরেক প্রণয়ী।

কবি নির্মম আত্নীয় পরিজনের চাঁপে পড়ে তাহের উন্নেসাকে বিয়ে করলেও তাঁর অমর্যাদা করেননি। তিনি সংসার জীবন পরিচালনা করেছেন দায়িত্বশীল স্বামীর মতোই। অর্থ-সম্পদের প্রতি উদাসীনতা থাকলেও সংসার জীবনে তিনি ছিলেন সুশৃঙ্খল। সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী সবার প্রতি কবির সজাগ দৃষ্টি লক্ষ্যণীয়। গিরিবালার প্রেম তাহের উন্নেসার মধ্যে তিনি অবলোকন করতে এক ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। এ যেন কবি নজরুলের জীবনের সাথে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। সৈয়দা নার্গিস নিগার খানমের প্রেম নজরুল আশালতা সেন গুপ্ত ওরফে প্রমিলা দেবীর মধ্যে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে কবিতাও লিখেছিলেন, কায়কোবাদও বেশ কিছু গ্রন্থ তাহের উন্নেসাকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি তাঁকে ভালোবাসতেন এবং তাঁকে নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। নিম্নে তাঁকে নিয়ে লেখা 'স্মৃতিলিপি' কবিতাটি সন্নিবেশিত হলো:

দেহটি যার পড়ত নুয়ে জুঁই চামেলী ফুলের ভারে!
কণ্ঠে দিলে বেলীর হার,
ভাবত সে যে কতই ভার
পাষাণের ভার বুকে নিয়ে সে আছে আজ এই কবরে!
তাহেরুউন্নেসা নামটি তাঁহার,
মুগ্ধ সবাই গুণেতে যার,
সিক্ত আজি সমাধি তার কায়কোবাদের অশ্রু–ধারে।[৬৮]

৬৮. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কর্ম জীবন

ঢাকা মাদরাসাই কবির শেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিয়ের পর তাঁর শিক্ষা জীবনের যবনিকা ঘটে। এন্ট্রাস পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি। তবে কবিতার প্রতি ভালোবাসা এক দিনের জন্যও নিঃশেষ হয়নি। কবিতা ছিল তাঁর প্রণয়ী, তাঁর ভালোবাসা। কবিতার মায়া তিনি মৃত্যুর পূর্বমুর্হুত পর্যন্ত কাটাতে পারেননি। কবিতার মায়ায় তিনি ছিলেন মোহগ্রস্ত। এর জন্য তিনি বৈষয়িক কর্মকাণ্ডে ছিলেন উদাসীন। প্রিয়জনদের কূট ষড়যন্ত্রে তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

বিয়ের পর সাংসারিক চাঁপ বেড়ে যায়। ফলে তিনি কর্ম জীবনে প্রবেশের জোর প্রচেষ্টা চালান। তখনকার দিনে মুসলমানদের চাকুরী পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য।[৬৯] ঢাকা মাদরাসার অধ্যক্ষ ছিলেন স্যার ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী। তিনি কবির গুণমুগ্ধ ছিলেন। তদানীন্তন পোস্ট মাস্টার জেনারেলের পারসোনাল সেক্রেটারী সৈয়দ আমজাদ আলী ছিলেন তাঁর আরেকজন প্রিয় ছাত্র। ওবায়দুল্লাহ সাহেবের সুপারিশে সৈয়দ আমজাদ আলী সাহেবের সহযোগিতায় কায়কোবাদ অস্থায়ী ভিত্তিতে ডাক বিভাগে কেরাণী পদে কর্ম জীবনে প্রবেশ করেন।[৭০] পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালে তিনি স্থায়ী পদ লাভ করেন।[৭১]

'বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলার জামুরকী, সুসং, দুর্গাপুর, কালিহাতি, পিংনা, মুক্তাগাছা, বাজিতপুর পোষ্ট অফিসে; মুন্সীগঞ্জ জেলার বজ্রযোগিনী পোষ্ট অফিসে; ঢাকা জেলার আগলা ও নবাবগঞ্জ পোষ্ট অফিসে কাজ করেছেন।'[৭২] প্রথম জীবনে কেরানি উত্তরকালে পোস্ট মাস্টার ১৯১৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত। সরকারের অনুরোধে স্বগ্রামে ১৯৩০ পুনরায় কিছুকাল পোষ্ট মাস্টার হিসেবে কাজ করেন।[৭৩]

---

৬৯. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
৭২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

চাকুরীতে প্রবেশকালীন সময় কবির বেতন ছিল মাসে কুড়ি টাকা। আর ১৯১৯ সালে অবসর গ্রহণ করার সময় বেতন হয় মাসে সাইত্রিশ টাকা।[৭৪] জামুরকী পোস্ট অফিসে চাকুরীকালীন টেলিগ্রাফী পরীক্ষায় কবি উত্তীর্ণ হন।[৭৫]

অল্প বেতনের চাকুরী করেই কবি তাঁর বিরাট সংসার চালিয়েছেন। সীমাহীন দারিদ্র্যের সাথে দীর্ঘ সংগ্রামে কবি কখনও বিচলিত হননি। সাংসারিক জীবনে দুঃখ-কষ্ট থাকলেও শান্তির অভাব ছিল না। শত বাঁধার মুখেও কাব্যচর্চা থেমে থাকেনি। কাব্যের কুসুম কাননে সদা-সর্বদা তিনি বিচরণ করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন কালজয়ী কাব্য ও মহাকাব্য। কর্ম জীবনের হাড় ভাঙা পরিশ্রম কবির কাব্য সাধনার পথে অন্তরায় হয়নি। কাব্যের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা তাঁকে নিরলস করেছিল। অফিস থেকে বাড়ি এসে সাহিত্যচর্চায় লেগে যেতেন। প্রচুর পড়াশুনা করেছেন আর লিখেছেন কবিতার পর কবিতা। এমনও হয়েছে রাতের খাবার ঢাকনা দিয়ে ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছে আর তিনি কবিতার পঙক্তি নির্মাণে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন।

৭৪. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৭৫. দেওয়ান আব্দুল হামিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিবার ও পারিবারিক জীবন

কবি কায়কোবাদের দুই ভাই ও এক বোন ছিল। সবার বড় কায়কোবাদ। দ্বিতীয় আজিজুন্নেছা ওরফে ছলিমুন্নেছা, তৃতীয় আবদুল বারী আল-কোরেশী ওরফে তফাজ্জল হোসেন, চতুর্থ তথা কনিষ্ঠ আবদুল খালেক আল-কোরেশী ওরফে মোহছেন আলী।[৭৬]

কবির ছোট বোন আজিজুন্নেছার বিয়ে হয় বিক্রমপুরের খিলগাঁও নিবাসী মুনশী আফতাব উদ্দীন মোক্তারের সাথে। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অনাবিল সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ। এ বোনের বিয়ের পর কবি ও তাঁর ভাইয়েরা তাঁর নিকট বসবাস করেন। তাঁরা আজীবন বোন ও ভগ্নিপতির প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং তাদের সহমর্মিতার কথা কোন দিন ভোলেননি।[৭৭]

আজিজুন্নেছা ও মুনশী আফতাব উদ্দীন দম্পতির তিন পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। এদের কোন কন্যা সন্তান ছিল না। পুত্ররা হলেন আবুল খায়ের ছয়ফুদ্দীন ওরফে রাজা মিয়া, মেছবাহ উদ্দীন আহমেদ ও আফরাজ উদ্দীন আহমেদ ওরফে ফিরো মিয়া। ছয়ফুদ্দীন ওরফে রাজা মিয়ার সাথে কবির দ্বিতীয় কন্যা লতিফুন্নেছার এবং আফরাজ উদ্দীন আহমেদ ফিরো মিয়ার সাথে কবির তৃতীয় কন্যা জেবুন্নেছার বিয়ে হয়।[৭৮]

কায়কোবাদের দ্বিতীয় ভ্রাতা আবদুল বারী আল-কোরশী। তিনি যখন পঞ্চম অথবা ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তখন কাউকে না জানিয়ে চলে যান তদানীন্তন বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে। সেখানে এক মহৎপ্রাণ ইংরেজ দম্পতির স্নেহ-ভালোবাসায় লালিত পালিত হন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আবার পড়া-লেখা শুরু করেন এবং মেডিকেল সায়েন্সে পড়াশুনা শেষ করে ডাক্তার হয়ে বাড়ি আসেন। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় তখন আগলা পূর্ব পাড়ার বাড়িতে। চিকিৎসক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি খান সাহেব ও মীর উপাধিতে ভূষিত হন। মিটফোর্ড হাসপাতালের সিভিল সার্জন থাকা অবস্থায় তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[৭৯]

---

৭৬. ফাতেমা কাওছার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৭৭. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬

৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩১

কায়কোবাদ এবং তাঁর ছেলে-মেয়েরা মাঝে মাঝে তাঁর ৭৫, বেগম বাজারের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। খান সাহেব ডাক্তার মীর আবদুল বারী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে যান।

কায়কোবাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল খালেক আল-কোরশী। বাবার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। এরপর তিনি তাঁর বোনের বাড়িতে ছিলেন। কবি চাকুরী নেওয়ার পর তাঁর কাছেই অবস্থান করেন। ছাত্র হিসেবে মেধার স্বাক্ষর রাখেন। মুসলিম হাইস্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করার পর কলকাতা চলে যান। সেখানেই গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। অতঃপর সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এক পর্যায়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে উন্নীত হন। তিনি সাত পুত্র ও চার কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন।

কৈশোরের প্রেম কায়কোবাদকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর কাব্যের পরতে পরতে এই প্রেম উঁকি দিয়ে তা জানান দিয়েছে। কিন্তু এই অশান্ত প্রেম ও বিরহের যন্ত্রণা কবির দাম্পত্য জীবনে কোন আঁচড় কাটতে পারেনি।

কবি পত্নী ছিলেন তাঁরই মামাতো বোন তাহের উন্নেছা খাতুন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অনাবিল সুখ, আনন্দ আর তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ। কবি স্বল্প বেতনের চাকুরী করতেন। দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। চাকুরী ছাড়া কবি আয় রোজগারের আর কোন পন্থা অবলম্বন করেননি। বাকী সময় তিনি ব্যয় করেছেন কাব্য রচনায়। এক্ষেত্রে সহৃদয় কবি পত্নি উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে তাঁর কাব্যচর্চাকে আরো বেগবান করেছেন। আর্থিক দীনতাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর প্রতিভার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। আর কবিও সহধর্মিনীকে ভালবাসতে কার্পণ্য করেননি।

কবি স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুখ-শান্তি আর স্বস্তিপূর্ণ। সংসার জীবনের দারিদ্র্য এই অনন্য সাধারণ ভালবাসা ও শান্তিময় জীবনে অশান্তির কারণ হতে পারেনি। তাঁদের বোঝাপড়া ছিল অসাধারণ। সংসার বিমুখ কাব্যপ্রেমিক কবির সাংসারিক কার্যে উদাসীনতায় কবিপত্নি সংসারের হাল ধরেছেন। কবিও পিছিয়ে থাকেননি। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ স্ত্রীর সেবা যত্ন নিজ হাতেই করেছেন। তাঁদের সংসার আলো করে এসেছিল দশ দশটি

সন্তান। পাঁচটি ছেলে ও পাঁচটি মেয়ে। এরমধ্যে দু'জন শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। সন্তানদের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন:

পাঁচটি ছেলে পাঁচটি মেয়ে
ছিল মোর ঘরে
দু'টি ছেলে স্বর্গে গেছে
একটি দেশান্তরে।[৮০]

কবির প্রথম সন্তান আবদুর রাজ্জাক ওরফে শাহ আলম। প্রথম জীবনে দেশান্তরী ছিলেন। পরে ফিরে আসেন। বৃটিশ রেলওয়েতে চাকুরী করতেন। পরবর্তীতে বৃটিশ আর্মিতে যোগ দেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর ছিল তিনটি কন্যা সন্তান। ১. কামরুজ্জামান সুলতান ওরফে চাঁদ বিবি, ২. হোসনে আরা ওরফে সূর্য বিবি এবং ৩. বিটিয়া।

কবির দ্বিতীয় সন্তান লুৎফুন্নেসা বেগম। কায়কোবাদ যখন বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামুরকি পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার হিসেবে কর্মরত সেসময় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাঁঠাল গ্রাম নিবাসী ডাক্তার মৌলবী মোহাম্মদ ইরফান আলীর সঙ্গে লুৎফুন্নেসার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। এ দম্পতির তিন পুত্র ও দুই কন্যা- ১. তোফাজ্জল হোসেন বাবু, ২. এড. তোফায়েল আহমেদ, ৩. তাজুল ইসলাম, ৪. বেদুন্নেছা, ৫. হেনা ওরফে হেনু।

কবির তৃতীয় সন্তান বদিউল আল-কোরশী। মাত্র দশ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে যান। কবির চতুর্থ সন্তান লতিফুন্নেসা বেগম। তাঁর বিয়ে হয় কবির একমাত্র বোন আজিজুন্নেসার পুত্র আবুল খায়ের ছয়েফ উদ্দীন আহমদের সাথে। এ দম্পতি তিন পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের অধিকারী ছিলেন। তারা হলেন- ১. এফ. এ. মোহসীন উদ্দীন আহমেদ, ২. এ. বি. ফখরুদ্দীন আহমেদ, ৩. এ. এফ ময়েজ উদ্দীন আহমেদ, ৪. উম্মুল ছালমা আফরাজুন্নেছা খাতুন, ৫. উম্মুল জয়ভা খায়রুন্নেছা খাতুন এবং ৬. উম্মুল আতহার তৈয়বুন্নেছা খাতুন।

কবির পঞ্চম সন্তান সরোয়ার আলম আল-কোরেশী ওরফে গিনী মিয়া। তিনি সিভিল সার্ভিস বিভাগে চাকুরী করতেন। আশি বছর বয়সে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে কবি দুহিতা জাহানারা বেগমের ১১, সেগুন বাগিচার বাসায় ইন্তেকাল করেন। বনানী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

---

৮০. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

জমরুতউন্নেছা ওরফে পিয়ারা বেগম কায়কোবাদের ষষ্ঠ সন্তান। এর বিবাহ হয় কবির জন্মভূমি আগলা পূর্ব পাড়া গ্রামের গাজী বাড়ীর গাজী শফিউল্লাহর সাথে। তারা নিঃসন্তান ছিলেন।

কবির সপ্তম সন্তান আনছার-এ-আলম আল-কোরেশী ছয় মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। অষ্টম সন্তান জাহানারা বেগম। তাঁর বিয়ে হয় বখশ নগর নিবাসী মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলা আলবক্স মাদবরের পুত্র জনাব আবদুল গফুরের সাথে। আবদুল গফুর সাহেব কলিকাতা পুলিশ কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক খান সাহেব উপাধিতে ভূষিত হন। কবি এ মেয়ের বাসায় প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। এ দম্পতির কোন কন্যা সন্তান ছিল না। তাঁদের আটজন পুত্র সন্তান ছিল। এরা হলেন, ১. অধ্যাপক আবদুল মতীন, ২. লে. (অব.) এ.ই. সাবিহ উদ্দিন (কবি কায়খসরু), ৩. প্রকৌশলী এ.ই. আবদুল মুনিম, ৪. ড. এ.ই. তসলিম উদ্দিন কাদেরী, ৫. আবুল মাসুদ সাদ উল্লাহ, ৬. আবুল হায়াত আফজাল উদ্দীন, ৭. আবুল ফজল এনাম উদ্দীন কাদেরী এবং ৮. আবু হেনা সাদ উদ্দীন। কবির নবম সন্তান জেবুন্নিসা বেগম। তাঁর বিয়ে হয় কবির ভাগ্নে আফরোজ উদ্দিন আহমদ ফিরো মিয়ার সাথে। ফলে ফিরো মিয়া ও তদীয় ভ্রাতা আবুল খায়ের ছায়েফ উদ্দীন আহমদ পরস্পর ভায়রা ভাইয়ে পরিণত হন। এ দম্পতির সাত জন সন্তান ছিল। তারা হলেন, ১. সিরাজ উদ্দীন আহমদ, ২. আশরাফ উদ্দিন আহমদ, ৩. আফসার উদ্দিন আহমদ, ৪. নাসির উদ্দিন আহমদ, ৫. শেলী, ৬. গুলশান এবং ৭. রতন।

কবির কনিষ্ঠ সন্তান হাবীবে আলম আল-কোরশী। তিনি প্রথমে ফায়ার সার্ভিস বিভাগে টাইম কিপার অতঃপর টেলিফোন অপারেটর হিসেবে চাকুরী করতেন। শেষ জীবন কাটে প্রিয় জন্মভূমি আগলা পূর্ব পাড়া গ্রামে। এ সময় তিনি মানব সেবা তথা জনহিতকর কাজে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে আগলা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পূর্বশত্রুতার জের ধরে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিরপরাধ কবির এ সন্তান নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন।

কায়কোবাদ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আগলা পূর্ব পাড়ার খরিদা বাড়ী, জমা-জমি ও তাঁর বইপত্রগুলো হেবা দলিল মূলে পত্নী তাহেরউন্নেসা খাতুনকে লিখে দিয়ে যান। অতঃপর তাহের উন্নেসা

খাতুন মৃত্যুর পূর্বে যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদ কনিষ্ঠ পুত্র হাবীবে আলম আল-কোরশীকে লিখে দিয়ে যান।[৮১]

হাবীবে আলম আল-কোরেশী তিনজন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের সন্তান- ১. নুরুন্নাহার আল- কোরশী, ২. জহিরুল হক আল-কোরেশী মবু মিয়া, ৩. এনায়েতুল্লাহ আল-কোরেশী লাল মিয়া এবং ৪. ফজলুল হক আল-কোরেশী হারু মিয়া।

দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান - ১. বাহারুন্নেসা বুলি, ২. খোকন আলম আল-কোরশী, ৩. সেন্টু আল-কোরশী, ৪. টুটু আল-কোরশী, ৫. পিন্টু আল-কোরেশী এবং ৬. মিঠু আল-কোরশী।

হাবীবে আলম-কোরেশীর তৃতীয় পক্ষের সন্তানদের তথ্য জানা যায়নি।

৮১. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুপম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

কায়কোবাদ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। গায়ের রং ছিল ফর্সা। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "তাঁর মতো সুমার্জিত দীর্ঘদেহী সুদর্শন পুরুষ এখনকার দিনে চোখে পড়ে না। তাঁর অবয়ব সুঠাম এবং সুন্দর ছিল। পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্নতা ছিল এবং পথযাত্রায় সম্মানিত পদক্ষেপ ছিল। মনে হতো একটি সময়ের সম্ভ্রমকে যেন তিনি ধারণ করে আছেন।"[৮২]

কবির গলার স্বর ছিল ভরাট-পৌরুষদীপ্ত। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। রাগ হলে তাঁর স্বর উচ্চকীত হয়ে উঠতো। তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল।[৮৩] অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত ছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতেন। চাকুরী জীবনে তিনি সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিধান করতেন। পাঞ্জাবীর পকেটে রূপালী চেইনের একটি ঘড়ি থাকতো। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর পাজামা পাঞ্জাবী পরতেন।[৮৪]

বিনয় ছিল কবির অন্যতম গুণ। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তি। অপরের ঋণ প্রকাশে ও স্বীকারে তিনি বিনয়ী ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন কবির অন্যতম অনুরাগী। তাঁরই চেষ্টায় তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ মাসিক পঁচাত্তর টাকা তাঁর জন্য বরাদ্দ করেন। কবি ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর এ প্রচেষ্টাকে স্মরণ রেখেছিলেন। 'প্রেমের রাণী' কাব্য তাঁকেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে যে কবিতা তিনি রচনা করেছেন তার অংশবিশেষ নিম্নরূপ:

তোমারি চেষ্টায় বন্ধু পাকিস্তান গবর্নমেন্ট
মঞ্জুর করেছে মাসে
পঁচাত্তর টাকা।
তাই খেয়ে বেঁচে আছি নানা রোগে ভুগিতেছি

---

৮২. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ১১
৮৩. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

নতুবা এ জীবন বন্ধু

নাহি যেত রাখা

দারুণ দারিদ্র্য বশে চিকিৎসা চলেনা মোর

পাইতাম রক্ষা বন্ধু

চলে গেলে প্রাণ!

এ দুঃখ সহেনা আর প্রাণ করে হাহাকার

জানিনা বিধাতা কবে

করিবে আহ্বান।[৮৫]

[১০ই এপ্রিল ১৯৪৯]

উপর্যুক্ত কবিতাংশ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় কবি কী রকম আর্থিক সংকটে ছিলেন। এমন অবস্থাতেও কবি ছিলেন দুর্বিনীত-দারিদ্র্য তাঁকে সত্য-সুন্দর পথ থেকে এক মূহুর্তের জন্য পিছু হটাতে পারেনি। নিরহংকার এ মানুষটি চাকুরী জীবনসহ কোন সময়েই সততার পথ থেকে এক চুল নড়েননি। কবি ছিলেন অকপট হৃদয়ের অধিকারী। শঠতা, সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা তাঁর চারিত্রিক অভিধানে ছিল না। নিঃসংকোচে সত্য প্রকাশে তাঁর সাহস ছিল প্রশংসনীয়। নিজের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করলেও তা প্রকাশে তিনি ছিলেন বিনয়ের সুতায় বাঁধা। নিজের শিক্ষা-দীক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে নিঃসংকোচ স্পষ্ট ভাষণ তাঁর আরেকটি মহৎগুণ। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের সাহিত্য সভায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

> "... আপনারা আমাকে দেখতে চেয়েছেন, দেখবার মতো আমার মধ্যে কিছুই নাই, আমি আপনাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, আমার কোন গুণ নেই- বিদ্যা নেই - বুদ্ধি নেই; বলবার মতো কোন শক্তি নেই- energy - নেই। লেখাপড়াও বিশেষ জানিনে, যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি করে বসি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন।[৮৬]"

৮৫. কায়কোবাদ, উৎসর্গপত্র অংশ, *প্রেমের রাণী* (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) পৃ. ২১-২২

৮৬. কায়কোবাদ, *কবির কথা*, ইসলামিয়া কলেজ ম্যাগাজিন (কলকাতা: ইসলামিয়া কলেজ, ১৯৩৮), পৃ. ১০

কায়কোবাদ সহজ-সরল অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এ সারল্য প্রতীয়মান হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'মহাকবি অমায়িক স্বভাব ও প্রেমময় ছিলেন।[৮৭]' 'মাহে নও' পত্রিকায় সমালোচক বলেছেন, "শিশু সুলভ সারল্য ছিল তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রেমের পিযুষ-ধারায় পরিস্নাত ছিল তাঁর কাব্য-কোমল-কমনীয় অন্তর।[৮৮]" মোহাম্মদী পত্রিকায় কবির সম্পর্কে বলা হয়, "অতি সরলতা ছিল তাঁর মহান চরিত্রের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য। ... সারল্যের মোহনীয় ও কমনীয় রূপ তাঁর মধ্যে দেখেছি। দেখেছি তাঁর মধ্যে আর একটি অসাধারণ গুণ - সে তার অদ্ভুত স্মরণশক্তি।[৮৯]" সুসাহিত্যিক আবু তালিব কবি সম্পর্কে মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বলেন, "কবি নিজে যেমন সরল ও অকপট ছিলেন জগৎটাকেও সেইরূপ সরলভাবে দেখতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কাব্যে আমরা পেয়েছি সরল ও অকপট প্রাণের নিরাড়ম্বর প্রকাশ ...।[৯০]"

দ্বিধা ও জড়তা কায়কোবাদের চরিত্রে ছিল না। যা বিশ্বাস করতেন কথায় ও কাজে তাঁর নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ ছিল। কায়কোবাদ ছিলেন নিভৃতচারী,অন্তরমুখী ভাবুক মানুষ। কোলাহল তার অপ্রিয় ছিল। ভালো লাগতো নির্জনতা। গ্রামে অবস্থান করলেও গ্রামের বিবিধ হাঙ্গামা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। সব ধরনের গ্রাম্য দলাদলি ও সালিশী কার্যক্রম থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। তিনি কোন প্রকার অশান্তি পছন্দ করতেন না। সমাজের সব ধরনের মানুষের কাছেই তিনি মহিমান্বিত মানুষ হিসেবেই পরিগণিত ছিলেন।

কবি অতিথি পরায়ণ ছিলেন। এক্ষেত্রে অস্বচ্ছলতা কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বাড়িতে যেই আসতো খালি মুখে তাকে বিদায় দিতেন না। তিনি ফুল খুব পছন্দ করতেন। এর মধ্যে বেলী ফুল ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। পাশাপাশি তিনি বৃক্ষ প্রেমিক ছিলেন। তিনি ফলদ গাছ সংগ্রহ করে রোপণ করতেন। বিশেষত আম গাছ বেশি রোপণ করেছেন।

কবি গান পছন্দ করতেন। তিনি সেতার ও হারমোনিয়াম বাজানোয় যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। অবসর সময়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করতেন এবং সেতার বাজাতেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

---

৮৭. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৮৮. মীজানুর রহমান, *তসলীমাৎ*, *মাহে নও*, তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫০

৮৯. মঈনুদ্দীন, *মহাকবি কায়কোবাদ সম্পর্কে দু'টি কথা*, মাসিক মোহাম্মদী, পৃ. ৬৬৩

৯০. আবু তালিব, *মহাকবি কায়কোবাদ*, *মাহে নও*, তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৪

প্রতিও কবির আকর্ষণ ছিল। একাকী গুণ গুণ করে গান করতেন। গোসলের সময় পানিতে নেমেও গান গাইতেন।[৯১]

মানব সেবায় অংশগ্রহণ করতে কবি পছন্দ করতেন। এক্ষেত্রে তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর হোমিওপ্যাথির জ্ঞান ছিল অসাধারণ। পরিবারের সদস্যদের এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের তিনি চিকিৎসা সেবা দিতেন। কবির কোন বদঅভ্যাস ছিল না। পান-সিগারেট খেতেন না। পরিমিত চা পান করতেন। বিশেষ কোন খাবারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। যা সামনে দেওয়া হতো তাই তৃপ্তি সহকারে খেতেন।

কবির প্রধান আর্কষণ ছিল কাব্য। কবিতা ছাড়া তিনি আর কোন কিছুতে এতো মনোযোগী হননি। তিনি প্রেমিক ছিলেন। কৈশোরের প্রেম তিনি কখনো ভুলেননি। স্ত্রীকেও অবহেলা করেননি। ভালোবেসেছেন তাকে প্রাণ খুলে। আদর্শ স্বামী হিসেবে যে কর্তব্য পালন করা দরকার তিনি তাই করেছেন।

কবির ব্যক্তিসত্তা অন্য আর দশজনের মতো ছিল না। তিনি অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত এক অনন্য মানুষ ছিলেন। অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তাঁকে আরো মহিমান্বিত করেছিলো। বিশ্বাস ও কর্মে দৃঢ়তা ছিলা সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায়। তিনি ছিলেন সত্যের সৈনিক, ন্যায়পথের অভিযাত্রী।

৯১. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বীকৃতি ও সম্মাননা

কায়কোবাদ অনেকটা নিভৃতচারী সাহিত্য সাধক ছিলেন। খ্যাতির পেছনে কখনও তিনি দৌড়াননি। তথাপি খ্যাতি তাঁকে ছেড়ে যায়নি। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই সাহিত্যকর্মের জন্য স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছিলেন। নিখিল ভারত সাহিত্য সঙ্ঘ ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর কবিকে কাব্যভূষণ, বিদ্যাভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধীতে ভূষিত করে।[৯২]

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করে কায়কোবাদ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অমিয়ধারা কাব্য এ ছন্দে রচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। আর কায়কোবাদ এ ছন্দে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন বলে তাঁকে 'মাইকেল দি সেকেন্ড' বলা হতো।

তিনি অনেকটা ঘরকুনো স্বভাবের লোক ছিলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে কাব্য সাধনায় নিয়োজিত থাকতেন। এটাই ছিল তাঁর মূল কাজ। কবি খুব একটা বাইরে যেতেন না। বহু গুণী ব্যক্তির নিমন্ত্রণও তিনি গ্রহণ করতেন না। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

> "আমি কাহারও স্তাবক নহি। আমি অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া হৈ চৈ করিয়া নিজের মান-মর্যাদা বাড়াইতে ইচ্ছুক নহি। বহুবার বহুস্থান হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীতে যোগ দিবার জন্য ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, দেশবন্ধু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, উমাচরণ সেন ও রমা প্রসাদ চন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়গণের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াও আমি জীবনে একদিনের জন্য কোন সভা-সমিতিতে কি কোন অধিবেশনে যোগদান করি নাই। ... আমি নিভৃতে নির্জনে বসিয়া কার্য্য করিতে ভালবাসি; কেননা সভা-সমিতির হট্টগোল আমার নিকট ভাল বোধ হয় না।"[৯৩]

ভক্তবৃন্দ ও সাহিত্যামোদীদের প্রবল আগ্রহ ও অনবরত জোর প্রচেষ্টার ফলে শেষ বয়সে কবি তার নিভৃত জীবনের অর্গল খুলে বাহিরে এসেছিলেন। সে সময় তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে

---

৯২. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৯৩. কায়কোবাদ, *কাব্য-কবি ও সমালোচক*, সম্পা. এম এ মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, পৃ. ২৮০

যোগদান করতঃ অভিভাষণ প্রদান করেছেন। সে সব অভিভাষণ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ হিসেবেই পরিগণিত।

১৯৩২ সালের ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কায়কোবাদ এ সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।[৯৪] এ সম্মেলনে বিশিষ্ট মুসলমান সাহিত্যিকের সাথে কতিপয় হিন্দু সাহিত্যিকও অংশগ্রহণ করেন। কবি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে পরিষদের নেতৃবৃন্দ ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানান। কবি হলরুমে প্রবেশ করে দেখেন তা জনাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম মঞ্চে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবেন তিনি। কায়কোবাদ মঞ্চে উঠেই তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। নজরুল উঠে দাঁড়ালেন এবং অচম্বিত বসে পরে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। উপস্থিত জনতা আনন্দিত হয়ে হাত তালি দিয়ে উঠল। কায়কোবাদ নিজের গলার মালা খুলে নজরুলের গলায় পড়িয়ে দিয়ে বললেন, বয়সের দাবীতে এঁরা আমাকে আজ সভাপতি করেছেন। কিন্তু সম্মানের প্রকৃত অধিকারী আপনি। নজরুল মালা হাতে আবার কবিকে সালাম করলেন। এরপর নজরুল গান ধরলেন- সে গান সারা হলে ঝড় বইয়ে দিল।[৯৫]

উল্লেখ্য, এর পূর্বেও কায়কোবাদ ও নজরুলের সাক্ষাত হয়েছিল। কায়কোবাদ আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবকে বিশেষ স্নেহ করতেন। কলকাতা গেলে তাঁর সাথে তিনি অবশ্যই দেখা করে আসতেন। কায়কোবাদ ও খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন কলকাতাস্থ 'মুসলিম জগতের' অফিসে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কথায় কথায় নজরুলের কথা উঠল। কায়কোবাদের অনুরোধে আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাদের নিয়ে গেলেন ধূমকেতুর অফিসে। সেখানে তুমুল আড্ডা চলছিল। সময়টা ছিল সন্ধ্যার পর। ধূমকেতুর ম্যানেজার শ্রী শান্তিপদ সিংহ তাদের নিয়ে গেলেন নজরুলের কক্ষে। আড্ডায় ছন্দপতন ঘটলো। নজরুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন বললেন, 'একে চেনেন? ইনি কবি কায়কোবাদ সাহেব।' নজরুল চিৎকার করে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন, ইনিই মহাকবি

---

৯৪. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯৫. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন: কায়কোবাদ-নজরুল সাক্ষাতকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

কায়কোবাদ সাহেব? অমর কাব্য মহাশ্মশানের গ্রন্থকার? আমাদের সকলের গুরু? এরপর নজরুল পায়ে হাত দিয়ে তাঁকে সালাম করলেন। কায়কোবাদ তাঁকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর চা বিস্কুট পান দিয়ে সমাদর করলেন। সেই সাথে নজরুল কবিতা আবৃত্তি করে শুনালেন। দরদ ভরা কণ্ঠে বেশ কিছু গানও শুনালেন।[৯৬]

কায়কোবাদ সভাপতির ভাষণে অসাধারণ জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিয়ে সকলের মন জয় করেন। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালের দৈনিক বঙ্গবাণী পত্রিকায় এভাবে খবর ছাপা হয়:

> "গতকল্য ২৫ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত মূল অধিবেশনে বাঙ্গলার সমস্ত বিশিষ্ট মুসলমান সাহিত্যিকগণ ও কতিপয় বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। ... বাঙ্গলার প্রথিতযশা কায়কোবাদ সাহেব মূল সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ... অতঃপর সভাপতিকে পুষ্পমাল্যদানে বরণকার্য্য সম্পন্ন হইলে সভাপতি কায়কোবাদ সাহেব তাঁহার সুচিন্তিত অনুপম অভিভাষণ প্রদান করেন।"[৯৭]

এ অভিভাষণে কায়কোবাদ বলেন:

> "আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বাঙ্গলা ভাষা কেবল আমাদের মাতৃভাষা নয়, জন্মভূমির ভাষা। ইহা হিন্দুরও ভাষা, মুসলমানেরও ভাষা। ইহার উপর হিন্দু-মুসলমান সকলের তুল্য অধিকার।"[৯৮]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে একটি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থীরা কায়কোবাদকে বিশেষ অনুরোধসহ আমন্ত্রণ জানায়। তাদের মধ্যে এমন কিছু ছাত্র ছিল যারা শুধু কবিকে দেখতে চেয়েছিল। কবি তাঁদের অনুরোধে সাড়া না দিয়ে পারেননি। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন:

---

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১

৯৭. *বঙ্গবাণী*, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫

৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

"আমার প্রিয় ও মাননীয় বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে দেখতে চেয়েছেন, দেখবার মত আমার মধ্যে কিছুই নাই, আমি আপনাদের মত একজন সাধারণ মানুষ, আমার কোন গুণ নেই - বিদ্যা নেই - বুদ্ধি নেই; বলবার মত কোন শক্তি নেই - energy নেই। লেখাপড়াও বিশেষ জানিনে, যদি কোন ভুলভ্রান্তি করে বসি নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন।"[৯৯]

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে ঢাকায় কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সংবর্ধনা পত্রে কবির উদ্দেশ্যে বলা হয়:

"কবিবর, যে যুগে আমরা পরানুকরণ করিয়া বাঁচিবার সাধনা করিয়াছিলাম। সেই যুগেই তোমার অভ্যুদয়। তুমি আমাদের মধ্যে প্রাণ সঞ্জীবন করিয়াছিলে, সঙ্কট-মূহুর্তে আমাদের শিরে পরাইয়াছিলে জয়ের মুকুট। আশাহীন দিনগুলি নূতন চেতনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরবময় পূর্ণ কথা ভুলিয়া আমরা গতানুগতিক হইয়াছিলাম, তুমিই প্রথম আমাদের অন্তরে আনিলে ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ। তোমার মহাশ্মশান কাব্যে মুসলিম গৌরবের শেষ কাহিনী ভাস্বর হইয়া আছে। তোমার 'মহরম শরীফ' আমাদের পাষাণ-কঠিন হৃদয়েও করুণার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবে।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য স্রষ্টাদের মধ্যে তোমার আসন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তোমার পূর্বগামীদের সঙ্গে তোমার পার্থক্য এই যে, তাহারা লিখিয়াছিলেন দেবতাদের কথা, তাঁহারা অন্বেষণ করিয়াছিলেন অপৌরুষের বাণী; আর তুমি লিখিয়াছ ধরণী-নিবাসী মানুষের কথা। সুখ-দুঃখ সম্বলিত, হাহাকার-আনন্দ-উদ্বেলিত বিচিত্র জীবনের সকল কাহিনী তোমার তুলির আচড়ে স্বর্ণাভ হইয়া রহিয়াছে।

---

৯৯. কায়কোবাদ, *কবির কথা*, ইসলামিয়া কলেজ ম্যাগাজিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। অন্ধকার যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য তুমি নূতন পথ-নির্দেশের বাণী আনিয়াছিলে।

যুগে যুগে নূতন সাহিত্য-ব্রতীদের মনে তোমার কবি-জীবন যেন উৎসাহের অক্ষয় উৎস হিসাবে বর্তমান থাকে, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।"[১০০]

সম্বর্ধনা পত্রের জবাবে কবি জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা পেশ করেন। এর চৌম্বক অংশগুলো হলো:

"চিরদিন অপরের কথা শুনিয়া আমরা নিজেদের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল আমাদের ভাণ্ডে পরিচয় দিবার উপযোগী অমূল্য রত্ন যথেষ্ট রহিয়াছে। এতদিন শুধু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পরের নিকট হাত পাতিয়াছি। এই ভাবে প্রতিনিয়ত অকল্যাণ ও সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। এই অকল্যাণ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। আমরা গুটিকয়েক দীন সাহিত্য সেবক যথেষ্ট অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খোদাতালার অনুগ্রহে এই কাব্যে হাত দিয়াছিলাম। জয়যুক্ত হইয়াছিলাম কিনা তাহা আপনারা বিচার করিবেন।"[১০১]

কবি আরো বলেন:

"আজিকার যুগের সাথে আমার যুগের পার্থক্য আছে। আপনারা অনেক কিছু নতূন সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনারা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। ভয়ে ভয়ে সেইখানে উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করি কিন্তু ঢুকিবার সাহস হয়না। আলোতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাই। নির্জ্জনে যাইয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করি। সঙ্গী-সাথী যাহারা ছিল তাহারাও জীবনের পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, আমি শুধু জীবনের সমুদ্র-সৈকতে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন ঢেউ গুণিয়া চলিয়াছি। দিন শেষ হইতে চলিয়াছে, আলো নিভিতেছে - এ সময় আমার পক্ষে জন সমাজের মধ্যে আসিয়া নূতন কোন কথা বলা সাজেনা।"[১০২]

---

১০০. মাসিক মোহাম্মদী, *কায়কোবাদ সম্বর্ধনা*, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, ১৭তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

১০১. *প্রাগুক্ত*

১০২. *প্রাগুক্ত*

কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন উক্ত সম্বর্ধনা সভার সভাপতি। সভাপতির ভাষণে তিনি কায়কোবাদের উদ্দেশ্যে বলেন:

> "কবি কায়কোবাদের সম্বর্ধনা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের আত্মপ্রতিষ্ঠারই সম্বর্ধনা। সে যুগে পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, মীর মশাররফ হোসেন, কবি মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ- এঁরাই ছিলেন মুসলমান লেখকের অগ্রদূত। এঁদেরই বর্তিকাতলে সমবেত হয়েছিলেন রওশন আলী চৌধুরী, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, শেখ রেয়াজউদ্দীন, ইসমাঈল হোসেন শিরাজী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ এমদাদ আলী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ ইসলামের পতাকাধারী সাহিত্যিক দল। এঁরাই মুসলমান সমাজকে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে সহায়তা করেন। এ যেন আকাশে তারা ফোঁটার মত, প্রথমে চার পাঁচটি, তারপর আরও কয়েকটি, আরও কয়েকটি, তারপর অগণিত। কবি কায়কোবাদ প্রাথমিক পঞ্চপ্রদীপের একটি, তাঁকে সম্বর্ধনা করে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নিজেকেই গৌরব দান করেছে। এ যেন কিশোর যুবকের পক্ষে প্রপিতামহের সম্বর্ধনা। প্রপিতামহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন, এদের ভিতর তাঁর কল্পনার অভাবনীয় প্রকাশ, আর এরাও আশীর্বাদ বহন করে এগিয়ে চলেছে নতুন নতুন শক্তির সন্ধানে। সেই আশীষ অশেষ কল্যাণবাহী, শক্তি-সঞ্চারী এবং আদর্শ-নির্দেশী।[১০৩]"

১৯৪৪ সালের ২রা মার্চ কায়কোবাদকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আজীবন সভ্য পদে ভূষিত করা হয়। হলের অধ্যক্ষ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর অভিভাষণে কবিকে সংবর্ধনা করেন এবং কবিও এর জবাবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন।[১০৪]

১৯৪৫ সালের ১৫ এপ্রিল বিকেল সাড়ে চারটায় কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে কায়কোবাদকে আড়ম্বরপূর্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। তদানীন্তন হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকগণ এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে কবিকে উদ্দেশ্য করে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। এতে বলা হয়:

---

১০৩. *প্রাগুক্ত*

১০৪. *সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী*, ১৬শ সংখ্যা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

"তোমার শিল্প প্রয়াসের মধ্যে সাধনার একাগ্রতা লক্ষ করিয়াছি। ... তোমার একান্ত সাধনায় আমরা যে জীবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সত্যের প্রদীপ্ত শিখায় তাহা ভাস্বর, প্রাণের একনিষ্ঠ বাণীতে তাহা মুখর এবং নৈতিক প্রভায় তাহা জাজ্বল্যমান। ... তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আমরা সাহিত্য জগতে আমাদের ক্রমবর্ধমান বিচিত্র রূপকে স্বীকার করিতেছি। জাতীয় সাহিত্যের হে মহাকবি, তোমার বাণীতে আমাদের জন্য রহিয়াছে নবজীবনের প্রাণবন্ত স্বাক্ষর।[১০৫]"

অভিনন্দন পত্রের উত্তরে কবি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। কবি বলেন:

"স্বাস্থ্যহীন সম্পদহীন অবস্থায় ক্ষুদ্র পল্লীতে আমি আমার সময় কাটাইয়াছি। বাহিরের জগতকে জানিবার বাসনা আমার খুব প্রবল ছিল। কিন্তু আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ... আমার প্রিয় তরুণ নওজোয়ান বন্ধুগণ, আপনারাই এখন আমাদের আশা ভরসার স্থল। আপনাদের উপরেই আমাদের মঙ্গলামঙ্গল উত্থান-পতন সমস্তই নির্ভর করে।"[১০৬]

উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন বহুভাষাবিদ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি তার ভাষণে বলেন:

"মহাকবির কাব্যের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁহার মহাকাব্য মহাশ্মশানের সমালোচনার সময়। কবি সৈয়দ এমদাদ আলী তাঁর মহাশ্মশানে অনৈসলামিক ভাবের সন্ধান পান ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁর সমুচিত জওয়াবও যথা সময়ে হইয়াছিল। সেই সময়েই আমি তাঁর কবিতা পড়ি এবং মুগ্ধ হই। অনেকেই কবিকে মহাকবির আসন দিয়াছেন এবং আমিও তাঁকে সেই উঁচু আসন দিই। ... কবিকে শুধু কথায় স্তুতিবাদ জানাইলেই তাঁহার প্রতি সত্যিকারের সম্মান দেখান হইবেনা। গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়া তাঁর সম্মান দেখাইবার ভার আজ বাংলার সাহিত্যিক বিশেষভাবে তরুণ সাহিত্যিকগণকে গ্রহণ করিতে হইবে। কবির জীবনী এবং কাব্য আলোচনার ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুরূপে একাজ হইতে পারে।"[১০৭]

---

১০৫. *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৮শ বর্ষ; ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৪

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

১০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কায়কোবাদ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অনুষ্ঠানে সাহিত্য সম্পর্কে তিনি এক সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন।[১০৮]

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মহাকবি কায়কোবাদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সভাপতি বিদগ্ধ গবেষক কাজী মোতাহার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। কায়কোবাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, কবিকে এক নজর দেখা এবং তাঁর কথা শুনার জন্য হাজারো ভক্ত সেদিন এখানে ভীড় জমায়। কবি তাঁদের নিরাশ করেননি। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা পেশ করে ভক্তবৃন্দের তৃষিত হৃদয়কে শীতল করেন।[১০৯]

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ইকবাল স্মৃতি বার্ষিকীর 'মুশায়েরা' বা কবি সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। কবি এ সম্মেলনে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এখানে ইকবাল স্মরণে তিনি 'অশ্রু উপহার' নামে একটি কবিতাও পাঠ করেন। কবির ইন্তিকালের পর কবিতাটি 'মাহে নও' এর আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় ছাপা হয়। কবি আর কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেননি। এটিই তার সাহিত্য জীবনের শেষ পদচারণা।[১১০] কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা হলো 'প্রেমের পাগল'। এটি 'মাহে নও' পত্রিকায় কবির মৃত্যু সংবাদসহ ছাপা হয়।[১১১]

---

১০৮. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

১১০. *মাহে নও*, তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩

১১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

নবম পরিচ্ছেদ

কবি সর্ম্পকে বিশিষ্টজনের বক্তব্য

কবি বন্ধু ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 'মাহে নও' পত্রিকায় তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন:

> "২০ জুলাই শুক্রবার বৈকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি তখন রোগে জীর্ণ হলেও তাঁকে ভাল দেখাচ্ছিল। আমি আনন্দিত হয়ে বলে উঠেছিলাম, কবি সাহেব! আপনি আল্লাহর মর্জি এবার সেরে উঠলে ১২০ বৎসর বাঁচবেন। তাতে তিনি কেবল মৃদু হেসেছিলেন। হায় আমাদের আশা কত ছলনাময়ী।"[১১২]

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কবিকে হাসপাতালে দেখে আসার পর দিনই তিনি পরপারে যাত্রা করেন। কায়কোবাদের মৃত্যুতে বাংলার সাহিত্য সমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রিন্ট মিডিয়ায় কবির মৃত্যু সংবাদের সাথে সাথে সম্পাদকীয় এবং কবি সাহিত্যিকদের শোকাভিভূত প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> "বাংলা সাহিত্যের গত এক শতাব্দীর নিশানবরদার 'মহাশ্মশান', 'অশ্রুমালা', 'শিব-মন্দির' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা মহাকবি কায়কোবাদ গত ২১ শে জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনতেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ...)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। কায়কোবাদের এনতেকালে বর্তমান বাংলা সাহিত্যজগতের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ও খ্যাতিমান ব্যক্তি লোকান্তরিত হলেন। সহজ ও অকুণ্ঠ বর্ণনা ও আবেগ প্রধান কাব্যভঙ্গির প্রাচীন ধারাকে তিনি কয়েকটি যুগের সাম্প্রতিক দিক চিহ্ন অতিক্রম করে আজকের দিন পর্যন্ত বয়ে এনেছেন। এদিক দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি বিরাট ঐতিহ্যের ধারক। বাংলার মুসলিম সমাজের তিনি গৌরব স্বরূপ। সেকালে উচ্চাঙ্গ বাংলা ভাষায় সাহিত্য-কীর্তি মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব বলে অনেকে মনে করতেন।

---

১১২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, মাহে নও, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

মহাকবি কায়কোবাদই তখন সেই অপবাদের সুযোগ্য প্রত্যুত্তর হস্তে আবির্ভূত হন। কায়কোবাদের তিরোধানে সারা দেশই আত্মীয় বিয়োগের ব্যাথা অনুভব করবে।"[১১৩]

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদকীয়তে কায়কোবাদের মৃত্যু ও জাতীয় জীবনে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়:

"২১ শে জুলাই তারিখে পূর্ব পাকিস্তানের প্রবীণতম কবি ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন (ইন্নলিল্লাহে ... রাজেউন)। দশম দশকে পৌঁছিয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর জন্য দুঃখ নাই। দুঃখ এই যে ত্রিযুগদর্শী কবির মৃত্যুতে অতীতের সহিত বর্তমানের একটা সংযোগ ছিন্ন হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে যখন বাংলা সাহিত্যে মুছলমানের নামও কেহ করিতনা সেই যুগে কায়কোবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।"[১১৪]

কায়কোবাদের মৃত্যুতে সমকালীন মুসলিম সাহিত্য সমাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠে। তদানীন্তন পত্র-পত্রিকায় বহু কবি সাহিত্যিক কায়কোবাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। কেউ কেউ কবিকে উদ্দেশ্য করে কবিতাও রচনা করে। অনেকে কবির সাহিত্যকর্ম নিয়েও আলোচনা করে।

'মাহে নও' পত্রিকায় কবি বন্দে আলী মিয়া তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে:

"সহসা সংবাদ পত্রে পাঠ করিলাম কবি কায়কোবাদ আর ইহজগতে নাই। চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল, মনের পর্দায় ভাসিয়া উঠিল কবির চারু-দর্শন সৌম্য শান্ত মূর্তি। সাহিত্য জগতের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে আমরা হারাইলাম।"[১১৫]

মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন:

---

১১৩. *মাহে নও*, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২০

১১৪. *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

১১৫. *মাহে নও*, তৃতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারার অন্যতম উদগাতা মহাকবি কায়কোবাদের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আশ্রয় নিল।[১১৬]"

কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাময়িক পত্রে অনেকে কবিতা লিখেছেন। কবি মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 'মহাশ্মশানের কবিকে' শিরোনামে একটি কবিতা লিখেন। এর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ:

আপনার আত্মার খোঁজ রাখি নাই আমরা সেদিন
সম্বিৎ হারায়ে মোরা ছিন্ন তাই গতানুগতিক
তোমার কাব্যের ঢেউ এনে দেয় প্রেরণা নির্ভীক;
সেই কাব্য প্রাণে তাই দাগ কাটে চির অমলিন।[১১৭]

'মাহে নও' পত্রিকায় মীজানুর রহমানের 'তসলীমাৎ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের শেষে কায়কোবাদকে নিবেদনকৃত একটি কবিতা সংযোজিত হয়। এতে বলা হয়:

প্রবীণ প্রেমের কবি তুমি কায়কোবাদ
তসলীম মোদের লই! প্রেমের সোয়াদ
... ...
প্রেমের মরণ নাহি, তেমনি অমর
প্রেমের পীযুষ পিয়ে প্রেমিক প্রবর।[১১৮]

'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় মোতাসিম বিল্লাহ কায়কোবাদ শীর্ষক কবিতায় বলেন:

একাল যদিও নয়া, তবুও অনেক দাম সে পুরাতনের
তুমি নাই মহাকবি, রাখিয়া গেলে কি শুধু এ 'মহাশ্মশান'
এগিয়ে যাবার দিনে তুমিও তো গেয়েছিলে নতুনের গান।[১১৯]

---

১১৬. আহমদ শরীফ, *মহাকবি কায়কোবাদ, মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৫

১১৭. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, *মহাশ্মশানের কবিকে, মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ; ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫৬

১১৮. মীজানুর রহমান, *তসলীমাৎ, মাহে নও*, ৩য় বর্ষ; ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

একই পত্রিকায় মুযহারুল ইসলাম রচিত 'অস্তপারের পাখী' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। এতে কায়কোবাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়:

তবু বিস্ময়
এত অগণন গান গেয়ে যাওয়া
সে সহজ নয়।
আরেক যুগের কণ্ঠ
এ যুগেও দেখেছে আলোক
এ যুগেও গেয়ে গান
সে তো বিস্ময়!
অকস্মাৎ কোন ঝড়ে সে বিস্ময় কোথা হারালাম
হে হারানো পাখী আজ
তোমারেই জানাই সালাম।[১২০]

কায়কোবাদের ইচ্ছে ছিল তাঁকে স্বীয় জন্মভূমি আগলা পূর্ব পাড়া গ্রামে যেন সমাহিত করা হয়। কিন্তু কবির ইচ্ছের প্রতি অবহেলা করে ঢাকার আজিমপুর পুরাতন কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। উল্লেখ্য, কবি চেয়েছিলেন কবির স্ত্রী তাহের উন্নেসা খাতুন যেন তাঁর পাশেই সমাহিত হন। কবির মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁর স্ত্রী ইন্তিকাল করেন। তাঁকে কবির পাশেই সমাহিত করা হয়।

কায়কোবাদ তাঁর সমাধী ফলকে উৎকীর্ণ করার জন্য একটি স্মৃতিলিপি লিখে গিয়েছিলেন। সেটি তাঁর কবরে উৎকীর্ণ করা হয়। স্মৃতিলিপিটি নিম্নরূপ:

কায়কোবাদের জন্মভূমি
আগলা পূর্ব পাড়া,
ইছামতী নদীর তীরে
সকল গ্রামের সেরা।

---

১১৯. মোতাসিম বিল্লাহ, *কায়কোবাদ*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫৬
১২০. মুযহারুল ইসলাম, *অস্তপারের পাখি*, *মাসিক মোহাম্মদী*, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৫৫

পিতা তাহার এমদাদ আলী

জরিফ উন্নিসা মাতা,

গোড়াইল তাহার পৈত্রিক ধাম

তাহের উন্নিসা পত্নী তাহার শুয়ে আছে পাশে

শোভিত সমাধী যাহার

শ্যামবর্ণ ঘাসে।

কে যাও পথিক! দাড়ায়ে কিছু

কর আশীর্বাদ।

ঘুমিয়ে রয়েছে হেথা

কবি কায়কোবাদ।[১২১]

১২১. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

দশম পরিচ্ছেদ

শেষ জীবন ও মৃত্যু

কায়কোবাদ চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে প্রিয় জন্মভূমি আগলা পূর্ব পাড়ায় বসবাস করেন। মাঝে মাঝে বোন ও মেয়েদের বাসায় বেড়াতে যেতেন। এক্ষেত্রে কবি দুহিতা জাহানারা বেগমের বাসায় বেশি থেকেছেন। জাহানারা বেগমের স্বামী খান সাহেব আবদুল গফুর যখন কলকাতা চাকুরীস্থলে অবস্থান করছিলেন তখন কবি সেখানে সময় কাটিয়েছেন। অতঃপর এ দম্পতি যখন ঢাকার ১১, সেগুন বাগিচায় চলে আসে তখন কবি এখানে তাঁদের সাথেও থেকেছেন।

চাকুরী জীবনে কবি কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেননি। অবসর নেওয়ার পর কলকাতা ও ঢাকাসহ বিভিন্ন সাহিত্য সভায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছেন। শেষ বয়সে ধর্মে-কর্মে নিবিষ্ট হয়ে উঠেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযসহ বিভিন্ন অজিফাও তিনি পাঠ করতেন। এসময় কলকাতার তালতলাস্থ খানকা শরীফের সৈয়দানা হযরত ইরশাদ আলী আল কাদেরী (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রিয় মুর্শিদের নির্দেশেই নব্বই ঊর্ধ্ব বয়সে রচনা করেন ‘গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ’ কাব্য।

তিনি এসময় তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত নানা রোগ তাঁকে পেয়ে বসে। শরীর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল। সেই সাথে দৃষ্টিহীনতা তাঁকে আরো কাবু করে ফেলে। ফলে আত্মজীবনী আর শেষ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি।

অবশেষে ১৮ জুন ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে আগলা পূর্ব পাড়া নিজ বাড়ীতে রক্ত আমাশয়ে তিনি আক্রান্ত হন। শারীরিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলে তাঁকে ৩ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই মোতাবেক ৪ শ্রাবণ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ শনিবার সোয়া তিনটায় মহাকবি কায়কোবাদ মহান স্রষ্টার ডাকে সাড়া দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

মহাকবি কায়কোবাদের সাহিত্যের পরিচয়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ সাহিত্যের পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের সাহিত্য ভাবনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের খণ্ড কাব্য বা গীতি কাব্য

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের কাহিনীকাব্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের চম্পু ও জীবনীকাব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ
সাহিত্যের পরিচয়

সাহিত্য শব্দ হতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য শব্দের মধ্যে মিলনের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এই মিলন মানুষের সাথে মানুষের, অতীতের সাথে বর্তমানের, দূরের সাথে নিকটের অন্তরঙ্গ যোগসাজস। উইকিপিডিয়ায় বলা হয়েছে, "সাহিত্য বলতে যথাসম্ভব কোন লিখিত বিষয়বস্তুকে বুঝায়। সাহিত্য শিল্পের একটি অংশ বলে বিবেচিত হয়, অথবা এমন কোন লেখনি যেখানে শিল্পের বা বুদ্ধিমত্তার আঁচ পাওয়া যায়, অথবা যা বিশেষ কোন প্রকারে সাধারণ লেখনি থেকে আলাদা। মোটকথা ইন্দ্রিয় দ্বারা জাগতিক বা মহাজাগতিক চিন্তা চেতনা, অনুভূতি, সৌন্দর্য্য ও শিল্পের লিখিত বা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতি হচ্ছে সাহিত্য। ধরন অনুযায়ী সাহিত্যকে কল্পকাহিনী বা বাস্তব কাহিনী কিংবা পদ্য, গদ্য এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। পদ্যের মধ্যে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি। গদ্যের মধ্যে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি শাখা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এছাড়াও অনেকে নাটককে আলাদা প্রধান শাখা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেন। নাটকের মধ্যে নাটিকা, মঞ্চনাটক ইত্যাদি ভূক্ত করা যায়।"[১২২]

সাহিত্যের পরিধি সম্পর্কে ড. হায়াত বলেন, "সাহিত্য বিশাল পরিধির একটি বিষয়। আমরা সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য' বলি বটে, কিন্তু বিচারের সময়ে গদ্য, পদ্য কিংবা গল্প উপন্যাস কবিতা নাটক ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্রা-বিশ্লেষণ করে হৃদয়ঙ্গম করি। সার্বিকভাবে সাহিত্যের রূপ বলতে আমরা সাহিত্যের বিভিন্ণ শাখা বুঝে থাকি, যেমন-কবিতা, মহাকাব্য, নাটক, কাব্যনাট্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা ইত্যাদি।"[১২৩]

---

১২২ . *বাংলা উইকিপিডিয়া*

১২৩. হায়াত মামুদ, প্রবন্ধ: সাহিত্যের রূপ ও রীতি, বাংলা সাহিত্য, দখিল নবম-দশম শ্রেণি ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৭ খ্রি.), ২য় পরিমার্জিত , পৃ.১৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদের সাহিত্য ভাবনা

কায়কোবাদ জন্মেছিলেন এমন এক পরিবারে যেখানে জ্ঞানচর্চার বিষয়টি ছিল তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্য। বংশ পরম্পরা তাঁরা জ্ঞানের অনুশীলনে সম্মানের পাত্র ছিলেন। পৈত্রিক দিক থেকে তিনি পেয়েছিলেন জ্ঞানের উত্তারাধিকার এবং মাতার দিক থেকে পেয়েছিলেন শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার ঐতিহ্য। আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইছামতী নদীর পাগল করা ঢেউ কায়কোবাদের হৃদয় মানসকে কাব্যরসিক করে তুলেছিল।

ঢাকার মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যয়নকালে তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্যার ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী কায়কোবাদকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি ছিলেন কাব্যরসিক মানুষ। তাঁর কাছ থেকে কায়কোবাদ অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন।[১২৪] এ সময় তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও হেমচন্দ্রের (১০৮৮-১১৭৩) কবিতার সাথে পরিচিত হন। এরপর পরিচয় ঘটে নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) কবিতার সঙ্গে। এরা সবাই মহাকাব্য রচয়িতা। এঁদের রচনার প্রতি কায়কোবাদ তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন। ফলে এঁদের প্রভাব তিনি কোন ভাবেই এড়াতে পারেননি।[১২৫] কায়কোবাদের সাহিত্য জীবনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. প্রথম পর্ব বা উন্মেষ পর্ব

২. দ্বিতীয় পর্ব বা আখ্যান পর্ব

৩. তৃতীয় পর্ব বা বৈচিত্র পর্ব

উন্মেষ পর্ব : কায়কোবাদ কাব্য জগতে আবির্ভূত হয়েছেন গীতি কবিতা দিয়ে। কাব্য জগতে তাঁর উন্মেষ ঘটে বিরহ বিলাপ (১৮৭০) কাব্যের মধ্য দিয়ে। এর ধারাবাহিকতায় তিনি রচনা করেন কুসুম কানন (১৮৭৩) কাব্য–এটিও গীতি কাব্য। এ দু'টি কাব্যের মান তেমন উন্নত নয়–এর মাধ্যমে তিনি সাহিত্য জগতে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন মাত্র। অতঃপর তিনি রচনা

১২৪. এম.এ মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

করেন অশ্রুমালা (১৮৯৬) কাব্য। এটিও গীতি কাব্য। এটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আবির্ভূত হন। এ কাব্যের মতো তিনি আরো দু'টি সার্থক গীতি কাব্য রচনা করেন। সেগুলো হচ্ছে অমিয় ধারা (১৯২৩) ও প্রেমের ফুল (১৯৪৬)।

আখ্যান পর্ব: কায়কোবাদ প্রথম দিকে গীতি কাব্য রচনা করলেও এক পর্যায়ে তিনি কাহিনীকাব্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। মহাশ্মশান (১৯০৫) প্রকাশের পর তিনি বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই পরিগণিত হন। এর ধারাবাহিকতায় তিনি শিব মন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯২১), মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩), শ্মশান ভস্ম (১৯৩৮), প্রেমের রাণী (১৯৭০) ও প্রেম পারিজাত (১৯৭০) রচনা করেন।

বৈচিত্র পর্ব: গীতি কাব্য ও কাহিনী কাব্য ছাড়াও কায়কোবাদ বৈচিত্রপূর্ণ কিছু কাব্য রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি কিছু গদ্য রচনাও করেছেন। এগুলো শেষ বয়সের রচনা।

কায়কোবাদের সমগ্র সাহিত্যকর্মকে চারটি ভাগ করা যায়। যথা:

ক. খণ্ড কাব্য বা গীতি কবিতা

খ. কাহিনী কাব্য

গ. চম্পু কাব্য

ঘ. গদ্য রচনা

কবি কায়কোবাদ দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন, লিখেছেনও বিস্তর। তাঁর এসব রচনায় ফুটে উঠেছে সমাজ ও জাতি নিয়ে গভীর ভাবনা। কবি অল্প বয়সে মা-বাবা হারিয়ে অসহায় জীবন যাপন করেছেন। প্রিয়জনদের অবহেলায় মর্মাহত হয়েছেন। ফলে তিনি দরিদ্র-অসহায়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। দয়াদ্র দৃষ্টি ছিল তাদের প্রতি। তাঁর কাব্যে তাদের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। শিব মন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্যে সদরদ্দীন ও তার পরিবারের করুন কাহিনী তিনি অসাধারণ মুনশীয়ানায় তুলে ধরেছেন। আর আলাউদ্দীনের দুঃখ বেদনা এমনকি তার নিহত হওয়া– এ কাব্যের পাঠকদের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত করেছে। কবি প্রেমিক ছিলেন। শৈশবে ভালোবাসতেন প্রতিবেশী জমিদার কন্যা গিরিবালা দেবীকে। কিন্তু বাল্য প্রেম সফলতার মুখ দেখেনি। কিন্তু কবি

ভুলতে পারেননি শৈশবের প্রেয়সিকে। তাঁর কাব্যের পরতে পরতে শ্বাশত প্রেমের জয় গান গেয়েছেন। তাঁর কাব্যে প্রেম হয়ে উঠেছে অন্যতম উপজীব্য বিষয়। কবি জন্মেছিলেন এমন এক পরিবারে যে পরিবার দীর্ঘদিন ইসলামী ঐতিহ্য ধারন করে আসছিল। আর তিনি জন্মেছিলেন এমন এক সময় যখন শুধু তাঁর পরিবার নয় গোটা জাতি ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে পরাজিত হয়ে বিপর্যস্ত জীবন-যাপন করছিল। সঙ্গত কারণেই তিনি হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য খুঁজে বেরিয়েছেন। কবি বাঙালি ছিলেন, ছিলেন খাঁটি মুসলিম। খাঁটি আরবীয় রক্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি কোনটিকেই এক মুহূর্তের জন্য অস্বীকার করেননি। তিনিই সর্বপ্রথম দুভাষী মুসলিম বাংলা সাহিত্যকে খাঁটি বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছেন। সেই সাথে আরবী-ফারসি শব্দের যথার্থ ব্যবহার দ্বারা তিনি বাংলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন খাঁটি মুসলিম। মহান আদর্শ ইসলামের প্রতি তিনি ছিলেন একনিষ্ট। ফলে তাঁর কাব্যে ফুটে ইসলামী ভাবধারা। তবে এজন্য তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অসামপ্রদায়িক চেতনায় সমৃদ্ধ এক দিব্য পুরুষ। তিনি মুসলমানদের গৌরব রচনা করেছেন সেই সাথে হিন্দুদেরও গৌরব রচনায় কাপর্ণ্য করেননি। কবির বংশ ছিল বীর বংশ কুরাইশ। জাতিতে তিনি বীর জাতির মুসলিম সন্তান ছিলেন। ফলে তাঁর কাব্যে বীরত্বের মহত্ত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদের খণ্ড কাব্য বা গীতি কাব্য

ইংরেজি Lyric শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে খণ্ড কাব্য বা গীতি কাব্য বা গীতি কবিতা। গ্রীক লেখকগণ Lyric বা বীণাযন্ত্রের সঙ্গে পরিবেশিত গানকে Lyric বলত। তবে বর্তমানে বীণা বা কোনো বাদ্যযন্ত্রের সাথে এর অপরিহার্য কোনো সম্পর্ক নেই। এখন গীতি কবিতা বলতে বুঝায়, যে কোনো ছোট একটি কবিতা যা কাহিনী বা গল্প বর্ণনা করে না, যার মধ্যে একজন মানুষের মনের ভাব, অনুভূতি বা চিন্তাধারার সস্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটে।[১২৬] রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গীতি কবিতার একটি মাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টলটল করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সংঘ ঝর্ণায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে।[১২৭] শ্রীশ চন্দ্র সেন তাঁর সাহিত্য সন্দর্শন গ্রন্থে বলেন, " কবির একান্ত ব্যক্তি অনুভূতি যখন সহজ ও সাবলীল গতিতে সঙ্গীতমূখর হইয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখনই গীতি কবিতার জন্ম। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বরাত দিয়ে বলেন, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতি কাব্য।' গীতি কবিতা অনুভূতির প্রকাশ বলিয়া সাধারণত: দীর্ঘকায় হয় না। কারণ, কোন অনুভূতিই দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়।"[১২৮] তিনি আরো ব্যাখ্যা করে বলেন," অধুনা যে কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও আনন্দ বেদনা তাঁহার প্রাণের অন্তস্থল হইতে আবেগ-কম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাকেই গীতি কবিতা বলে। ইহাতে পরিপূর্ণ মানব-জীবনের ইঙ্গিত নাই, ইহা একক পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ। কবি এইখানে আত্ম-বিমুগ্ধ, তাই সমস্ত কবিতা ব্যাপিয়া তাহার প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করা যায়। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বৈশিষ্ট্য , অথবা মানসিকতা ইহাকে সিগ্ধতা আর প্রশান্তি দান করেছে। তাঁহার চরিত্রের কমনীয়তা, নমনীয়তা বা দৃঢ়তা ইহাতে প্রতিফলিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, গীতি কবিতা কবির আত্ম-মুকুর।"[১২৯] কবি কায়কোবাদ গীতি কবিতা

---

১২৬. বদউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১৪৮-১৪৯

১২৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

১২৮ . শ্রীশ চন্দ্র দাস, *সাহিত্য সন্দর্শন* (কলকাতা: শ্রীমান অর্জ্জুন দাশ ও শ্রমতি নন্দিনী দাশ, ১৯৬০ খ্রি.), ৪র্থ সং. পৃ. ৫৭

১২৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

সম্পর্কে বলেন, "প্রেম, প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতা সংবলিত কাব্যই- খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য। সামান্য একটি ব্যতীত উহার কোনই লক্ষ্য নাই। উহা সুগন্ধি ফুলের মত কবি হৃদয়ের নানা সময়ের নানা ভাবের অভিব্যক্তি। উহা বসন্তকালের মওসুমী ফুলের মত সময় বিশেষে প্রস্ফূটিত হইয়া- সৌরভে ও সৌন্দর্যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া কিছুকাল পরে ধ্বংস সাগরের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তবে কোন কোন কবিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বটে, উহার সংখ্যা অত্যল্প।"[১৩০]

মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব পদাবলীতে গীতি কবিতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তবে এর প্রকৃত সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তখনকার কবিদের হাতে গীতি কবিতা বিকাশ লাভ করেছে। কবি কায়কোবাদ প্রথমে গীতি কবিতাই নির্মাণ করেছেন, যদিও কাহিনী কাব্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি।

কবি কায়কোবাদের প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা মোট তেরটি। এর মধ্যে পাঁচটি খণ্ড বা গীতি কবিতার সংকলন। এগুলো হচ্ছে:

১. বিরহ বিলাপ (১৮৭০)

২. কুসুম কানন (১৮৭৩)

৩. অশ্রুমালা (১৮৯৬)

৪. অমিয় ধারা (১৯২৩)

৫. প্রেমের ফুল (১৯৪৬)

১- বিরহ বিলাপ

'বিরহ বিলাপ' কায়কোবাদের প্রথম কাব্য গ্রন্থ। কবির কৈশোর জীবনের সূচনলগ্নে মাত্র তের বছর বয়সে এ কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে এর প্রকাশকাল। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ঢাকার বাংলা বাজারের একজন মহৎপ্রাণ পুস্তক প্রকাশক। 'বিরহ বিলাপ' প্রকাশের পর তৎকালীন সুধী সমাজে বালক কবির কাব্য প্রতিভা আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'বিরহ বিলাপ' পড়ে

১৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

মুগ্ধ হয়ে কাশিম বাজারের মহারাণী কবিকে দশ টাকা উপহার দিয়েছিলেন। এমনকি কাশির ভূবণ মোহিনী চৌধুরাণীও কবির জন্য পাঁচ টাকা উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন।[১৩১]

এ সময় কবি মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার জৈনসার ইউনিয়নের খিলগাঁও গ্রামে অবস্থিত ভগ্নিপতি আফতাব উদ্দীন আহমেদের বাড়িতে অবস্থান করতেন। কবির প্রতিবেশী জমিদার কন্যা গিরিবালা দেবীও 'বিরহ বিলাপ' পাঠ করেন এবং কবির ভক্ত হয়ে ওঠেন। এক জ্ঞাতি ভ্রাতার মাধ্যমে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিরিবালা 'বিরহ বিলাপের' প্রতি মুগ্ধতা জানিয়েছিলেন।[১৩২]এক পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে এবং দু'জনের মধ্যে প্রণয় গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে কবির নিকটতম ব্যক্তি ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন:

> "তরুণ কবির কাব্য পাঠ করে এক তরুণী তাঁর প্রতি ভক্তিমতী হয়ে উঠেন। তাঁর নাম গিরিবালা দেবী; কবি তাতে কবিতা রচনায় বিশেষ উৎসাহ পান। কবি তাঁর 'অশ্রুমালা' কাব্যের কয়েকটি কবিতা এই গিরিবালার নামে উৎসর্গ করেন। কবি আমার কাছে অনেকবার আবেগ ভরে গিরিবালার কাহিনী বলেছিলেন।"[১৩৩]

কবি গিরিবালা দেবীকে নিয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। অশ্রুমালা কাব্যের 'ভুল' কবিতাটির প্রথম ছয়টি পংক্তির আদ্যক্ষর একত্রিত করলে কবির প্রণয়ীর নাম পাওয়া যায়। কায়কোবাদের কবিতার মূল সুর প্রেম। কবির জীবনে গিরিবালা দেবীর আগমন এবং সমাজ ব্যবস্থার নির্মম কুঠারাঘাতে বিরহের যন্ত্রণা তাঁর কাব্যশক্তিকে আরোও শাণিত করেছে। কবির প্রণয়ী, প্রণয়ের স্মৃতি, প্রেমে ব্যর্থতা, প্রেয়সীর করুণ পরিণতি প্রভৃতি আমৃত্যু তাঁকে তাড়িয়ে বেরিয়েছে। তিনি একদিনের জন্যও বাল্য প্রেমের অমর স্মৃতিকে ভুলতে পারেননি। তিনি বিরহ-বেদনায় ব্যথিত হয়েছেন, বিকশিত হয়েছে তার প্রেম ভাবনা এবং রচনা করেছেন কালজয়ী প্রেমের কবিতা।

গিরিবালা দেবী কবিকে উৎসাহিত করেছেন কাব্য রচনায়। কবি প্রেয়সীর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়েছেন- একের পর এক কবিতা রচনা করেছেন। এক সময় প্রণয়ীকে হারিয়েছেন কিন্তু কাব্য প্রেম বিলুপ্ত হয়নি। এগিয়েছেন শুধু কাব্য সাধনায়, পিছন ফিরেছেন শুধু স্মৃতি অবলোকনে

---

১৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

১৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭-৮৮

১৩৩. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *মহাকবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

কাব্য সাধনা থামাতে নয়। 'বিরহ বিলাপ' কবির কাঁচা বয়সের রচনা হওয়ায় এটি তেমন কাব্য সুষমামণ্ডিত নয়। শৈল্পিক বিচারে এর গুরুত্ব কম হলেও পরবর্তী কাব্যের প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কবি প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পাথেয় হিসেবে 'বিরহ বিলাপ'-এর ঐতিহাসিক অবদান অনস্বীকার্য।

'বিরহ বিলাপ' কবি কায়কোবাদের প্রথম খণ্ড কবিতার সংকলন এবং এর মধ্য দিয়েই কবির সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে। গীতি কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কম থাকলেও এর মাধ্যমেই তিনি এগিয়ে গেছেন কাহিনী কাব্য রচনার পথে। বর্তমানে কাব্যগ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর কোন কপি পাওয়া যায়নি। এমনকি কবির জীবদ্দশাতেই এর কোন কপি সংরক্ষিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন:

> "আমি শৈশব হতেই কবিতা লিখতে পারতুম। আমি যখন বার বৎসর বয়স্ক বালক সেই সময় আমার 'বিরহ বিলাপ' নামক ক্ষুদ্র একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়। সেটা আমার ১০/১২ বৎসরের লেখা। কিছু টাকা পেয়ে উহার সমস্ত কপিই একটি পুস্তক বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করে ফেলেছিলুম, একটি কপিও আমার নিকট নেই। শৈশব সুলভ বুদ্ধি বলে তখন বুঝতে পারি নাই - সময়ে উহার প্রয়োজন হতে পারে। সেই কাব্যখানাতে একটি উপহার কবিতা লিখে আমার সমবয়স্ক একটি হিন্দু বন্ধুকে উপহার দিয়েছিলুম। এই কবিতাটুকু আমার স্মরণে আছে। তাহা এই-
>
> ধর ধর প্রিয়বর ক্ষুদ্র উপহার
> অর্পণ করিনু ইহা করেতে তোমার
> বড় সাধ ছিল মনে
> গেঁথে মালা সযতনে,
> পরাইব একদিন কণ্ঠেতে তোমার।
> এতদিনে আশা মম
> পুরিয়াছে প্রিয়তম
> নেও নেও ধর ধর পর এই হার।"[১৩৪]

---

১৩৪. কায়কোবাদ, *কলেজের সাহিত্য সভায় ছাত্রদের প্রতি মহাকবি কায়কোবাদের অভিভাষণ*, ইসলামিয়া কলেজ ম্যাগাজিন, এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রি., পৃ. ১০

এটি কবির অপরিণত বয়সের রচনা হওয়ায় এর ভাষা অতি সহজ-সরল ও সাদাসিধে। এর মূল সুর প্রেম ও বিরহ। এতে কবির আবরনহীন বক্তব্য ও দ্বিধাশূণ্য আবেগ প্রতিভাত হয়েছে। এ কাব্যের ভাষা এতোটা পরিণত না হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

২- কুসুম কানন

কবির দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'কুসুম কানন' এবং এটি প্রথম ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত। এটি আগলা থেকে প্রকাশিত হয় এবং তখন কবির বয়স ষোল বছর। কবি এটি রাধামাধব চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেন। এ কাব্যগ্রন্থের প্রথমে 'উপহার' শীর্ষক একটি অংশ রয়েছে। বাবু রাধামাধব চক্রবর্তী সকাশে এই উপহার। কবি রাধামাধবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন:

> "মাধব! অনেক দিন হইল এ দরিদ্র-হৃদয়-কানন তোমাকে দিয়াছি, এখন এ কাননের কর্তা তুমি, সুতরাং ইহার কুসুমগুলিও তোমার; অধিক কি বলিব। আপন জিনিসে আদর করিতে শিখিয়া থাক, করিও, নচেৎ করিও না।"[১৩৫]

এর পর রয়েছে 'সঙ্গীত' শীর্ষক একটি কবিতা। এছাড়া এ কাব্যগ্রন্থে মোট বত্রিশটি কবিতা রয়েছে। যথা:

১. জন্মভূমি দর্শনে, ২. বউ কথা কও, ৩. উদাসীনের উক্তি, ৪. ভারতের বর্তমান অবস্থা দর্শনে কোন এক বঙ্গ-মহিলার বিলাপ, ৫. তবু কি তোমায় পাব না আর!, ৬. বিরহিণীর বিলাপ, ৭. করমদোষ, ৮. কামিনী ফুল, ৯. নিশীথ ভ্রমণ, ১০. মেদিনী, ১১. ঈশ্বর বিরহীর বিলাপ, ১২. ধনীর প্রতি, ১৩. জাগ রে! ১৪. বকুলবৃক্ষ দেখিয়া একটি ষোড়শীর উক্তি, ১৫. চিতোরের যুদ্ধ সময়ে রাজপুত সেনাপতির উৎসাহ-বাক্য, ১৭. গোলাপ ফুল ১৮. সন্ধ্যা, ১৯. শশধর, ২০. শৈশব কাহিনী ২১. স্বাধীন-কবি ২২. নিশীথ সময়ে একটি পাখীর রব শুনিয়া কোন এক বঙ্গ বিধবার উক্তি, ২৩. গোরস্থান ভ্রমণ, ২৪. ঈশ্বর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, ২৫. সৌদামিনী, ২৬. বিরহিণী অবলা, ২৭. প্রণয়ের পরিণাম, ২৮. ঈশ্বর প্রেমিকের গীতাবলি, ২৯. প্রেয়সী! বিদায় রে জনমের মত, ৩০. পতি-উপেক্ষিতা বালা!, ৩১. পত্রিকা-বিসর্জন, ৩২. কেমনে ভুলিব!, ৩৩. কি দেখিনু হায়!

---

১৩৫. কায়কোবাদ, সম্পা. আব্দুল মান্নান সৈয়দ , *কায়কোবাদ রচনাবলী* , প্রাগুক্ত, খ. ৩ পৃ. ৫৭৪

কায়কোবাদ 'কুসুম কানন' কাব্যগ্রন্থে প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। এ প্রেম যেমন তাঁর প্রিয়ার প্রতি তেমনি স্রষ্টার প্রতি, দেশের প্রতি - এমন কি বিশ্বমানবতার প্রতি। অপরিণত বয়সেও কবি তাঁর মহান স্রষ্টাকে পাশ কেটে যাননি। স্রষ্টার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ অবিচল। কবি মহান সৃষ্টিকর্তা - যিনি সৃজন করেছেন চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত্রি ও সমগ্র বিশ্ব জাহান তারই প্রশংসা করেছেন, তারই মহিমা গাওয়ার জন্য পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছেন।

'কুসুম কানন' কাব্য কায়কোবাদের কাঁচা বয়সের লেখা। তথাপি তিনি একজন পরিণত কবির মতই প্রেম ও বিরহ ফুটিয়ে তুলেছেন। অতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস এ কাব্যে লক্ষ্যণীয়। বিষয়ের বৈচিত্রেও এটি ভরপুর। এখানে কবি প্রেমে কাতর, বিরহের যন্ত্রণায় ব্যথিত, স্বদেশ ভাবনায় চিন্তিত, জন্মভূমির স্বাধীনতায় সোচ্চার, মানব প্রেমে অগ্রগামী, নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং স্রষ্টার প্রতি অনুগত।

'কুসুম কানন' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো এতো আবেদন সৃষ্টি করতে না পারলেও এর মাধ্যমেই কায়কোবাদ অশ্রুমালাসহ অন্যান্য কাব্য রচনার শক্তি সঞ্চয় করেন। ড. আনিসুজ্জামানের মতে, "প্রেম কাহিনীতে নাট্যরস আরোপের চেষ্টা দেখা যায়। 'প্রণয় পরিণাম' কবিতায় এই ধারায় পরে কাহিনীকাব্যগুলো রচিত হয়।"[১৩৬]

'কুসুম কানন' কাব্য সম্পর্কে কায়কোবাদ গবেষক ড. ফাতেমা কাওসারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> 'কুসুম-কানন' কাব্যে আমরা কায়কোবাদের কবি-মানসের যে পরিচয় পাই, পরবর্তী জীবনে তা-ই সংযত, সুন্দর ও সংহত রূপ লাভ করেছে, পেয়েছে সুস্থির সুগভীর প্রসারতা। কবির মানসলোকের যে অঙ্কুর আমরা তাঁর প্রথম জীবনের কাব্যে লক্ষ্য করি তা-ই উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়ে উঠেছে প্রাপ্ত ও পরিণত বয়সের কাব্যগুলোতে।[১৩৭]"

'বিরহ বিলাপ' ও 'কুসুম-কানন' কাব্য দু'টি কবির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার পথ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কবি এ দু'টি কাব্য রচনার পর কবি স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। কায়কোবাদ গবেষক দেওয়ান আবদুল হামিদ বলেন, "এই বই দুইখানি পড়িয়া কাশিম বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী

---

১৩৬. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

১৩৭. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

দশ টাকা ও কাশীর ভুবন মোহিনী চতুর্ধারিনী পাঁচ টাকা কিশোর কবিকে উপহার বাবদ পাঠাইয়াছিলেন।"[১৩৮]

নিঃসন্দেহে সে সময় এ স্বীকৃতি কবির জন্য যেমন সম্মান ও মর্যাদার তেমনি তার সুপ্ত কাব্য প্রতিভা বিকশিত হওয়ার জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক।

'কুসুম কানন' কাব্যের কবিতাসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন:

১. খোদাভক্তি বা ধর্মানুভূতি। এগুলোকে আধ্যাত্মিক চেতনামূলক কবিতাও বলতে পারি।
২. নারীর প্রেম ও বিরহ।
৩. দেশপ্রেম।
৪. প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।
৫. নারীর মুক্তি ও স্বাধীনতা।
৬. জন্মভূমির স্বাধীনতা।
৭. জাতীয় জাগরণ।

৩- অশ্রুমালা

কায়কোবাদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অশ্রুমালা'। এটিও খণ্ড কবিতার অন্তর্ভূক্ত। 'কুসুম কানন' কাব্য প্রকাশের পর দীর্ঘ তেইশ বছর কবির আর কোন কাব্য প্রকাশিত হয়নি। তবে এ দীর্ঘ সময় কাব্য সাধনায় কোন বিরতি ছিল না। অতঃপর ১৩০২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয়। এ সময় কবি বৃহত্তর ময়মনসিংহের জামুরকী পোস্ট অফিসে চাকুরী করতেন। এ কবিতাটি প্রকাশের পর কায়কোবাদের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে কবি হিসেবে স্বীকৃত হন।[১৩৯]

কবির জীবিতাবস্থায় গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংস্করণই কবি নিজেই প্রকাশ করেন। ষষ্ঠ সংস্করণ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এটি পাকিস্তান বুক কর্পোরেশনের পক্ষে এম. এ. সোবহান কর্তৃক ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। অধুনা ঢাকার

---

১৩৮. দেওয়ান আবদুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮
১৩৯. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

নবরাগ প্রকাশনী থেকে এম. এ. মজিদের সম্পাদনায় 'মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা' শিরোনামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ২১ জুলাই ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে কায়কোবাদের ৫৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বইটি প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থটির শুরুতে রয়েছে 'উৎসর্গ' অংশ। কবি উৎসর্গ করেছেন 'প্রাণের'- কে। প্রাণের বলে কবি মূলতঃ তাঁর বাল্য প্রেমিকা গিরিবালা দেবীকেই বুঝিয়েছেন।[১৪০] এরপর 'প্রীতি উপহার' শিরোনামে একটি কবিতা রয়েছে। কাব্যের মূল অংশে রয়েছে ৮৭টি কবিতা। অতঃপর 'কাব্য-কবি ও সমালোচক' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। শেষ পর্যায়ে 'বঙ্গ ভাষার প্রতি' ও 'প্রার্থনা' শিরোনামে আরোও দু'টি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে।

গ্রন্থটির মূল অংশে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো:

১. প্রার্থনা, ২. শ্মশান সঙ্গীত, ৩. আমি কে, ৪. নববর্ষ, ৫. ত্রিধারা, ৬. বাজাও ভিখারিণী, ৭. ভুল ভেঙে দেও, ৮. প্রেমময়ীর কুঞ্জবন, ৯. সংসার, ১০. ঐশীচিন্তা, ১১. জীবন-প্রবাহ, ১২. মানব জন্ম, ১৩. অন্ধ ভিখারিণী, ১৪. সিরাজ-সমাধি, ১৫. সায়াহ্ন, ১৬. নীরব রোদন, ১৭. জন্মভূমি, ১৮. সাকী, ১৯. এক বর্ষ, ২০. পিসীমা আমার, ২১. অতিথি, ২২. ভ্রান্তি, ২৩. নিবেদন, ২৪. ঈদ-আবাহন, ২৫. শব্-কদর্, ২৬. তাজমহল, ২৭. দিল্লী, ২৮. অচেনা পথিক, ২৯. পাগলিনী, ৩০. অর্চনা, ৩১. আগলা গ্রাম, ৩২. উদ্‌ভ্রান্ত পথিক, ৩৩. ভিক্ষা, ৩৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৩৫. শোকসঙ্গীত, ৩৬. কবি ও সমালোচক, ৩৭. আবাহন, ৩৮. মোশ্লেম শ্মশান, ৩৯. কেন ডাকে পাখী, ৪০. মানবজীবন ভাই শুধু কিরে ফাঁকি, ৪১. কর্ম-ফল, ৪২. শৈশব-স্বপ্ন, ৪৩. প্রেমময়ীর পূজা, ৪৪. সে আজি কোথায়, ৪৫. প্রেম-সঙ্গীত, ৪৬. প্রেম-প্রতিমা, ৪৭. স্বামীর উদ্দেশ্যে বিধবা, ৪৮. বন-ফুল, ৪৯. প্রেমের স্মৃতি, ৫০. ফুল ও কলি, ৫১. বাসি ফুল, ৫২. বেল ফুল, ৫৩. মানভঞ্জনের একটি চুম্বন, ৫৪. কারে ভালবাসি, ৫৫. একটি বালিকার প্রতি, ৫৬. মানস-প্রতিমা, ৫৭. আমার প্রিয়া, ৫৮. বিধবার স্বামী পূজা, ৫৯. ঊষা-স্বপ্ন, ৬০. হৃদয়-রাণী, ৬১. হতাশের আক্ষেপ, ৬২. পাষাণময়ী, ৬৩. জীবনময়ী, ৬৪. কে তুমি, ৬৫. সোহাগিনী প্রিয়া, ৬৬. প্রিয়তমার প্রতি, ৬৭. প্রেমের স্বপ্ন, ৬৮. সোনার নলিনী, ৬৯. অপরিচিতা, ৭০. কবির সমাধি, ৭১. মৃত পত্নীর উদ্দেশ্যে, ৭২. উদাসীন প্রেমিক, ৭৩. ভুল,

১৪০. এম. এ. মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৭৪. প্রণয়ের প্রথম চুম্বন, ৭৫. বিদায়ের শেষ চুম্বন, ৭৬. ভুলিলে কেমনে ৭৭. কেমনে ভুলিব, ৭৮. সে কেন না ভালবাসে, ৭৯. ভালবাসি তারে, ৮০. সেই মুখখানি, ৮১. সে আমারে ভালবাসে, ৮২. অমৃত ঝরণা সে আমার, ৮৩. রমণী কুসুম, ৮৪. বউ কথা কও, ৮৫. বিরহিণী রাধা, ৮৬. ভালবাসা, ৮৭. প্রেমের সে স্মৃতি ৮৮. শৈশব স্মৃতি ৮৯. স্মৃতিলিপি, ৯০. বঙ্গভাষার প্রতি, ৯১. প্রার্থনা ।

'অশ্রুমালা' প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে কায়কোবাদের তদানীন্তন মুসলিম সাহিত্য সমাজে তিনি কবি হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হন। তিনি সমকালীন মুসলিম কবিদের কবি-ভাষার অর্গল ভেঙে শিক্ষিত জনের ভাষায় তথা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করেন।[১৪১] সমকালীন কোন কবিই কায়কোবাদের পূর্বে আধুনিক ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোন কাব্য রচনা করতে সক্ষম হননি।[১৪২] এ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন:

> "... আমাদের স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনিই একমাত্র মুসলমান কবি যিনি সর্বপ্রথম অসংস্কৃত ও গ্রাম্য থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন এবং আর সবার আগে শিক্ষিত জনের ভাষায় তিনিই প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন।"[১৪৩]

'অশ্রুমালা' পাঠ করে কবি নবীনচন্দ্র সেন কায়কোবাদকে একটি ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো:

> "প্রীতিভাজন,
>
> আপনার 'অশ্রুমালা' পরম প্রীতিসহকারে পাঠ করিয়াছি এবং স্থানে স্থানে আপনার অশ্রুর সঙ্গে অশ্রু মিশাইয়াছি। জাতিভেদে সকলেই ভিন্ন হতে পারে, অশ্রু অভিন্ন। যাহার অশ্রু আছে, তাহার কবিত্ব আছে। মানব রোদনমাত্রই কবিত্বময়; অতএব বলা বাহুল্য যে আপনার কাব্যখানির স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব আছে। মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে

১৪১. আবুল ফজল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
১৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
১৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলিম সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি শ্রীভগবানের কৃপায় ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধকার তিরোহিত করিয়া কখনও উপস্থিত হয়। আপনার "অশ্রুমালা" তাহার প্রভাত-শিশির-মালা-স্বরূপ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।

২. ৪. ৯৬ প্রীতিপ্রার্থী

আলিপুর নবীনচন্দ্র সেন"[১৪৪]

হরনাথ তেওয়ারী নামক জনৈক মারওয়ারী ব্যবসায়ী 'অশ্রুমালা' কাব্য প্রকাশ করতে আর্থিক সাহায্য করেন।[১৪৫] বঙ্গবাসী পত্রিকায় লেখা হয়, "আমরা এ পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না।"[১৪৬]

'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) 'অশ্রুমালা' পাঠ করে বলেন:

"আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যারপর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল এবং মর্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, ছন্দ মনোহর। এমন বিশুদ্ধ ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অন্তত মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন। সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনা নৈপুণ্য, কবিত্ব মাধুর্য ও ভাব সৌন্দর্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কী তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। বিজ্ঞ হিন্দু সমাজেও কায়কোবাদ প্রতিষ্ঠাভাজন। নবনূরের পাঠকবর্গের নিকটও তিনি

১৪৪ . এম.এ মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, পৃ. ১৫

১৪৫. দেওয়ান আবদুল হামিদ, *ছোটদের জীবনীগ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৪৬. *বঙ্গবাসী*, ২১ ভাদ্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

অপরিচিত নহেন। এরূপ স্থলে তাঁহার প্রশংসা করাই বাহুল্য। তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কবি। তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয়ে প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।"[১৪৭]

'অশ্রুমালা' কাব্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে কায়কোবাদ তদানীন্তন সাহিত্য সমাজে শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। সে সময়ে মুসলিম বাঙালি সমাজের উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলুল করিম, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ এমদাদ আলী। ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহের' প্রথম প্রকাশ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে। শেখ ফজলুল করিমের 'পরিত্রাণ' কাব্যগ্রন্থ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেনের মৌলুদ শরীফ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে। মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা' ও সৈয়দ এমদাদ আলীর 'ডালি' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯১২ ও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। আর কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে। এ হিসেবে 'কায়কোবাদ' আধুনিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের পতাকাবাহী রাহনুমা। যিনি দু'ভাষী পুঁথি সাহিত্য থেকে বাঙালি মুসলিম সাহিত্য সমাজকে শুদ্ধ বাংলায় সাহিত্য নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সফলতা প্রশংসার দাবী রাখে।

'বিরহ বিলাপ' ও 'কুসুম কানন' কবির অপরিপক্ক কিশোর বয়সের রচনা। এ দুটি কাব্য গ্রন্থ কায়কোবাদের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তুতি পর্বের কর্ম। তিনি 'অশ্রুমালা' প্রকাশের মাধ্যমেই প্রকৃত কবি হয়ে উঠেন। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজই তাঁর কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসার বলেন:

"প্রকৃত পক্ষে 'অশ্রুমালা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কায়কোবাদ কবি হিসেবে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং কবি প্রতিভার স্বীকৃতি। এ কাব্যে কবি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। একজন সার্থক গীতিকবির মতোই তিনি তাঁর হৃদয়ের একান্ত অনুভূতিকে, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে সহজ সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি অনুভূতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন পাঠক-হৃদয়ে। ব্যক্তি

১৪৭. সৈয়দ এমদাদ আলী, *নবনূর*, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ

> জীবন, সমাজ জীবন ও জাতীয় জীবনের বিচ্ছিন্ন ও টুকরো টুকরো অনুভূতিগুলো এক একটি অশ্রুবিন্দুর মতোই কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এ কাব্যে। অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গীতিময়তা কাব্যটির প্রধান গুণ। এ কারণে প্রকাশের পরপরই কাব্যটি সাহিত্য সমাজের সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।"[১৪৮]

সমকালীন মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ দু'ভাষী পুঁথি সাহিত্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। তাঁদের সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য সমাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো। এমতাবস্থায় কায়কোবাদ দু'ভাষী পুঁথিকারদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আধুনিক মার্জিত শব্দ প্রয়োগ ও আধুনিক সুনির্দিষ্ট ছন্দ প্রয়োগে কাব্য রচনায় ব্রতি হন। দু'ভাষী পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কে কায়কোবাদের নিজস্ব মূল্যায়ণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> "আমাদের মুসলমান সমাজে আর একদল বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ ভাষায় কাব্য রচনা না করিয়া পাঁচ মিশালী ডাইল খিচুড়ি তৈয়ার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সেরূপ দু'ভাষী ভাষার পুঁথি অশিক্ষিত লোকও লিখিতে পারে। এরূপ লিখায় কবির শক্তির পরিচয় কি? সাহিত্য সমাজে এরূপ দোভাষী কবির আসন অতি নিম্নে।"[১৪৯]

'অশ্রুমালা' প্রকাশের পর তদানীন্তন সাহিত্য সমাজ প্রথমে বিস্মিত পরবর্তীতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে। 'অশ্রুমালা' কাব্য পড়ে কবি নবীন চন্দ্র সেন ২রা এপ্রিল ১৮৯৬ সালে আলীপুর থেকে কায়কোবাদকে একটি পত্র লিখেন। এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন:

> "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে।"[১৫০]

---

১৪৮. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, পৃ. ১১৩

১৪৯. কায়কোবাদ, *কাব্য-কবি ও সমালোচক, অশ্রুমালা* (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), ৬ষ্ঠ সংস্করণ , পৃ. ২২৪

১৫০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলীর ভূমিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. নয়

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ বঙ্গাব্দের সারস্বত পত্রে বলা হয়:

> "কবি কায়কোবাদ মুসলমান। কিন্তু তাঁহার বাংলা মুসলমানী নহে। কায়কোবাদের বাংলা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর। 'অশ্রুমালা'র লেখক কায়কোবাদ কবি, তাঁহার ভাষা মধুর, প্রাঞ্জল ও কবিতার উপযোগী হৃদয়গ্রাহিনী। তাঁহার অশ্রুমালা বঙ্গভাষা ও বঙ্গকাব্যের আদরের বস্তু। সুতরাং কায়কোবাদও বঙ্গীয় কবি সমাজে আসন পাইবার সর্ব্য যোগ্য সন্দেহ নাই। আমরা 'অশ্রুমালা'র প্রত্যেক কবিতায়ই প্রকৃত কবিত্ব এবং যুবক কবির প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখিয়া প্রীত হইয়াছি।"[১৫১]

২৮ চৈত্র ১৩০২ বঙ্গাব্দে 'ঢাকা গেজেট' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

> "আমরা পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া এতদূর তৃপ্তি লাভ করিয়াছি যে, শত মুখে গ্রন্থকারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। কবি কায়কোবাদের অশ্রু হল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকোচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। ... কবি কায়কোবাদ কাঁদিতে জানেন, স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বিচ্ছেদ গীত গাইতে জানেন, তাই তাঁহার কান্নায় বিরহীর বিরহ বেদনা ঘুঁচে, প্রাণের জ্বালা উপশমিত হয়। কবি মুসলমান হইয়াও 'বিরহিনী রাধার' দুঃখে ম্রিয়মান, মুসলমান হইয়াও নির্বাণের মন্ত্রে বিমোহিত, মুসলমান হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমব্যথী। কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন, কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন। তাঁহার কবিতা কষ্ট কল্পনার জিনিস নহে, তোতা পাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিস - সহজ স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী।"[১৫২]

---

১৫১. *স্বারশ্বতপত্র*, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ

১৫২. *ঢাকা গেজেট*, ২৮ চৈত্র, ১৩০২ বঙ্গাব্দ

২১ ভাদ্র শনিবার ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গবাণী পত্রিকার সম্পাদক 'অশ্রুমালা' কাব্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

> "মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না। সুকবি মুসলমান বঙ্গদেশে বিরল। কায়কোবাদ সাহেব সুকবি, সুরসিক ও ভাবুক। বোধহয় তিনি এখনও যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তাই অনুমান করি প্রেম বিষয়ে তাঁহার এত ঝোঁক এবং সেই অনুপাতে তাঁহার ভাষাও খুব জোরের। কালে তিনি যশস্বী হইবেন, আমাদের এমন ভরসা আছে।"[১৫৩]

'অশ্রমালা' প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমান সাহিত্যামোদীদের মধ্য থেকে 'নবনূর' সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী এ গ্রন্থটির মূল্যায়ণে এগিয়ে আসেন। নবনূরের শ্রাবণ ১৩১১ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় তাঁর মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন:

> "আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল এবং মর্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, ছন্দ মনোহর। এমন বিশুদ্ধ ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা আমাদের অত্যল্প মুসলমান কবিই লিখিতে পারেন। সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনা নৈপূণ্য, কবিত্ব মাধুর্য ও ভাব সৌন্দর্য্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। বিজ্ঞ হিন্দু সমাজেও কায়কোবাদ প্রতিষ্ঠাভাজন। নবনূরের পাঠকবর্গের নিকটেও তিনি অপরিচিত নহেন। এরূপ স্থলে তাঁহার প্রশংসা করাই বাহুল্য। তিনি একজন প্রকৃত ভাবুক কবি। তাঁহার হৃদয় আছে সে হৃদয়ে প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।"[১৫৪]

---

১৫৩. *বঙ্গবাণী*, শনিবার, ২১ ভাদ্র, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ

১৫৪. *নবনুর*, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ

সৈয়দ এমদাদ আলী ভাদ্র ১৩০৩ বঙ্গাব্দের মিহির ও সুধাকর পত্রিকার ৭ম খণ্ডে 'অশ্রুমালা'র সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন:

> "অশ্রুমালা'র কবির মত প্রতিভাশালী কবিকে পাইয়া আমরা আশান্বিত ও গৌরবান্বিত হইয়াছি। "অশ্রুমালা" পাঠ করিয়া আমরা এই বুঝিয়াছি তিনি মুসলমান সমাজের বর্তমান সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ... মুসলমান সমাজে এমন কবির যদি আদর না হয়, তবে বুঝিব আমাদের এখনও কিছু উন্নতি হয় নাই। ... কবিতা পাঠ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এমন কবিতা যিনি লিখিতে পারেন তিনিও ধন্য, আমরাও ধন্য। ... "অশ্রুমালা"র সমালোচনা করিতে বসিয়া আমরা মহা গণ্ডগোলে পড়িয়াছি, কোন্ স্থান ছাড়িয়া কোন্ স্থান উদ্ধৃত করি? সকলি যে মনোরম, সকলি যে হৃদয়উন্মাদক। ... এমন সুন্দর, এমন সরল কবিতা মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে আছে কি?"[১৫৫]

কায়কোবাদ মহাকাব্যের অনুরক্ত। তিনি মহাকাব্যকেই কাব্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন:

"কাব্য বহু প্রকার- কাব্য, খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, চম্পুকাব্য ও মহাকাব্য; তন্মধ্যে মহাকাব্যই প্রধান।"[১৫৬] কবি আরো বলেন:

"প্রেম-প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ক ক্ষুদ ক্ষুদ্র কবিতা সংবলিত কাব্যই- খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য। সামান্য একটি ভাব ব্যতীত উহার কোনই লক্ষ্য নাই। উহা সুগন্ধি ফুলের মত কবি-হৃদয়ের নানা সময়ের নানা ভাবের অভিব্যক্তি। উহা বসন্তকালের মরশুমী ফুলের মত সময় বিশেষে প্রস্ফুটিত হইয়া-সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া কিছুকাল পরে ধ্বংস সাগরের অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তবে কোন কোন কবিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বটে, উহার সংখ্যা অত্যল্প।"[১৫৭]

---

১৫৫. এম. এ মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, পৃ. ১৮

১৫৬ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯

১৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯

গীতি কবিতার প্রতি কবির এমন ভাব প্রকাশিত হলেও তিনি প্রথমত গীতি কবি, পরবর্তীতে কাহিনী কাব্য রচয়িতা। 'অশ্রুমালা' কাব্যই তাঁর কবি খ্যাতি এনে দিয়েছে। এ কাব্যের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সাহিত্য সমাজে তিনি শক্তিশালী কবি হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মহাকাব্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি তবে গীতি কবিতার প্রতি আকর্ষণ তিনি কোন ভাবেই এড়াতে পারেননি।

'অশ্রুমালা' কাব্য কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ খণ্ড কবিতার সংকলন। কায়কোবাদের অন্যান্য কাব্যের মতো এটির মূল সুরও প্রেম। প্রেমের পাশাপাশি প্রকৃতির বর্ণনাও এটিতে সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। কবির বিদগ্ধ হৃদয়ের অন্তরঙ্গ অনুভূতির সহজ-সরল গীতিময় প্রকাশে কাব্যটি গীতি কাব্য হিসেবে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। কায়কোবাদ এ কাব্যে সহজ-সরল অভিব্যক্তিই তুলে ধরেছেন। সংসার জীবনের গভীরে প্রবেশ না করে হৃদয়ের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-বেদনা সরাসরি বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কাব্যে প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয় কবির ব্যকুল হৃদয়ের মাধুরীমায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। নারীর প্রেম-সৌন্দর্য, বিরহ, প্রিয়া হারানোর বেদনায় বিক্ষত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, অসহনীয় যন্ত্রণা, গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা, আর্ত-মানবতার দুঃখ-দুর্দশা এবং এর প্রতি মমত্ববোধ- মানবতার প্রতি ভালোবাসা, মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ, মুসলিম জাতিসত্ত্বার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, পতনন্মুখ জাতির দুঃখ-দুর্দশা এবং উত্তোরণের পথ নির্দেশ ইত্যাকার বহু বিষয় এ কাব্যে ফুটে উঠেছে।

'অশ্রুমালা' কাব্যের কবিতাসমূহকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যেমন:

১. খোদাভক্তি বা ধর্মানুভূতি। এগুলোকে আধ্যাত্মিক চেতনামূলক কবিতাও বলতে পারি।
২. নারীর প্রেম ও বিরহ।
৩. প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।
৪. জাতীয় জাগরণ ও চেতনা।
৫. দেশপ্রেম।
৬. শ্রেণিহীন কবিতা।

কায়কোবাদ প্রেম ও প্রকৃতির কবি।[১৫৮] 'অশ্রুমালা' কাব্যের বেশির ভাগ কবিতাই প্রেমের কবিতা। এসব কবিতায় শৈশবের প্রেম, স্মৃতিচারণ, বিরহের যন্ত্রণা, প্রিয়া হারানোর বেদনা, একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা, অভিমান ও কপট অবিশ্বাস-সন্দেহ প্রভৃতি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। প্রেমের পাশাপাশি এসেছে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা। গ্রাম বাংলার নয়নাভিরাম নৈসর্গিক চির সুন্দর সবুজ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে কবি অবাক, বিস্মিত, বিমোহিত ও বিমুগ্ধ। অসাধারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য আর হারানো প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য যেন একাকার। সবুজাভ প্রকৃতির সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে কবির প্রাণ-প্রেয়সীর যেন অবস্থান। কবি জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত। জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য তাঁকে গৌরবান্বিত করেছে। আর বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থা তাকে ব্যথিত করেছে। তিনি খুঁজেছেন জাতির পতন ঠেকানোর পথ এবং অতীত গৌরবের রাজমুকুট ফিরে পাওয়ার কৌশল। জন্মভূমি স্বদেশের ভাবনা কবি হৃদয়ের লালিমা দিয়ে প্রতিভাত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আগলা পূর্বপাড়া থেকে গোটা ভারতবর্ষ তার স্বদেশ। স্বদেশের ভাবনায় কবি বারবার আবেগাপ্লুত হয়েছেন।

৪- অমিয়-ধারা

মার্চ, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মোতাবেক ফাল্গুন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় কবির গীতি কবিতার সংকলন 'অমিয়-ধারা'। প্রকাশক আবুল খায়ের ছয়েফ্উদ্দীন। এটি ঢাকার খিলগাঁও থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে একাশিটি কবিতা সংকলিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক আবুল খায়ের ছয়েফ্উদ্দীন আহমদ বলেন," বলিতে কি, ইহার কবিতাগুলি যেন অমৃতের উৎস। ঊষার সেতারের ললিত রাগিণী বন্ধ হইয়া গেলেও তাহার শেষ ঝঙ্কারটুকু যেমন শ্রোতার কানের মাঝে আবদ্ধ থাকিয়া প্রাণে আনন্দেও স্রোত রহিয়া যায়, তদ্রূপ পাঠান্তে ইহার মধুরতাটুকুও পাঠককে ক্ষণকালর জন্য পার্থিব চিন্তা হইতে বিরত রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"[১৫৯] এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪০ সালে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণের প্রকাশক এম. এ. সোবহান। এটি ঢাকার পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এ কাব্য সংকলনটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। কাব্যের প্রারম্ভে উৎসর্গ ও উপহার শিরোনামে দু'টি কবিতা রয়েছে। সেই সাথে প্রথম খণ্ডে একশত পাঁচটি, দ্বিতীয় খণ্ডে

---

১৫৮. *আবুল ফজল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৫৯. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৬৭

এগারটি এবং তৃতীয় খণ্ডে চারটি কবিতা রয়েছে। গ্রন্থটিতে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো: ১. জগদীশ্বর, ২. আজান, ৩. প্রার্থনা, ৪. কওসর, ৫. প্রাণের বীণা, ৬. প্রেম-লীলা, ৭. প্রেমের উৎসব, ৮. প্রেম-বিচ্ছেদ-মিলন, ৯. মরণ বাঁচন, ১০. দিনের শেষে, ১১. বৈতরণী নদীর তীরে, ১২. পরপারের যাত্রী, ১৩. স্মৃতি, ১৪. তুই ও আমি, ১৫. তুমি এখন রইলে কই, ১৬. গান, ১৭. ফুলের হাসি, ১৮. কার গৃহিণী, ১৯. প্রেমের পাগল, ২০. প্রেমের বন্ধন, ২১. প্রিয়তমের আগমন-বার্তা শ্রবণে, ২৩. মৃত্যু, ২৪. প্রেমের আহ্বান, ২৫. ফুল তোলা মোর হল না ২৬. আমি গরিব বাপের ছেলে, ২৭. গন্তব্য স্থান ২৮. সজ্জন ও কুজন, ২৯. অজানিত দেশে, ৩০. অপরিচিত প্রেমিক, ৩১ চোখের ঠুলী. ৩২. জীবন সায়াহ্নে, ৩৩. সুখ, ৩৪. মরণ-সঙ্গীত, ৩৫. ভুল, ৩৬. আয়ু ও মৃত্যু, ৩৭. বাসর ঘর, ৩৮. তার দুয়ারে, ৩৯. সব তোমারি, ৪০. আহ্বান, ৪১. আমি ত চিনিনে তারে, ৪২. অভিসার, ৪৩. শিশির-বিন্দু, ৪৪. খেওয়া পারের পাট্‌নী, ৪৫. গোধূলি, ৪৬. পথহারা, ৪৭. আমি যেন খুঁজি হায় কারে, ৪৮. তুমি কোথায় আছ জানিনে, ৪৯. একে-লা, ৫০. প্রেমাকাঙ্ক্ষী, ৫১. কে, ৫২. ভবের মেলা, ৫৩. মেদিনী, ৫৪. শশধর, ৫৫. বসন্ত, ৫৬. প্রেমিকের আক্ষেপ, ৫৭. আশায় নিরাশা, ৫৮. হাসরের মাঠে সওদা, ৫৯. গোরস্থান, ৬০. সঙ্গীহারা পথিক, ৬১. দুনিয়া, ৬২. প্রবৃত্তি, ৬৩. নেওয়া দেওয়া, ৬৪. বিবেক, ৬৫. কবে তোমায় পাব, ৬৬. জীবন-সঙ্গীত, ৬৭. অর্ঘ্য, ৬৮. কোথা পাব তারে, ৬৯. মানব-জন্ম, ৭০. কেউ ত কাহার নয়, ৭১. ভাঙ্গা গড়া, ৭২. মানব জীবন তব এই আছে এই নাই, ৭৩. অভিযান, ৭৪. সংসার-ঘানি, ৭৫. মায়ের ডালা, ৭৬. আমার পল্লীখানি, ৭৭. বীণার সুর, ৭৮. চোখ গেল ৭৯. দেশের বাণী, ৮০. বঙ্গভাষার কাব্য-কুঞ্জ, ৮১. কে দিল এ ধোঁকা, ৮২. প্রেমের তপস্যা, ৮৩. কোন্ পথে হায় যাব, ৮৪. দিন ত গেল বয়ে, ৮৫. বঙ্গভূমি ও বঙ্গভাষা, ৮৬. সেকেন্দ্রা, ৮৭. ভারতের জাতি-ভেদ প্রথা (হিন্দু-মুসলমান), ৮৮. বাংলা আমার, ৮৯. উত্থান সঙ্গীত, ৯০. ঈদ-আবাহন, ৯১. আল্-এসলাম, ৯২. রেখা, ৯৩. আমাদের গ্রাম, ৯৪. রমণী, ৯৫. ধনীর প্রতি, ৯৬. প্রত্যাগত প্রবাসী, ৯৭. দান-পত্র, ৯৮. হিন্দু-মুসলমান, ৯৯. পথিক, ১০০. বঙ্গভূমির প্রতি ১০১. প্রেমের সরাব, ১০২. সাধনা ও সিদ্ধি, ১০৩. ধনী ও দরিদ্র, ১০৪. উড়োপাখী, ১০৫. মোশ্লেমের জাতীয় গৌরব, ১০৬. তুমি কি ঘুমায়ে শুধু রবে, ১০৭. ইসলাম, ১০৮. মহরমের চন্দ্র, ১০৯. কবির প্রথম আহ্বান, ১১০. অতীতের স্বপ্ন ১১১. ইশ্লামের ডঙ্কা, ১১২. কবির দ্বিতীয় আহ্বান, ১১৩. আগে যাও ভাই,

১১৪. কবির চাবুক, ১১৫. কলির অদ্ভুত জীব, ১১৬. স্বর্গ, ১১৭. ঢাকার নবাব হাবীবুল্লা বাহাদুরের প্রতি বিনীত প্রার্থনা, ১১৮. প্রাইম মিনিস্টার মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, খাজা স্যার নাজেমদ্দীন ও খাজা স্যার সাহাবদ্দীন প্রভৃতি সমস্ত মিনিস্টার ও মুসলমান নেতাদের প্রতি বিনীত প্রার্থনা, ১১৯. কায়কোবাদের স্মৃতি-লিপি।

মানব প্রেম, স্বদেশ প্রেম, আধ্যাত্ম প্রেম, প্রকৃতি প্রেম, জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হরিষ-বিষাদ, বিরহ-হতাশা, মান-অভিমান, প্রিয়ার সৌন্দর্য, ফুল-পাখি প্রভৃতি বিষয় এ কাব্যে ফুটে উঠেছে। কায়কোবাদের মন ছিল অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য ও বৈচিত্রে ভরপুর। বহু বিষয় তাঁর কবি হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। ফলে তাঁর গীতি কবিতায় বিষয়-বৈচিত্র লক্ষণীয়। অমিয়-ধারা কাব্যে প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে:

১. আধ্যাত্ম প্রেম।
২. নারীর প্রেম ও বিরহ।
৩. প্রিয়া ও প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।
৪. জীবন ও জগতের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা।
৫. মানব প্রেম।
৬. দেশ প্রেম ও স্বদেশ ভাবনা।
৭. জাতীয় জাগরণ ও চেতনা।

৫- প্রেমের ফুল

কায়কোবাদের মৃত্যুর পর আরো পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে শাশ্বত প্রেমের কাব্য 'প্রেমের ফুল' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক এম. এ সোবহান। পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। কবি এটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন। কবি একে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে আটটি কবিতা। এগুলো আধ্যাত্মিক প্রেম বিষয়ক। দ্বিতীয় ভাগে পার্থিব প্রেম বিষয়ক চুয়ান্নটি কবিতা রয়েছে। তাছাড়া কাব্যের প্রারম্ভে 'সঙ্গীত', 'কায়কোবাদের জীবন সঙ্গীত', উৎসর্গ ও 'কায়কোবাদ প্রশস্তি' শিরোনামে চারটি কবিতা রয়েছে। প্রেমের ফুল কাব্যের মুখ্য বিষয় 'প্রেম'।

'প্রেমের ফুল' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকায় কবি বলেছেন:

> "আমার এই হৃদয় কুঞ্জের প্রেমের ফুলের যখন হার গেঁথেছি, তখন সে সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলাও প্রয়োজন। ... প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য এই হার গেঁথেছি, যাদের জন্য এই হার গেঁথেছি, তারা সুখী হলেই আমার সমুদয় শ্রম, সমুদয় কষ্ট সার্থক মনে করব।
>
> বিচ্ছেদের দারুণ উত্তাপে এই কোমল হৃদয়খানি নীরব মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমি সেই শুষ্ক নীরস মরুভূমিতেই এই কুঞ্জ তৈরি করে বস্রার সুগন্ধি গোলাপ ফুটাতে চেষ্টা করেছি। ... এখানে কেবলি অফুরন্ত ও প্রাণভরা ভালবাসা, অনাবিল প্রেম অর্থাৎ আপনাকে পরের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ও পরের দুঃখ দৈন্য নিজের মাথায় তুলে নিয়ে উদাসীন সে'জে থাকা। এখানে দিবা-রাত্রি দোয়েল-শ্যামার মন মাতানো ভৈরবীর তান; পাপিয়ার "পিউ-পিউ" কোয়েলের "কুহু-কুহু" মধুর ঝঙ্কার আর মঞ্জুরিত মাধবী-কুঞ্জ পুস্পিত বকুল বিতানে শ্যামল পল্লব সুশোভিত তমালের নিভৃত নিকুঞ্জে বিরহিনী যুবতী ও নবপ্রেমিকা ষোড়শী বালিকাদের বিজলি ভরা আকুল চাহনি প্রেমপূর্ণ সরল প্রাণের ব্যাকুল উচ্ছ্বাস ও বুক ভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। অনেকে মনে করেন, প্রেম জিনিসটা বড্ড খারাপ। একটা খেলো জিনিস, কিন্তু তাহা ভুল। "প্রেম" বিধাতার অমূল্য দান। "প্রেম" স্বর্গের পবিত্র জিনিস- "প্রেম" পরকে আপন করিয়া তোলে- স্বার্থপরতার দুর্গন্ধ পুরীষ দুরীভূত করিয়া মানবকে দেবতায় পরিণত কওে, হিংসাদ্বেষ ভুলাইয়া দেয়। ... আমি কবি। আমি প্রেমের সন্ন্যাসী, ...। আমি যাহাকে ভালবাসি, আজীবন তাহাকে ভুলিব না। মৃত্যুর সময়েও তাহারই স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া এই পৃথিবী হইতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিব। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাহারই মুখখানি হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।"[১৬০]

---

১৬০. এম. এ. মজিদ, *কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯-৩০১

গ্রন্থটিতে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো: ১. প্রেমের সুরা, ২. প্রেমের মাজার, ৩. প্রেমের পাগল, ৪. প্রেমের সাকী, ৫. সে ত আর এল না, ৬. প্রাণের বীণা, ৭. প্রেমের ফুল, ৮. শৈশবস্মৃতি, ৯. ফুলের রাণী, ১০. প্রেমের অর্ঘ্য, ১১. সে আজি কোথায় গেছে চলে, ১২. বিরহীর প্রাণের হাহাকার, ১৩. মরণে হব না কেন সাথী, ১৪. কেন ভালবাসি, ১৫. যৌবন, ১৬. প্রেমিকের অশ্রু, ১৭. বউ কথা কও, ১৮. কোথা তুমি- কোথা আমি, ১৯. অধর-সুধা, ২০. প্রেমের ফুল, ২১. চুমো খাব ঘুমের ঘোরে, ২২. সাজাই তোরে কুসুম তুলে, ২৩. ভুলে যা' সেই ভালবাসা, ২৪. আর কি পাব না আমি তারে, ২৫. একখানা চিঠি তার, ২৬. এই কিরে তোর ভালবাসা, ২৭. দেখার স্বাদ, ২৮. শৈশবসঙ্গিনী, ২৯. নিরাশ প্রেমিক, ৩০. কেমনে তাহারে ভুলি, ৩১. ফুলের মালা, ৩২. তুমি কি বাস না ভাল, ৩৩. প্রেম-পত্র, ৩৪. কোথায় রহিলে তুমি আজি, ৩৫. কণ্ঠ-মালা, ৩৬. ভালবাসি তোরে, ৩৭. এক দিনের ভুল, ৩৮. বিবাহ, ৩৯. দেখা ত হল না তার সাথে, ৪০. প্রেমের রাণী, ৪১. পাপিয়া, ৪২. মানিনী সন্ধ্যা-তারা, ৪৩. আমারি তা' ভুল, ৪৪. আধ ফুটো ফুল, ৪৫. প্রেয়সি আমার, ৪৬. নীলিমা আমার, ৪৭. তমি কি বাস না ভাল? ৪৮. বাল বিধবা, ৪৯. ভোরের পাখী, ৫০. প্রেম-সুধা, ৫১. পিউ-পিউ-পিউ, ৫২. সে আসিবে কবে, ৫৩. প্রাণের উচ্ছ্বাস, ৫৪. আমার প্রিয়া, ৫৫. কেমনে ভুলেছ প্রিয়া।

এ কাব্যেও মূল সূর প্রেম। কবি নিজে প্রেমিক ছিলেন। প্রেমকে উপজীব্য করেই কবিতা লিখতেন। কবির প্রেমকে পবিত্র সম্পদ মনে করতেন। তিনি নিজেকে প্রেমিক-প্রবর হিসেবে পরিচয় দিতে দ্বিধা করতেন না।

কবি বলেন:

> "আগেই বলিয়াছি কবি বা প্রেমিক পাগল ও উদাসীন। তাহারা জগতের কিছুর মধ্যেই আসে না। এবং ধরা দেয় না। তাহাদের শৈশব-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্ধক্য কিছুই নাই। তাহারা সব সময়েই একভাবে চলে। তাহারা হাসি-খুশী ব্যতীত কিছুই জানে না–কিচুই চাহে না। শিশু-বালক-বালিকা-যুবক-যুবতী-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, সকলের সঙ্গেই তাহাদেও একই ভাব–সেই প্রেম। আমি যাহাকে ভালবাসি,

যাহার সহিত আমার অন্তরের মিল–সে স্বর্গেও দেবী–সে আমার চিরারাধ্য মানসপ্রতিমা। সে আমার উদ্ভ্রান্ত ঋদয়ের রাণী–প্রেমের রাণী–ফুলের রাণী–সে আমার ফুটন্ত গোলাব ফুল। কেননা আমি প্রেমিক–আমি পাগল–আমি উদাসীন।"[১৬১]

'প্রেমের ফুল' কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে:

১. আধ্যাত্ম প্রেম।

২. নারীর প্রেম ও বিরহ।

৩. প্রিয়া ও প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্য।

৪. মানব প্রেম।

৫. দেশ প্রেম ও স্বদেশ ভাবনা।

১৬১. আব্দূল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭৭-৫৭৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদের কাহিনীকাব্য

আখ্যায়িকা বা কাহিনী নিয়ে রচিত কোন কাব্য অথবা যে কাব্যের মাধ্যমে কোন কাহিনী বা আখ্যায়িকা বিদৃত হয় তাকে কাহিনী কাব্য বা আখ্যায়িকা কাব্য বলে।[১৬২] অর্থাৎ কোন কাহিনীকে আশ্রয় করে যখন কোন কাব্য রচিত হয় তখন তাকে কাহিনী কাব্য বলে। এ জাতীয় কাব্যে কাহিনী বা ঘটনাই মূখ্য ভুমিকা পালন করে। 'প্রচলিত ও কাল্পনিক কোন কাহিনী কাব্যরূপ লাভ করিলে কাহিনী বা আখ্যায়িকা কাব্য হয়ে উঠে। পৌরানিক কাহিনী বা দেব-দেবীর মাহাত্মামূলক, জীবনিভিত্তিক, ইতিহাসমিশ্রিত বা দেশপ্রেম মূলক, প্রণয়মূলক বা আদিরসাত্মক ইত্যাদি নানা বিষয় ভিত্তিক কাহিনী নিয়ে এ ধরনের কাব্য রচিত হতে পারে।'[১৬৩]

এ জাতীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে মহাকাব্যের মতো রূপ ও রীতির কঠিন নিয়ম থাকে না। এখানে কোন একটি কাহিনী উপস্থাপন করতে হয়। এ জাতীয় কাব্য সহজ সরল রীতিতে রচিত হয়। ফলে ছন্দ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা বাধ্যতামুলক নয়। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এ জাতীয় কাব্যে একমুখী নীতি অবলম্বন করে থাকে। কাহিনী কাব্যে বহু চরিত্রের পরিকল্পনা করা হয়। মানব জীবনের বাস্তবসম্মত কাহিনীটাকে কেন্দ্র করেই এ জাতীয় কাব্য রচিত হয়। তাই এ জাতীয় কাব্যের চরিত্ররা সমাজের কোন না কোন স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

কায়কোবাদের রচিত কাব্যসমূহ দু'টি ধারায় বিভক্ত। একটি খণ্ড কবিতার ধারা অপরটি কাহিনীকাব্যের ধারা। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা কবির খণ্ড কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদে কবির কাহিনীকাব্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো। কায়কোবাদের খণ্ড কবিতার সংকলন পাঁচটি। আর কাহিনীকাব্যের সংখ্যা ছয়টি। এগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ:

১. মহাশ্মশান (১৯০৫),

২. শিব-মন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য (১৯২১),

৩. মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য (১৯৩৩),

---

১৬২ . বদিউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪৭

১৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

৪. শ্মশান-ভস্ম (১৯৩৮)

৫. প্রেমের রাণী (১৯৭০)

৬. প্রেম পারিজাত (১৯৭০)।

১- মহাশ্মশান

'অশ্রুমালা' কাব্যের দশ বছর পর **১৩১১** বঙ্গাব্দে কায়কোবাদের অমর কীর্তি 'মহাশ্মশান' প্রকাশিত হয়। এর প্রথম কয়েক সর্গ কোহিনূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাংসার রওশন আলী চৌধুরী এর সম্পাদক ছিলেন।[১৬৪] কবির আর্থিক অবস্থা এরকম ছিল না যে, তিনি তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন। এজন্য সম্পূর্ণ কাব্যখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। অতঃপর নওয়াব আলী চৌধুরী, মজহারুল্লাহ তালুকদার, অন্নদা গাঙ্গুলী, ডা. রাজেন্দ্রনাথ বসু, বাবু কেদারনাথ সরকার, বাবু ললিত কুমার বসু, বাবু রজনীকান্ত কবিরাজ, কবির জামাতাদ্বয় যথাক্রমে মোহাম্মদ ইরফান, খান সাহেব আবদুল গফুর, কবির ভ্রাতা খান সাহেব আবদুল বারী প্রমুখের আর্থিক সহায়তায় 'মহাশ্মশান' প্রকাশিত হয়।[১৬৫] এসময় কবি ময়মনসিংহের পিঙ্গনা পোস্ট অফিসে কর্মরত ছিলেন।[১৬৬] পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত 'মহাশ্মশান' কাব্য প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সাহিত্যিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মুসলিম সাহিত্য বোদ্ধাদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হয়। প্রশংসা এবং নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। ফজলুর রহমান খাঁ, মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) ও 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) মহাশ্মশান এর নেতিবাচক সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। ফজলুর রহমান খাঁ মন্তব্য করেন:

> "গ্রন্থকার (কায়কোবাদ) বঙ্গীয় মুসলমান, সুতরাং তাহার মহাশ্মশানে ভারতীয় মোসলমানাদর্শ বহুল পরিমাণে থাকা আবশ্যক ছিল। ... বড়ই পরিতাপের বিষয়, মুসলমান কবি এ বিষয়ে মুসলমান সমাজকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য পাঠে আমাদের মনে কোন একটা উচ্চাকাঙ্খার উদ্রেক হয় না। বরং অনেক সময়েই মনে হয় যে, মুসলমান কবি আসুরিক শক্তি ব্যতীত

১৬৪. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৬৫. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, *কায়কোবাদ*, মাসিক মোহাম্মদী, ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৬

১৬৬. দেওয়ান আবদুল হামিদ, *মাসিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯

ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই, তাহার মহাকাব্য এ দুর্দ্দিনে প্রকাশ না হওয়াই ছিল ভাল।"[১৬৭]

তিনি আরো লিখেছেন:

"... কবি কায়কোবাদের প্রতিভা আছে। 'মহাশ্মশান' তাহারই স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র। ... গ্রন্থকার ভারতীয় মুসলমানদিগকে যে রঙ্গে রঞ্জিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ... লজ্জায় বদন আপনি নত হইয়া পড়ে।"[১৬৮]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) বলেন:

"দুঃখের বিষয় একখানা মহাকাব্য লিখিতে বসিয়াও তিনি (কায়কোবাদ) আদি রসের নেশার ঝোঁক ছাড়িতে পারেন নাই। যে কোন পাঠক 'মহাশ্মশানের' পাতাগুলি উল্টাইয়া দেখুন আদিরসের আতিশয্যে সমস্ত কাব্যখানাই এত রসিয়া রহিয়াছে যে, অন্যসব লেখার দাগ মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে বলিলেই হয়। কাব্য মানে দর্শন বা নীতিশাস্ত্র নয়, এ কথা ঠিক কিন্তু সর্বপ্রকার নৈতিকতার মাথায় লাঠি মারার নামও কাব্য নয়। ... কাব্যে যতটুকু মার্জনীয়, আমার মনে হয় মহাশ্মশান কাব্যে তার চেয়ে বেশি অশ্লীলতা রহিয়াছে। ... এ কথা অবশ্যই বলিব যে, মুছলমানের নিজস্ব আদর্শ, ভাব ও চিন্তার দিক দিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন না হইলে উহাকে আমাদের গৌরবের বস্তু বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইতে পারি না। ... হিন্দুত্বের ছাপ মারার নামই কাব্যের উৎকর্ষ-সাধন নয়। কবির সহানুভূতি মহারাষ্ট্রীর দিকে, স্বজাতির দিকে নয়; এ কথা সম্পূর্ণরূপে সঙ্গত না হইলেও একেবারে মিথ্যা নয়। ... যাহা হোক, মহাশ্মশানের কবির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নাই। তিনি এমনভাবে কাব্যখানিকে সংশোধন করিয়া প্রকাশ করুন যাহাতে মুছলমান উহাকে অতি সাধনার জিনিস বলিয়া আদর করিতে পারে - তাহার নিকট এই আবেদন।"[১৬৯]

---

১৬৭. ফজলুর রহমান খাঁ, *মহাশ্মশান কাব্য*, *নবনূর*, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ

১৬৮. ফজলুর রহমান খাঁ, *মহাশ্মশান কাব্য*, সাহিত্যিক, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

১৬৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, *মহাশ্মশান সম্বন্ধে দুই একটি কথা*, *সওগাত*, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯) ও ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) কবি কায়কোবাদকে জরির টুপি ও সোনার দোয়াত দিতে গেলে তাঁদের প্রতি সৈয়দ এমদাদ আলী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সৈয়দ এমদাদ আলী মহাশ্মশান সম্পর্কে লিখেন:

> "জন্ম মূহুর্তেই যে আমাদের সাহিত্য অসভ্য ও অনৈসলামিক পথ ধরিয়াছে তাহার নিদর্শন আমরা কায়কোবাদের মহাশ্মশান কাব্যে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হই। মহাশ্মশানের কবি সম্ভবতঃ দুষ্টরসের ভাণ্ড, নতুবা যত অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা তাঁহার কাব্যে স্থান পাইবে কেন? ... শ্লীলতার ধার ধারেন না, যাহা অবগুণ্ঠিত রাখা দরকার তিনি তাহাই মুক্ত করিতে ভালবাসেন। আমি ভাবিতেই পারি না এই মহাশ্মশান কাব্যের রচনা নিয়া আমরা কেমন করিয়া গর্ব অনুভব করি এবং কবিকে পরম সাধুবাদ দেই। ... নিতম্বকে তিনি নানাভাবে সর্ব্ব সাধারণের গোচরীভূত না করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সম্ভবতঃ উহা না করিলে তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইত ... । ... কবিকে চাঁদা করিয়া একটা মেডেল টেডেল যা হোক একটা কিছু দেওয়া উচিত। আশা করি শ্রীঘ্রই আমাদের কোন জাতীয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা চলিবে।"[১৭০]

তবে তদানীন্তন সাময়িকপত্রে মহাশ্মশানের ইতিবাচক সমালোচনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে এটির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। সুসাহিত্যিক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) বলেন:

> "'মহাশ্মশান' কাব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল রত্ন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে যাহা কিছু গৌরবের জিনিস আছে তন্মধ্যে 'মহাশ্মশান'-এর স্থান বোধ হয় সকলের উপরে। কেবল মুসলমান সাহিত্যে কেন - সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর 'মহাশ্মশান' একটা গৌরবময় আসন দাবী করিতে পারে, এরূপ দাবী করিলে যে ইহার পক্ষে কোনরূপ অন্যায় হইবে আমাদের তা মনে হয় না। 'মহাশ্মশানের' ন্যায় বৃহদাকার কাব্য বোধ হয় বঙ্গ সাহিত্যে আর হয়

১৭০. সৈয়দ এমদাদ আলী, *মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব*, *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

নাই। কেবল বৃহত্তেই ইহার শ্রেষ্ঠতা নহে, কাব্য হিসাবেও ইহা আমাদের গৌরবের জিনিস। অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যে ইহার স্থান এত উপরে যে ইহাকে প্রথম স্থান দিলে, দ্বিতীয় স্থান দিবার উপযোগী কাব্য মুসলমান সমাজে এখনো জন্মগ্রহণ করে নাই বলিয়াই আমরা মনে করি। একত্রে এত রসের সমাবেশ বাঙ্গালা অল্প কাব্যেই দেখিয়াছি। কি আদি রসের বর্ণনায়, কি করুণ রস সৃষ্টিতে, কি বীর রসের অবতারণায়, কি যুদ্ধ বর্ণনা কৌশলে - সর্বত্রই এই প্রতিভাবান কবি অল্প বিস্তর সফলকাম হইয়াছেন, কবিত্ব হিসাবেও কাব্যখানি উপাদেয় হইয়াছে।... গত বৈশাখের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকার'র প্রথম পাতায় প্রাপ্ত 'মহাশ্মশান কাব্যে অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব' ... প্রবন্ধটি একাধারে কবি ও সমালোচক সৈয়দ এমদাদ আলী কর্তৃক লিখিত। প্রবন্ধটিতে তিনি যে রূপ সমালোচনা জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি। মহাশ্মশানের সর্ব প্রধান গুণ ইহার সরল প্রকাশ ক্ষমতায়। ... কায়কোবাদ সাহেব যে বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছেন না, এর কারণ, এখনো বাঙ্গালী মুসলমান কাব্য রসাস্বাদনে অভ্যস্ত নহেন, নৈতিক উপদেশের গভীর নিনাদে তাঁহাদের কর্ণ বধির হইয়া আছে, কাব্যের মধুর ঝঙ্কার এখনো তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ লাভ করে নাই। ...সঙ্গীত এই কাব্যখানির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অধিকার করিয়া আছে। ... ইহার ভাষা এতই সরল, সহজ, মধুর ও অনায়াস গামিনী যে একমাত্র মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন ব্যতীত বঙ্গ সাহিত্যের আর ইহার তুলনা নাই। কায়কোবাদ সাহেব সুদক্ষ চিত্রকর। তিনি মধুর বর্ণনার তুলিকায় যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবের জিনিস। কায়কোবাদ সাহেবের প্রকৃতি বর্ণনা অতিসুন্দর। ... যুদ্ধ বর্ণনা কৌশলেও কায়কোবাদ সাহেব অপটু নহেন। ... তাহার প্রায় সমস্ত উপমাই সুনির্ব্বাচিত। কায়কোবাদ সাহেব মহাশ্মশান কাব্য রচনায় মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন।"[১৭১]

১৭১. আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, *মহাশ্মশান*, *সওগাত*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

ইসমাঈল হোসেন সিরাজী লিখেন:

> "... মহাকবি কায়কোবাদের লেখা যেমন সরল ও সরস, ভাবও তেমনি পবিত্র ও উদার। তাঁহার মহাকাব্য বঙ্গভাষার 'রাণীর' কোহিনূরের ন্যায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মহাশ্মশান বাস্তবিকই বিশ্বজয়ী বিপুল গৌরবশালী মোসলমানের অনন্ত কীর্তির মহাগোরস্তান। এই মহাকাব্যের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে কবিত্বের অমৃত লহরী ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। ... কায়কোবাদ বঙ্গীয় মোসলমানের গৌরবের উন্নত পতাকা। কায়কোবাদ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল নব শশিকলা। ... কায়কোবাদের প্রতিভা এবং কবিত্ব অতুলনীয় এবং অসাধারণ। বঙ্গের কাব্য বিকাশে তিনি পূর্ণচন্দ্র।"[১৭২]

'মহাশ্মশান' সম্পর্কে আবদুল লতিফ চৌধুরীর মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> "কায়কোবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি মহাশ্মশান। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ; মহাশ্মশান কাব্যই কায়কোবাদকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রেখেছে।[১৭৩]" পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ আনন্দবাজার পত্রিকায়, নলীনিকান্ত ভট্টশালী সওগাত পত্রিকায় মহাশ্মশান-এর ইতিবাচক সমালোচনা করেন। আলোচনা সমালোচনা যাই হোক শেষ অবধি মহাশ্মশানের কবিরই জয় হয়। তদানীন্তন মুসলিম বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তিনি পরিগণিত হন। ভারত সরকার মহাশ্মশানের দুই কপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে মওজুদ করেন।[১৭৪] এছাড়া কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের পর বহু হিন্দু-মুসলিম সাহিত্য বোদ্ধা কবির নিকট প্রশংসাসূচক পত্র পাঠান। এ কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে কায়কোবাদ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নেন।[১৭৫]

মহাশ্মশানই কবির চাকুরী জীবনে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। তবে কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল। ১৯১৯ সালে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে কবি তার জন্মভূমি আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন।

---

১৭২. মাসিক মোহাম্মদী, ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

১৭৩. আবদুল লতিফ চৌধুরী, *কবি কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

১৭৪. দেওয়ান আবদুল হামিদ, *মাসিক মোহাম্মদী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৯

১৭৫. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

'মহাশ্মশান' কাব্যের কাহিনী

'মহাশ্মশান' ঐতিহাসিক কাহিনী নির্ভর কাব্য। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হচ্ছে এর পটভূমি। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘটিত এ যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছে। এ কাব্যে দীর্ঘ প্রায় পাঁচশত বছরের মুসলিম রাজশক্তির বিরুদ্ধে উদীয়মান মহারাষ্ট্র শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী শিবাজীর ভাবশিষ্য পেশবার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র শক্তি ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। অনিবার্য যুদ্ধে মুসলিম নেতা নজীব উদ্দৌলার আমন্ত্রণে মুসলমানদের সহযোগিতা করতে আফগান অধিপতি বীর কেশরী আহমদ শাহ আবদালী ভারত আগমণ করেন। মহারাষ্ট্র পক্ষে পেশবা-পুত্র বিশ্বনাথ রাও ও সেনাপতি সদাশিব রাও যুদ্ধের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হন। পক্ষান্তরে মুসলিম পক্ষে নেতৃত্ব দেন রোহিলা অধিপতি নজীব উদ্দৌলা, আফগান অধিপতি আহমদ শাহ আবদালী ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা। মুসলিম পক্ষে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) সৈন্য ও মারাঠা পক্ষে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) সৈন্য পানিপথ প্রান্তরে মুখোমুখি হয়। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে মারাঠা শক্তি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) মারাঠা সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রেই নিহত হয়। বাকী সৈন্যের মধ্যে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) বন্দী হয় এবং ৬০,০০০ (ষাট হাজার) পালিয়ে যায়। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয়ী হলেও যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে তাঁদের শক্তি ও সামর্থ প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়ে। এ ক্ষয়-ক্ষতি তারা আর কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে ইংরেজ বেনিয়াদের আক্রমণ ও দখলদারীত্বের কার্যকর প্রতিরোধ তারা কোনভাবেই গড়ে তুলতে পারেনি। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হিন্দুদের যেমন বিধ্বস্ত করেছে তেমনি মুসলিম রাজ শক্তিকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে - সেই অর্থে এ যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'মহাশ্মশান' রাখাটা যথার্থ হয়েছে।

এ যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করে কবি মর্মাহত হয়েছেন। যুদ্ধে বিবদমান দু'টি জাতি - হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ জাতীয় জীবনকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি সমাজের প্রত্যেক স্তরে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। জনজীবনকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে এ যুদ্ধ।

কাব্যটি যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হলেও যুদ্ধকে চাপিয়ে মানব-মানবীর আবেগ ও প্রেম ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ কাব্যে যুদ্ধ ও প্রেম সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে। মানব-মানবীর চিরন্তন ও শ্বাশ্বত প্রেম, বিরহ আর করুণ পরিণতি প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত নর-নারীর জীবন হয়ে উঠেছে বিষাদময়। এ কাব্যের পরতে পরতে রয়েছে বীরত্ব, ত্যাগ, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, বিশ্বাসঘাতকতা, কূটনীতি সেই সাথে ব্যক্তিগত আবেগ, প্রেম, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিড়ম্বনা, কাপুরুষতা, ঈর্ষা, লোভ, মোহ ও অসহায়ত্ব। ক্ষণে ক্ষণে যুদ্ধকে চাপিয়ে মানব-মানবীর প্রেমই হয়ে উঠেছে কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বিবদমান দু'টি জাতির জন্য যুদ্ধ যেমন ধ্বংসাত্মক বার্তা নিয়ে এসেছে তেমনি মানব-মানবীর ব্যক্তিগত জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যুদ্ধের পরিণতি বিবদমান দু'টি জাতিকেই ক্ষত-বিক্ষত করেছে। বিশেষ করে হৃদয় জগতকে ধ্বংস করে চিতাভস্মে পরিণত করেছে। এক পর্যায়ে সকলের জীবনকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছে।

'মহাশ্মশান' কাব্যে পাঁচটি প্রেম কাহিনী রয়েছে। এব্রাহীম কার্দ্দি-জোহরা বেগম, হিরণ-আতা খাঁ, লবঙ্গ-রত্নজী- সুজাউদ্দৌলা, সেলিনা ও বিশ্বনাথ-কৌমুদির প্রেম এ কাব্যে ব্যাপৃত হয়ে আছে।

এর মধ্যে হিরণ ও আতা খাঁর প্রেম কাহিনী সবচেয়ে উজ্জ্বল। আত্মদ্বন্দ্বে, ত্যাগে, বিরহের যন্ত্রণায় ও ভালোবাসার গভীরতায় এদের প্রেম হয়ে উঠেছে হীরন্ময়। লবঙ্গ-রত্নজীর প্রেম ত্যাগে, বেদনায়, ক্রমশ করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলায় অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। মারাঠা ও মুসলমানের সংঘাতের পটভূমিতে সৃষ্ট এব্রাহিম কার্দ্দির দাম্পত্য প্রেম খুবই বেদনাদায়ক। বিশ্বনাথ-কৌমুদীর প্রেম অপরিমেয় ত্যাগের আরেক দৃষ্টান্ত। সুজাউদ্দৌলা-সেলিনার প্রেম কাহিনী ত্যাগ আর যন্ত্রণার এক প্রতিচ্ছবি।

উপর্যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন পানিপথের ভয়াবহ যুদ্ধের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রতিটি প্রেমের পরিণতি হয়েছে বেদনা-বিধুর। আহমদ শাহ আবদালী, পেশবা ও সদাশিব ছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রীয় বীর চরিত্রই প্রেমভাবনায় উদ্বেল। কাজী আবদুল মান্নান এ প্রসঙ্গে বলেন:

> "আসন্ন সংঘাতের ভাবনা তাদের বিচলিত করেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের হৃদয় রাজ্যে। সে রাজ্যের অধিশ্বর হচ্ছে নারী।[১৭৬]"

১৭৬. *আবদুল মান্নান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

কায়কোবাদ এ কাব্যের যুদ্ধের ভয়াবহতা ও এর মর্মান্তিক পরিণতি এবং দু'টি জাতির সংঘাত ও বিপর্যয় সেই সাথে জাতীয় জীবন ও ব্যক্তি জীবনের করুণ পরিণতিই তুলে ধরেছেন। কাজী আবদুল মান্নান যথার্থই বলেছেন:

> "কায়কোবাদ তাঁর বিপুল কাব্যের মধ্যে এক দিকে যেমন পানিপথ প্রান্তরের ভয়াবহ রূপ অংকিত করেছেন অন্যদিকে তেমনি পানিপথে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের পরিণতিকেও করুণ ও মর্মান্তিক রূপে চিত্রিত করেছেন - তা যেমন জাতীয় জীবনে তেমনি ব্যক্তি জীবনেও। মহাশ্মশান কাব্যে কবি প্রেরণার প্রধানতঃ দু'টি ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় - তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বৃহৎ ঐতিহ্যবান জাতির সংঘাত এবং সেই সংঘাতে সৃষ্ট ব্যক্তির জীবনে বিপুল ব্যর্থতা। হিন্দু ও মুসলমান জাতির বলবীর্য এবং ঐশ্বর্য বর্ণনা যেমন তাঁর কাব্যের বিরাটাংশে অধিকার করেছে, তেমনি এব্রাহিম-জোহরার দাম্পত্য প্রণয়ে নৈতিক দ্বন্দ্ব, আতা খাঁ-হিরণের একনিষ্ঠ প্রেম, সেলিনার অপূর্ব আত্মত্যাগ এবং লবঙ্গ-রত্নজীর আদর্শের ঐক্য ও প্রেমের গভীরতাকেও তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সব ঘটনার উর্ধ্বে। বস্তুত: তাঁর কাব্যে মহাশ্মশান শুধু ভারতের দুটি জাতির জীবনেই নয়, কতকগুলি নর-নারীর জীবনেও বটে।[১৭৭]"

পাঁচটি প্রেম কাহিনীর মধ্যে তিনটি কাব্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে ব্যাপৃত রয়েছে। এব্রাহিম কার্দ্দি-জোহরা বেগম, হিরণ-আতা খাঁ এবং লবঙ্গ-রত্নজীর প্রেমকাহিনীর পরিসর সুদীর্ঘ। অন্য দু'টি তথা বিশ্বনাথ-কৌমুদী ও সুজাউদ্দৌলা-সেলিনার প্রেম কাহিনীর পরিসর স্বল্প। কাব্য শুরুর আগেই এব্রাহিম কার্দ্দি ও জোহরা বেগমের প্রেম ও শেষ পরিণতির ইঙ্গিতবাহী শৈশবের একটি দৃশ্য রয়েছে। কাব্য শুরু হয়েছে লবঙ্গ-রত্নজীর কাহিনী দিয়ে আর শেষও হয়েছে লবঙ্গলতার করুণ ও মর্মান্তিক উপস্থিতির মাধ্যমে। কাব্যের প্রধান তিনটি চরিত্র - নজীব উদ্দৌলা, আহমদ শাহ আবদালী ও সদাশিব রাওয়ের কাব্যে উপস্থিতি স্বল্প সময়ের জন্য।

কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসার বলেন, "... যুদ্ধ এ কাব্যের পটভূমি মাত্র, মানব-হৃদয়ের যন্ত্রণা ও তার আর্তনাদের প্রকাশই এ কাব্যের মূল লক্ষ্যে পর্যবসিত।[১৭৮]"

---

১৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬

১৭৮. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

মহাশ্মশান কাব্যের প্রেমকাহিনী সমূহ

'মহাশ্মশান' কাব্যের অন্যতম প্রধান প্রেমকাহিনী হিরণ-আতা খাঁর প্রেমকাহিনী। আতা খাঁ মুসলিম আর হিরণ হিন্দু। কাব্যের প্রথম পর্যায়ে আতা খাঁর হিন্দু পরিচয় পরিদৃষ্ট হয়। তখন তার নাম ছিল অমরেন্দ্র। মারাঠা আশ্রমের শিক্ষার্থী এ দু'জনের মধ্যে অনন্য সাধারণ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় অপর দুটি চরিত্র দিলীপ ও জ্যোৎস্না। দিলীপ হিরণকে আর জ্যোৎস্না অমরেন্দ্ররূপী আতা খাঁকে ভালোবাসে। এ দুজন তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হিরণ ও আতা খাঁর প্রেমে বার বার বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এক্ষেত্রে জ্যোৎস্না আতা খাঁকে পাওয়ার জন্য দিলীপের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে। জ্যোৎস্না নারী হয়েও হিরণকে ঠেলে দিয়েছে মহাবিপদের মুখে। হিরণ দিলীপ কর্তৃক আক্রান্ত হলে আতা খাঁ তাকে দেবদূতের মতো উদ্ধার করে। দিলীপের ষড়যন্ত্রে আশ্রমের গুরুদেব হিরণ ও আতা খাঁর প্রেমের কথা জানতে পারে। দিলীপ যদিও তাঁদের ক্ষতি করার মানসে গুরুদেবের কাছে বিষয়টি জানিয়েছিল কিন্তু গুরুদেব সব জানতে পেরে অমরেন্দ্র রূপী আতা খাঁ ও হিরণের মধ্যে হিন্দু মতে বিয়ে দিয়ে দেন। বিয়ের পর আশ্রমে থাকার বিধান না থাকায় এবং দিলীপের ষড়যন্ত্রের কোপানল থেকে বাঁচার জন্য গুরুদেব তাঁদেরকে নিজের অনুগত শিষ্য বিপ্রদাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। গুরুদেব অমরেন্দ্র রূপী আতা খাঁকে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা বাহিনীতে যোগ দিয়ে বীরের মতো যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। অমর বিপ্রদাসের নিকট হিরণকে রেখে চলে যায়। অতঃপর আমরা তাঁকে আহত অবস্থায় জোহরা বেগমের আশ্রয়ে দেখতে পাই। এ পর্যায়ে প্রকাশ পায় অমরেন্দ্রই আতা খাঁ। কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে অমরেন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত জ্যোৎস্নার কথায় তার পরিচয় প্রকাশ পায়। জ্যোৎস্না অমরের প্রতিদ্বন্দ্বী দিলীপকে জানায় অমরেন্দ্র হিন্দু নয় মুসলিম রোহিলা পাঠান, নাম তার আতা খাঁ। জ্যোৎস্না আতা খাঁকে ভালোবাসে তাই হিরণকে পথের কাঁটা মনে করে দুরাচার দিলীপকে সহযোগিতা করে। দিলীপ লম্পট আদিনা বেগের সঙ্গে মিলিত হয় এবং শঙ্করের মাধ্যমে হিরণকে অপহরণ করে। আদিনা বেগ হিরণকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে আঞ্জোমান কর্তৃক নিহত হয়। কিন্তু শঙ্কর হিরণকে আবার অপহরণ করে দিলীপের নিকট নিয়ে যায়। আতা খাঁ দিলীপের হাত থেকে হিরণকে উদ্ধার করে আগ্রার নিকটে এক পুরনো বাড়িতে শেফালি ও বকুল নামে দুই দাসীসহ রেখে যুদ্ধে চলে যায়।

এর মধ্যে হিরণ আতা খাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যায়। কিন্তু এতে তাঁর নির্মল ভালোবাসায় টান পড়েনি। সে তার ভালোবাসায় অবিচল ও সুদৃঢ় থাকে।

আতা খাঁ চলে যাওয়ার পর দিলীপ তার সহযোগী দস্যুদের নিয়ে আবার হিরণকে অপহরণ করে। না পাওয়ার বেদনা দিলীপের মধ্যে জিঘাংসার সৃষ্টি করে। সে হিরণকে কুঞ্জপুরে মহারাষ্ট্র শিবিরে গুরুদেব ও সদাশিবের নিকট নিয়ে যায়। হিরণ অমিত সাহস ও ভালোবাসার শক্তি নিয়ে সব কিছু স্বীকার করে। সদাশিবের র্ভৎসনার জবাবে হিরণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জানায়, সে কোন অপরাধ করেনি, সে তার স্বামীকে ভালোবাসে। হিরণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সদাশিব নির্মম শাস্তির ঘোষণা করে। সতের জন সৈনিককে আদেশ করে হিরণকে শ্মশান কালির ঘাটে জীবন্ত দগ্ধ করতে। শেষ মুহূর্তে দেবদূতের মতো আবির্ভাব হয় আতা খাঁ। সে চিতার আগুন থেকে হিরণকে উদ্ধার করে। অতঃপর সংবাদ আসে হিন্দু-মুসলিম পানিপথ প্রান্তরে মুখোমুখি হয়েছে। আসন্ন যুদ্ধে স্বজাতির পক্ষে লড়াই করার জন্য আতা খাঁ হিরণের কাছ থেকে বিদায় নেয়। হিন্দু মতে আতা খাঁ-হিরণের বিয়ে হলেও মুসলমান শাস্ত্র মতে তাদের বিয়ে হয়নি। বিষয়টি আতা খাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করে। আতা খাঁ মন্নু বেগকে কথা দিয়েছিল মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত না করে বিয়ে করবে না। ফলে যুদ্ধের পূর্বে বিয়ের পিড়িতে বসা সম্ভব হয়নি। এক বুক ভালোবাসা ও পরকালে মিলনের প্রত্যাশা নিয়ে আতা খাঁ হিরণের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

তৃতীয় খণ্ডে আতা খাঁ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অমিত সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দেয়। কাপুরুষ দিলীপ পেছন থেকে আক্রমণ করে আতা খাঁকে হত্যা করে। আর মন্নুবেগরূপী জোহরা বেগম দিলীপকে হত্যা করে। যুদ্ধ শেষে আতা খাঁর সমাধি মন্দিরে বিষাদ সঙ্গীত গাইতে গাইতে হিরণও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। হিরণ-আতা খাঁর নির্মল ভালোবাসা যুদ্ধের ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাড় খার হয়ে যায়। তাদের স্বর্গীয় প্রেম এক চরম ট্রাজিক পরিণতি লাভ করে।

মহাশ্মশান কাব্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেম কাহিনী এব্রাহিম কার্দ্দি ও জোহরা বেগমের প্রেমকাহিনী। ব্যক্তি জীবনে এরা স্বামী-স্ত্রী। দু'জনই মুসলমান। আদর্শিক কারণে তাদের দাম্পত্য প্রেমে সংকট দেখা দেয়। তারা দু'জনই ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সম্মানজনক জীবিকার জন্য এব্রাহিম কার্দ্দি বহু মুসলিম নৃপতির দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। পরিশেষে মারাঠা শিবিরে

সেনাপতির চাকুরি জোটে তার। পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা শিবিরের অন্যতম শক্তি এব্রাহিম কার্দ্দি স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কারণ সে মারাঠা অন্নে লালিত। বিপদের সময় যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, অন্ন দিয়েছিল, তাদের বিপরীতে অবস্থান করা এব্রাহিম কার্দ্দি সঠিক মনে করেনি। সে মনে করে মুসলিম ধর্মমতে মনিবের শোকর গোজারী করাই ধর্ম। নিমক হারামী করা বরং অধর্ম। ফলে ধর্মপ্রাণ এব্রাহিম কার্দ্দি মুসলমান হয়েও মারাঠাদের পক্ষে অস্ত্রধারণে সংকল্পবদ্ধ। তদীয় স্ত্রী জোহরা বেগমও ধর্মপ্রাণ মুসলিম বীর নারী। সে মনে করে মুসলিম হয়েও তার স্বামী স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছে - তা ধর্ম ও জাতির জন্য কলঙ্ক বই অন্য কিছু নয়। মুসলিম হয়ে হিন্দুর অন্ন গ্রহণ করাও পাপ কাজ। ফলে জোহরা বেগম স্বামীকে প্রাণাধিক ভালোবাসলেও স্বামীর কাছে যেতে পারে না। স্বামীকে কলঙ্কমুক্ত করতে জোহরা বেগম সুদৃঢ় প্রতীজ্ঞা করে। শুরু হয় দাম্পত্য টানা-পোড়েন। সুদৃঢ় দাম্পত্য প্রেম ও ভালোবাসা পরস্পরের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। এ আদর্শগত দ্বন্দ্ব উভয়কেই পানিপথ প্রান্তরে নিয়ে আসে। বিরহ, যন্ত্রণা আর বিচ্ছেদের বেদনায় তাদের উভয়ের জীবনই হয়ে ওঠে সংঘাতময়। স্বামীকে যুদ্ধ থেকে ফেরাতে না পেরে জোহরা বেগম 'মন্নু বেগ' নাম ধারণ করে পুরুষ বেশে অসি হাতে যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে আবির্ভূত হয়।

কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এব্রাহিম কার্দ্দি ও জোহরা বেগম মুখোমুখি হয়। প্রেমের তীব্রতা উভয়েই অনুভব করে। এব্রাহিম কার্দ্দি চায় জোহরা বেগম তার কাছেই থাকুক। কিন্তু জোহরা বেগম হিন্দুর সেবায় নিয়োজিত স্বামীর জীবিকাকে হারাম মনে করেন। তিনি স্বামীর সাহচর্য চান তবে হিন্দুর পৃষ্ঠপোষকতায় নয়। জোহরা বেগম স্বামীকে ফিরিয়ে নিতে অনেক চেষ্টা করেন। এব্রাহিম কার্দ্দি ফিরে আসতে পারে না। যাদের জীবিকায় তার দেহ বর্ধিত হয়েছে, তাদেরকে দুর্দিনে ফেলে যাওয়া তার বিবেককে দংশন করে। মনিবগোষ্ঠীর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করা সে কর্তব্য মনে করে। হেরে যায় প্রেম ও ভালোবাসা। উভয়ের কাছেই প্রাধান্য পায় নিজস্ব আদর্শ। প্রেম ও আদর্শে আপোষ হয় না।

কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে যুদ্ধ শেষে আবার দেখা হয় দু'জনার। এখানে জয় হয় প্রেম ও ভালোবাসার। এব্রাহিম কার্দ্দি আহত অবস্থায় বন্দী হলে মন্নুবেগ রূপী জোহরা বেগম যুদ্ধের ময়দানে অসাধারণ বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ স্বামীর বন্ধীত্ব মুক্তির প্রার্থনা করে। স্ত্রীর অমিয়

ভালোবাসায় সিক্ত এব্রাহিম কার্দ্দি মুক্তি পেলেও মৃত্যুবরণ করে। স্বামীর শোকে জোহরা বেগমও মৃত্যুর ওপারে যাত্রা করে। যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রেম ও আদর্শের অবসান ঘটায় তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। একটি সুন্দর দাম্পত্য প্রেম বিচ্ছেদ ও যন্ত্রণার অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। এ ট্রাজিক পরিণতি কাব্যের শুরুতে লাহোরের বাগানে কৈশোর বয়সের এব্রাহিম কার্দ্দি ও জোহরা বেগমের একটি ঘটনার ইঙ্গিতবাহী।

কাব্যের আরেকটি প্রেম কাহিনী লবঙ্গলতা ও রত্নজীকে নিয়ে। লবঙ্গ-রত্নজীর কাহিনী দিয়েই কাব্যের শুরু। 'মহাশ্মশান' শেষও হয়েছে লবঙ্গলতার করুণ উপস্থিতি ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে। কাব্যের শুরুতে দেখা যায়, লবঙ্গ-রত্নজী শৈশব থেকে একে অপরকে ভালোবাসে। লবঙ্গ ও রত্নজীর মাতা-পিতা তাদের বিয়ে ঠিক করে রাখেন। লবঙ্গের মাতা এবং রত্নজীর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। লবঙ্গের বিমাতা সিন্ধুজীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তার সাথে লবঙ্গের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের উৎসব থেকে লবঙ্গলতা পালিয়ে যায় এবং কৃষ্ণার সলিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে নদী থেকে উদ্ধার পায় এবং বসন্ত রঞ্জনের গৃহে আশ্রয় পায়। এক পর্যায়ে রত্নজীকে দূর থেকে দেখে মূর্ছা যায়। রত্নজী তার বন্ধু যাদব রাওকে সিন্ধুজীর সাথে মিশেছে মনে করে ভুল বুঝে অবিশ্বাস করে। এই অবিশ্বাস দূর করার মানসে যাদব রাও মায়ের সাথে পরামর্শ করে রত্নজীর বিয়ে ঠিক করে। পাত্রী লবঙ্গলতা কিন্তু বিষয়টি রত্নজীর নিকট গোপন রাখা হয়। কিন্তু রত্নজী বিয়ের দিনই নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এবং প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বিন্দাচলে মুনিদের আশ্রয়ে চলে যায়। সেখান থেকে মায়ের কাছে পত্র লেখে এবং নববধূকে দেখে রাখতে বলে। লবঙ্গলতা সব জেনে রত্নজীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করে। পথিমধ্যে লবঙ্গলতা বিপদাপন্ন হয় এব্রাহিম কার্দ্দি তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু লবঙ্গলতার অনন্য সাধারণ রূপ সৌন্দর্য তার নিরাপত্তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। বারবার বিপদগ্রস্ত হতে থাকলে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে এবং আবার নদীতে ঝাঁপ দেয় জীবন বিসর্জনের উদ্দেশ্যে।

কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যায় লবঙ্গলতার বিরহে রত্নজী আত্মহত্যার সংকল্প করে। লবঙ্গের মামা শান্তজী রত্নজীকে আত্মহত্যা না করার পরামর্শ দেয় এবং দেশের কল্যাণে মহারাষ্ট্র গুরুর কাছে যুদ্ধে প্রাণদানের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। রত্নজী তাই করে। সদ্য সন্ন্যাসী রত্নজীর সাথে লবঙ্গলতার দেখা হয় ভৈরবীর সহযোগিতার মাধ্যমে। দীর্ঘদিন পর মিলন হলেও

তা দীর্ঘস্থায়ী হয়না। রত্নজী এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে – ভৈরবীবেশে দেবী তাকে স্বপ্নে আদেশ করেছে, দেশের কল্যাণে দু'জনের দু'টি হাত উৎসর্গ করার জন্য। কারণ যোগধর্ম ভ্রষ্ট হয়ে রত্নজী পুনরায় লবঙ্গের প্রেমে পড়েছে। পানিপথের নিকটস্থ বনভূমির কালিকা মন্দিরের সন্ন্যাসীকে রত্নজী স্বপ্নাদেশটি জানালে সন্ন্যাসী জানান, তিনিও এ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন। অতঃপর লবঙ্গ-রত্নজী দেশের কল্যাণে আনন্দ চিত্তে সন্ন্যাসীর সহযোগিতায় তাদের দু'টি হাত উৎসর্গ করে। স্বপ্নাদেশ কার্যকর করার পর পিপাসার্ত হয়ে উভয়ে নদী তীরে গেলে অকস্মাৎ বন্দুকের গুলিতে রত্নজী আহত হয়ে নদীতে ডুবে যায়। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল লবঙ্গলতাও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রত্নজীর এখানেই মৃত্যু ঘটে।

লবঙ্গলতাকে কাব্যের শেষাংশে উন্মাদিনীর বেশে দেখা যায়। লবঙ্গের বিষাদ সঙ্গীতের মাধ্যমেই কাব্যের সমাপ্তি ঘটে। লবঙ্গ-রত্নজীর কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দৈব প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। কাহিনীটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করুণ ও বিষাদময়। তাদের করুণ পরিণতির কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে তারা দৈববের শিকার। তাদের পরিণতি দৈব নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। দৈব্যের ভূমিকাই মুখ্য আর তাদের ভূমিকা গৌণ।

মহাশ্মশান কাব্যে গুরুত্বের দিক থেকে চতুর্থ প্রেম কাহিনী হচ্ছে বিশ্বনাথ-কৌমুদীর প্রেম। কৌমুদী অসাধারণ সুন্দরী নারী। প্রথম খণ্ডের চতুর্থ সর্গের মধ্য দিয়ে কাব্যে তার আবির্ভাব। বিশ্বনাথ পেশবাপুত্র আর কৌমুদী গুরু কন্যা। উভয়েই স্বদেশ ভাবনায় বিচলিত। কৌমুদী স্বদেশ চিন্তায় উদ্বিগ্ন। সে দেশ সেবায় আগ্রহী। স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারে প্রেমিক বিশ্বনাথকে সে উত্তেজিত করে তোলে। এ কাব্যে কৌমুদীই প্রথম ব্যক্তি যার মুখে স্বদেশ ও যুদ্ধের কথা শোনা যায়। কৌমুদীবাঈ প্রেমিক প্রবর বিশ্বনাথকে দেশের পক্ষে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বনাথ প্রণয়ীর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই কতিপয় দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। কৌমুদী প্রিয়তমের এহেন অবস্থায় অসি হাতে এগিয়ে আসে এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করে মুমূর্ষু অবস্থায় বিশ্বনাথকে উদ্ধার করে। এক সময় বিশ্বনাথ সুস্থ হয় এবং যুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু প্রেমিক প্রবরের চিন্তায় কৌমুদী বাঈ বিচলিত হয়ে ওঠে। মহারাষ্ট্র গুরু বিষয়টি অনুধাবন করে কৌমুদীকেও যুদ্ধে অংশ নিতে আহ্বান জানায়। যুদ্ধ শেষে বিশ্বনাথের সাথে তার বিয়ে দেবেন বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বনাথ-কৌমুদী - দু'জনই দেশের তরে যুদ্ধ করে জীবন দিতে প্রস্তুতির কথা জানায়। তারা এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে।

তৃতীয় খণ্ডে কালিকা মন্দিরে দেবীর পূজার পর কৌমুদীবাঈ প্রিয়তম বিশ্বনাথের হাতে তরবারি তুলে দেয় আর বলে দুঃখিনী ভারতকে রক্ষা করতে। কৌমুদী আরো বলে, যদি বিশ্বনাথ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সারা জীবন কেঁদে কেঁদে তার শ্মশানে কাটিয়ে দেবে। বিশ্বনাথ কৌমুদী কর্তৃক উদ্দীপ্ত হয়ে তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়ে। সে প্রতিজ্ঞা করে মুসলিম নিধন না করে ফিরে আসবে না। যদি ফিরে না আসে তাহলে কৌমুদী যেন তাকে ক্ষমা করে দেয়। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বিশ্বনাথ ময়দানে মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধ শেষে মহারাষ্ট্র গুরু কৌমুদীকে সেতারায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে। কৌমুদী সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং বিশ্বনাথের শ্মশানে মন্দির তৈরি করে। সেখানেই জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেয়। কৌমুদীকে সবাই দেবী হিসেবে মানে। আর কৌমুদী স্থানীয় ও পথচারীদের তাবিয কবয ও পানি পড়া দিয়ে সেবা করে যায়। বিশ্বনাথ ও কৌমুদীর কাহিনীর মধ্যে প্রেম ভাবনা ও স্বদেশ চিন্তা সমান্তরাল গতিতে বহমান। কোন কোন সময় স্বদেশ প্রেম পারস্পরিক প্রেম থেকে আরো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। সবশেষে কৌমুদী প্রিয়তমের সাথে কৃত প্রতীজ্ঞা পালন করে তার অনন্য ভালোবাসার প্রমাণ দেয়।

'মহাশ্মশান' কাব্যের সর্বশেষ প্রেমকাহিনী সেলিনা-সুজাউদ্দৌলার দাম্পত্য প্রণয়। যুদ্ধের কারণে এ দম্পত্তির জীবনে নেমে আসে বিয়োগান্ত পরিণতি। সেলিনা-সুজাউদ্দৌলার প্রণয়-কাহিনীতে সুজার প্রাধান্য থাকলেও সেলিনার আত্মত্যাগ মহিমান্বিত হয়ে আছে।

সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের মিত্র। তিনি আবার তার স্বজাতির প্রতি অনুরাগী। একদিকে মিত্র আরেক দিকে স্বজাতিবোধ। তাই সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। মারাঠাদের পক্ষ থেকে দূত আসলে তাদের তিনি ফিরিয়ে দেন। মুসলিম পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য নজীবউদ্দৌলা সুজার কাছে আসেন। তিনি তাকেও একই কথা বলে দেন। পরিশেষে মায়ের নির্দেশে সুজা মুসলিম পক্ষে যোগদান করেন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে প্রেমময়ী স্ত্রী সেলিনার নিকট থেকে বিদায় নিতে আসলে সেলিনা আবেগাপ্লুত হয়ে যান। সেলিনাও সুজার সাথে যুদ্ধে যাওয়ার বায়না ধরেন। যাতে করে সুজার পাশে থেকে শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বামীকে রক্ষা

করতে পারেন। সুজা সেলিনাকে প্রবোধ দিয়ে যুদ্ধে রওনা হন। এদিকে সেলিনা স্বামীর নিরাপত্তা চিন্তায় ব্যকুল হয়ে ওঠেন। এই ব্যকুলতা তাকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে আসে।

তৃতীয় খণ্ডে যুদ্ধের ময়দানে প্রিয়তম স্বামীকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন। আর সুজাউদ্দৌলা - তিনি চোখের সামনে প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। অতঃপর বীর বিক্রমে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর ব্যুহ ভেদ করতে থাকেন। যুদ্ধ শেষে প্রিয়তমা স্ত্রীর শোকে সুজাউদ্দৌলা বিলাপ করতে থাকেন। এ প্রেম কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সেলিনা নিজের জীবন দিয়ে প্রিয়তমকে রক্ষা করার মাধ্যমে যে আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন - তা তাকে মহিমান্বিত করেছে। সেলিনা-সুজাউদ্দৌলার দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। কিন্তু যে যুদ্ধের পক্ষে সুজা ছিলেন না এবং নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সে যুদ্ধই তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মানব-মানবীর সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে এ যুদ্ধ। সুজার বিলাপের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি পরিদৃষ্ট হয়েছে।

মহাশ্মশান কাব্যের প্রেম কাহিনীগুলো যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবান্বিত। এ কাহিনীগুলোর পাত্র-পাত্রী তাদের সুন্দর ও স্বপ্নময় জীবনকে হারিয়েছে যুদ্ধের পরিণতির কাছে। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতির কাছে বিপর্যস্ত মানব-মানবীর প্রেম। যুদ্ধ শেষে কেউ নিহত হয়েছে, কেউ উন্মাদ হয়েছে, কেউবা সন্ন্যাসব্রতকে জীবনের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে। জাতীয় জীবনের যুদ্ধ ব্যক্তি জীবনকে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। দু'টি জাতির মধ্যে সংঘঠিত এ যুদ্ধ উভয় জাতিকে যেমন বিপর্যস্ত করেছে তেমনি ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়ে এসেছে দুঃখ, বেদনা, হতাশা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

মহাশ্মশান কাব্য যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হলেও ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনীগুলো অনেকাংশে প্রধান আকর্ষণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কায়কোবাদ যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে জাতি ও ব্যক্তি কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই দেখাতে চেয়েছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা ব্যক্তি জীবনকে কতটা বিধ্বস্ত করতে পারে তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ এ কাব্যের প্রেমকাহিনীগুলোর করুণ পরিণতি।

কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে ব্যক্তিগত ও জাতিগত করুণ পরিণতিই বিদৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত সমস্যা, টানাপোড়েন আর বিবদমান দু'টি জাতির ধ্বংসাত্মক পরিণতিই আমরা এ খণ্ডে দেখেছি।

পানিপথের প্রান্তরে মহারাষ্ট্র শক্তিই পর্যুদস্থ হয়নি, মুসলিম জাতিও তার অপূরণীয় অমিত শক্তি হারিয়েছে। ফলে বিদেশী শক্তি তথা ইংরেজ জাতির জন্য ভারতবর্ষ কব্জা করা সহজ হয়েছে। সমকালীন মুসলিম শাসকগোষ্ঠী ইংরেজ বেনিয়াদের সামনে কার্যকর কোন বাঁধার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বিবদমান দু'টি জাতির মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্খিত সুন্দর ভবিষ্যতকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। যুদ্ধ এব্রাহিম কার্দ্দি-জোহরা বেগম, হিরণ-আতা খাঁ,লবঙ্গ-রত্নজী, কৌমুদী বাঈ-বিশ্বনাথ, সুজা ও সেলিনার জীবনকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে।

'মহাশ্মশান' কাব্যে যুদ্ধ জাতীয় ও ব্যক্তি জীবনে কী ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে তাই কবি বিদৃত করেছেন। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ যেমন জাতির সামগ্রিক কল্যাণ নিয়ে আসে না তেমনি ব্যক্তি জীবনকেও করে তুলে দুঃসহ বেদনাময়। একই ভূ-খণ্ডের দু'টি জাতির মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধে বিজয়ীর জন্যও কল্যাণ নিয়ে আসে না। যুদ্ধ শুধু পরাজিত জাতির শক্তি ও সম্পদ বিনষ্ট করে না বিজয়ী জাতিকেও নিবীর্য করে তুলে। পরিণামে উভয়কেই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় - মহাশ্মশান কাব্যে কায়কোবাদ তারই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

কায়কোবাদ তাঁর এ কাব্যে ইতিহাস বর্ণনা করেননি, ইতিহাসকে কাব্যের প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নিয়েছেন মাত্র। ইতিহাসের চেয়ে মানব-মানবীর হৃদয়ের আর্তনাদই তিনি তুলে ধরেছেন। যুদ্ধ শুধু কোন জাতির পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে আসে না, মানব-মানবীর হৃদয়কে করে ক্ষত-বিক্ষত। যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ এখানেই। এমন মানুষ - যারা যুদ্ধ সম্পর্কে জানে না, যুদ্ধের কোন কার্যকারণ সৃষ্টি করেনি, তারাও যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। যুদ্ধ বিবদমান দু'টি শক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, আর এর অগ্নিশিখায় ভস্ম হয়ে যায় বহু নিরীহ মানুষের স্বপ্ন সাধ। মহাশ্মশান কাব্যে এ বিষয়টিই কবি সুচারু রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবি যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি শান্তিকামী। তিনি মনে করেন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংগঠিত না হলে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই শক্তি ও সামর্থের দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী থাকত। ভারতবর্ষের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লিখতে হতো। যুদ্ধ উভয় জাতিকেই শক্তিহীন করেছে। সেই সাথে বহু নিরীহ মানুষ - যারা কোন না কোনভাবে এ যুদ্ধে জড়িয়ে

পড়েছিল, তারাও ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। কবি যুদ্ধ নয় শান্তি চেয়েছেন। যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ কবিকে বিচলিত করেছে। স্বজাতির বিজয়ে কবি উৎফল্লিত হতে পারেননি। কারণ যুদ্ধের অন্তরালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানব ভাগ্যের নির্মমতা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাকে। কবি দেখেছেন যুদ্ধবিরোধী কত মানুষ যুদ্ধের আগুনে সব পুড়িয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। কবি মনের মর্ম যাতনা সম্পর্কে ফাতেমা কাওসার বলেন:

> "যুদ্ধ ও যুদ্ধের ফলাফল কোনটাই কবিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কবির দৃষ্টি মানুষের প্রতি, মানুষের ভাগ্যের প্রতি, যুদ্ধের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ প্রভাব যাদের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানব-ভাবনায় ব্যকুল কবি তাই যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করে যুদ্ধকেই প্রাধান্য দেননি বরং প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের হৃদয়ার্তিকে। তাই কাব্যের শুরু হয়েছে এই মানুষেরই হৃদয়ার্তির দীর্ঘশ্বাসের বিষাদময়তার মধ্য দিয়ে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও যুদ্ধের ফলাফল নির্ণিত হয়ে গেলেও, কাব্য সেখানেই শেষ হয়নি বরং যুদ্ধান্তে মানুষের প্রেম, জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, জীবনের আর্তি, হৃদয়ের যন্ত্রণা ও শূণ্যতার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ...।[১৭৯]"

কায়কোবাদ অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধের বিভীষিকায় বিক্ষত মানব-মানবীর হৃদয়ার্তি খুব কাছ থেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কবি মানুষের দুঃখ-বেদনা অবলোকন করে অশ্রুজলে ভেসেছেন। পানিপথের যুদ্ধ সম্পর্কে কবি বলেছেন:

> "কত পতিহীনা দুঃখিনী রমণীর মর্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাসে ও তপ্ত অশ্রুজলে ইহা রঞ্জিত হইয়াছে, কত পুত্রহীন জনক-জননীর ভীষণ আর্তনাদে ইহা প্রতিধ্বনিত ও স্তম্ভিত হইয়াছে। তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয়ে মহাবৈরাগ্যের উদয় হয়, নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়; তাই আজ পানিপথ ভারতের মহাশ্মশান ...।[১৮০]"

---

১৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

১৮০. কায়কোবাদ, ভূমিকা, *মহাশ্মশান* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪২২ খ্রি.), পৃ. সাত

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিই শৌর্য, বীর্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। তথাপি শান্তিবাদী কবি মনে করেন, এতে কোন গৌরব নাই এমন কি মুসলিম জাতির বিজয়েও কোন মর্যাদা নাই। কবি বলেন:

> "... কত বীর-রত্ন দগ্ধীভূত হইয়াছে, কত উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে, তাহা কে বলিবে? তাই বলিয়াছিলাম একপক্ষে পানিপথ যেমন হিন্দু গৌরবের সমাধিক্ষেত্র; অপর পক্ষে সেইরূপ মুসলমান গৌরবেরও মহাশ্মশান।[১৮১]"

২- শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি

২০ জানুয়ারি, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক অগ্রহায়ণ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে শিবমন্দির বা জীবন্ত সমাধি কাব্য প্রকাশিত হয়। একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। এ কাব্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। এটি একটি কাহিনী কাব্য। প্রথম প্রকাশ হয় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এর পুনর্মুদ্রণ হয়। প্রকাশক আলহাজ্ব এম.এ. সোবহান, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন।

কাব্যের পর্ব সংখ্যা চার। প্রতিটি পর্বে রয়েছে একটি করে খণ্ড। প্রতি খণ্ডে রয়েছে একাধিক সর্গ। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ১৩টি সর্গ। দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে ১২টি সর্গ, তৃতীয় খণ্ডে ৫টি সর্গ এবং চতুর্থ খণ্ডে ৫টি সর্গ রয়েছে।

'শিব মন্দির' কাব্যটি একটি সত্য কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত।[১৮২] জমিদার বদরুদ্দীন হায়দার ও জমিদার মোহিউদ্দিন হায়দারের বংশধর এবং তাদের দেওয়ান সুধীর চন্দ্রের জীবনের কাহিনী নিয়েই এ কাব্য। এতে সমকালীন জমিদারদের অলসতা, অমনোযোগী মনোভাব এবং কর্মবিমুখ বিলাসবহুল জীবনাচার এবং কর্মচারীদের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। আর জমিদারদের এহেন চারিত্রিক দুর্বলতার সুযোগে অধিনস্থ কর্মচারীদের লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে জমিদার পরিবারে নেমে এসেছিল

---

১৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. সাত

১৮২. কায়কোবাদ, ভূমিকা (২য় সং), *শিব মন্দির*, তৃতীয় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন)

অনাকাঙ্ক্ষিত করুণ পরিণতি। জমিদার ও তার কর্মচারীদের অমানবিক লোমহর্ষক আচরণের বাস্তব উপাখ্যান এই শিবমন্দির কাব্য।

'শিব মন্দির' কাব্য একটি মেসেজ দিয়েছে যে, পাপের প্রায়শ্চিত্য ইহজগতেই করতে হয়। জমিদার নুরুদ্দীন হায়দার ও দেওয়ান সুধীর চন্দ্র যে অমানবিক আচরণ করেছেন, এর বদলা তারা ইহজগতে দেখে গেছেন। এদের কারণে অন্যেরা যেমন ধ্বংস হয়েছে, তারাও সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে মুক্তি পায়নি। লোভ আর প্রতিহিংসা তিনটি পরিবারকে বিনাশ করেছে। কায়কোবাদ এ কাব্যে দেখিয়েছেন লোভ আর প্রতিহিংসার কাছে পরাজিত মানুষ কত অমানবিক ও নিষ্ঠুর হতে পারে। কিন্তু এ কথা সত্য – অমানবিক আচরণ আর নৃশংস নিষ্ঠুরতার পরিণাম ভালো নয়, এর কর্মফলে ধ্বংস অনিবার্য।

কায়কোবাদ সত্য কাহিনী নির্ভর এ কাব্যটি রচনা করে তাঁর কবি মানসের মানবিক দিকটি তুলে ধরেছেন। কাব্যটি কবির সহৃদয় মন এবং নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ ও প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কাব্যটি মহাশ্মশান কাব্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। তবে কবির মানবিক দৃষ্টি কাব্যটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে– পাঠক কবির সাথে মর্মাহত ও ব্যথিত হবেন।

শিব মন্দির কাব্যের কাহিনী

ঢাকার খ্যাতিমান জমিদার মোহিউদ্দীন হায়দার। তিনি মৃত্যুবরণ করলে ছোট ভাই বদরুদ্দীন হায়দার জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। জমিদারীর উত্তরাধিকারী তখন দু'জন। নুরুদ্দীন হায়দার ও সদরুদ্দীন হায়দার। নুরুদ্দীন হায়দার বদরুদ্দীন হায়দারের পুত্র আর সদরুদ্দীন হায়দার মোহিউদ্দীন হায়দারের পুত্র। বদরুদ্দীন হায়দার মৃত্যুর পূর্বে এ দু'জনকে সমস্ত সম্পত্তি সমান ভাগে দানপত্র করে দিয়ে যান।

নুরুদ্দীন হায়দার জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তিনি এবং তার দেওয়ান সুধীর চন্দ্র উভয়ে মিলে সদরুদ্দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। জাল দলিলের মাধ্যমে নিরীহ সদরুদ্দীনকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। সদরুদ্দীন তদীয় স্ত্রী হালিমুন্নেসা ও পুত্র আনিসউদ্দিনকে নিয়ে রমনার নিকটবর্তী এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে একটি ছোট্ট

কুঁড়ে ঘর তৈরি করে মানবেতর জীবন-যাপন করতে থাকেন। এক সময় তিনি ভাগ্যান্বেষণে দিল্লী গমন করেন।

নুরুদ্দীন হায়দার কিছুদিন পর নিজের অপরাধ সম্পর্কে অনুতপ্ত হয়ে হালিমুন্নেসা ও তার পুত্র আনিস উদ্দিনকে আনতে গেলে স্বামীর অনুপস্থিতিতে ভাসুরের অনুরোধ হালিমুন্নেসা রক্ষা করেননি। অনাহার, অর্ধাহার আর রোগব্যাধির শিকার হয়ে আনিস উদ্দিন অকালে মৃত্যুবরণ করে। নিঃসঙ্গ হালিমুন্নেসা বাঘের আক্রমণে আহত হয়ে এক সাধুর আশ্রয়ে সন্ন্যাসী হিসেবে জীবন-যাপন করতে থাকেন। দীর্ঘ তেরো বছর পর স্বামী সন্ন্যাসী সদরুদ্দীনের সাথে দেখা হয় এবং তারই কোলে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করে আর সদরুদ্দীন উন্মাদ হয়ে যায়।

নুরুদ্দীনের কুকর্মের কারণে স্ত্রী আত্মহত্যা করে। তার জন্য হালিমা ও আনিসের অকাল মৃত্যু ঘটে এবং সদরুদ্দীন উন্মাদ ও নিরুদ্দেশ হয়। এক পর্যায়ে নুরুদ্দীন হায়দার তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে একমাত্র পুত্র আলাউদ্দিনকে দেওয়ান সুধীর চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রেখে তীর্থযাত্রায় বের হন। নয় বছর পর নুরুদ্দীন পাহাড়সম দুঃখ, বেদনা আর অনুশোচনা নিয়ে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

নুরুদ্দীন সফরে যাওয়ার সাথে সাথেই সুধীর চন্দ্র ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে দেয়। তার প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। নুরুদ্দীনের সাথে যে ভৃত্য গিয়েছিল সুধীর চন্দ্র তাকে বশীভূত করে নুরুদ্দীনকে বিষ প্রয়োগে তার মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ভৃত্য প্রভুর আচরণে বিমুগ্ধ হয়ে তার ভক্ত হয়ে যায়।

দেওয়ান সুধীর চন্দ্রের ষড়যন্ত্র থেমে থাকে না– ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নুরুদ্দীন হায়দারের জমিদারী নিলামে উঠিয়ে নিজ পুত্রের নামে কিনতে থাকে। সেই সাথে আলাউদ্দিন হায়দারকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

আলাউদ্দিন হায়দার সুধীর চন্দ্রের কন্যা বাল্যসঙ্গী লীলাবতীর সাথে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়ে। ওদিকে লীলাবতীর মা-বাবা তার বিয়ে ঠিক করে সুরেশের সাথে। অন্যদিকে নাজেমদ্দী ভালোবাসে জাহানারাকে আর জাহানারা ভালোবাসে আলাউদ্দিনকে। জাহানারা আলাউদ্দিনের মামাতো বোন। শেষ পর্যন্ত জাহানারা-নাজেমদ্দীন প্রণয়ের পথ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে। নাজেমদ্দীন মাতৃরূপী জাহানারার কোলে মৃত্যুবরণ করে।

অকৃতজ্ঞ, লোভী ও নিষ্ঠুর সুধীর চন্দ্র ও স্ত্রী ইন্দুপ্রভা ষড়যন্ত্র করে এক অমাবস্যার রাত্রিতে আলাউদ্দিনকে এক কূপে ফেলে হত্যা করে এবং তার উপর এক শিব মন্দির নির্মাণ করে। বিষয়টি লীলাবতী জানতে পেরে সে রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এক রাতে পিতার সাথে লীলাবতীর কথোপকথন হয়। লীলা তার জীবনের করুণ পরিণতির জন্য পিতাকেই দায়ী করে। সুধীর চন্দ্র মুর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে তার পিস্তলের গুলিতে সে নিহত হয়। লীলাবতী উন্মাদিনী অবস্থায় বেরিয়ে যায়।

দেওয়ান সুধীর চন্দ্রের লোভ, ষড়যন্ত্র আর নিষ্ঠুরতায় জমিদার বংশটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে নিজের বংশও সমূলে বিনাশ হয়ে যায়।

শিব মন্দির কাব্যে সমকালীন বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে কবি ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম জমিদারদের অকর্মণ্যতা এবং তাদের কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। একদিকে লোভ, ষড়যন্ত্র আর নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমেরও আত্মত্যাগের মহিমা এ কাব্যে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে একদিকে অন্যায়, অপরাধ আর বিশ্বাসঘাতকতা অন্যদিকে আদর্শ আর নৈতিকতার উপর অটল থাকার দৃষ্টান্ত এ কাব্যে রয়েছে। তবে মূল বিষয় হচ্ছে পাপের প্রায়শ্চিতও – অন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র আর নিষ্ঠুরতার পরিণতি অতি ভয়ানক।

৩- মহরম শরীফ

২২ নভেম্বর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৪০ বঙ্গাব্দে কবির আরেকটি কাহিনীকাব্য- মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজের সবচেয়ে বেদনাবিধুর ঐতিহাসিক ঘটনা কারবালার কাহিনীকে উপজীব্য করে কবি এ কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডে ১৩টি, দ্বিতীয় খণ্ডে ১২টি এবং তৃতীয় খণ্ডে ৪টি সর্গ আছে। এটি কবি বন্ধু মুনশী রেয়াজ উদ্দীন আহমদের অনুরোধে লিখিত। কাব্য রচনার দীর্ঘ ত্রিশ বছর পূর্বে মুনশী রেয়াজ উদ্দীন আহমদ কবিকে কারবালার যথাযথ ইতিবৃত্ত নিয়ে কাব্য রচনায় অনুরোধ করেছিলেন। কাব্য শুরুর আগে প্রকাশকের নিবেদন রয়েছে। এতে প্রকাশক আব্দুস সোবাহান বলেন: "বাংলা সাহিত্যে কবি কায়কোবাদ স্বপ্রতিভায় চির সমুজ্জ্বল। তৎকালীন কাব্যজগতে স্বল্প পরিসরে যে কয়জন কবি স্বীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কবি

কায়কোবাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি মৌলিক কবি। মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শুদ্ধ বাংলায় কবিতা রচনা করেন। এই কৃতিত্বের গুণে এবং স্বীয় প্রতিভাবলে কবি কায়কোবাদ বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট তথা বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে চিরদিনই সমাদৃত হইবেন।"[১৮৩] ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মহরম শরীফ কাব্যের ভুয়সী প্রশাংসা করেছেন। তিনি বলেন মহাকবি কায়কোবাদ একাধারে মহাকাব্য ও গীতি কবিতার লেখক। এই সৌভাগ্য অনেক শ্রেষ্ঠ কবিদের অদৃষ্টে ঘটেনি।

"মহাকবি মাইকেলের মনে এক সময় মহরম বিষয়ে একটি মহাকাব্য লেখার কল্পনা জেগেছিল। তিনি লিখেছেন, 'মহাকাব্য লিখবার একটি বিষয় রহিয়া গেল, সে মুসলমানের 'মহরম'। জগতে এমন করুণ রসের প্রশ্রবণ মুসলমানদের মহরম তদপেক্ষা আরও অধিকতর করুণ রসের মহাসমুদ্র। যদি কেহ 'মহরম' লিখিতে পারেন, পরম উপাদেয় হইবে।' বাস্তবিক মোগল আমলে মহরমের বৃত্তান্ত নিয়ে কয়েকখানি কাব্য লেখা হয়, তাদের মধ্যে মুহম্মদ খানের 'মুক্তাল হোসেন' আর মুহম্মদ ইয়াকুবের 'জঙ্গনামা' উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ আমলেও অনেকে ও এর সম্বন্ধে গদ্য ও পদ্য বই লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে "বিষাদ-সিন্ধু"র লেখক মীর মশাররফ হোসেন সকলের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু মাইকেলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন আমাদের মহাকবি কায়কোবাদ সাহেব। তাঁহার 'মহরম শরীফ' কাব্য বটে। কিন্তু তিনি এতে ইতিহাসের মর্যাদা পুরাপুরি রক্ষা করেছেন। প্রচলিত পুস্তকগুলিতে অনেক অনৈতিহাসিক বিবরণ দেখা যায়; যেমন-আব্দুল জব্বারের বিধবা স্ত্রীর সহিত ইমাম হোসেনের বিবাহ, যুদ্ধক্ষেত্রে বিবি সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ, তাহার সদ্য বৈধব্য, আত্মহত্যা, ইমাম হাসানের স্ত্রী বিবি জায়েদার স্বামীকে বিষদান, মুহম্মদ হানিফার যুদ্ধ ইত্যাদি। এইরূপ বাজে বিষয়গুলি "মহরম শরীফে"র পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করে নাই। কায়কোবাদ সাহেবের কাব্যে সত্য নির্বাচন উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।"[১৮৪] অতঃপর কাজী আব্দুল মান্নান কায়কোবাদের মহরম শরীফ সম্পর্কে বলেছেন: "কায়কোবাদ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে দুই কালকে অবলোকন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য প্রেরণাই মুলত তাঁর কবি কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। নগর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সমাজে নানাপ্রকার চিন্তা ও চেতনার যে বিবর্তন ঘটেছিল কবি তার থেকে বিচ্ছিন্ন

---

১৮৩. আব্দূল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫২৭

১৮৪ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৮

হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি বিশ শতকেও উনিশ শতকের সাধনা করেছেন এবং তারই নিদর্শন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য'। 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী নির্মাণ করতে গিয়ে মশাররফ হোসেন ঐতিহাসিক শর্ত থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। কায়কোবাদ সেটাকে মনে করেছেন ইসলামের হৃদয় পিঞ্জরে তীব্র শেলাঘাত। বিবি জয়নবের রূপ বিভ্রম, জায়েদার স্বপত্নী-বিদ্বেষ, সখিনা ও কাসেমের প্রেম প্রভৃতি কবিকল্পিত ঘটনার যে চিত্র পুথিসাহিত্য থেকে 'বিষাদ সিন্ধু' এবং 'বিষাদ সিন্ধু' থেকে পরবর্তী বহু কাব্যে রূপ লাভ করেছিল সেসবকে তিনি ঘোর অনাচার জ্ঞান করেছেন।"[১৮৫] অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এই কাব্য সম্পর্কে লিখেছেন, "১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "মহরম শরিফ" বা "আত্ম বিসর্জন" কবির ঐতিহাসিক সত্য নিষ্ঠার পরিচায়ক। মহরম বিষয়ে যাবতীয় বাংলা রচনার অনৈতিহাসিকতার নিন্দা করে কবি এই প্রামান্য ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছেন। ... নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ প্রসঙ্গ মন্তব্যকালে তার উক্তি লক্ষণীয়: সত্যের অপলাপ করিবার শক্তিতো আর কবির নাই।[১৮৬]

কায়কোবাদ "মহরম শরীফ" বা "আত্মবিসর্জন" কাব্যে অনৈতিহাসিক কোন তথ্য সন্নিবেশিত করেননি। তিনি ঐতিহাসিক তথ্যাদির আলোকে এই কাব্যটি সাজিয়েছেন। যদিও তার পূর্ববর্তীগণ এই নিয়ে অলিক কল্পনার জগতে হাবুডুবু খেয়েছেন। তিনি স্বয়ং বলেন, " আমি মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য লিখিতে যাইয়া সম্পুর্ণরূপেই ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছি। কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কল্পনার সাহায্য নিয়া কোনরূপ অলিক ঘটনার অবতারণ করি নাই। হযরতদের সম্বন্ধে কোন কথা লিখা আমি মহাপাপ বলিয়া মনে করি, তাই ভয়ে ভয়ে নিতান্ত সতর্কতা অবলম্বনে ও অতি সন্তর্পণে কেবল প্রকৃত ঘটনাবলী কবি তুলিকায় যথাযথভাবে অঙ্কিত করিয়া সঙ্গতি রক্ষার জন্য স্থানে স্থানে এক আধটুক শেড দিয়া চিত্রের প্রকৃত বর্ণ ফুটাইয়া দিয়াছে। মুল ঘটনার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি নাই।"[১৮৭]

মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্যের কাহিনী

---

১৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৪

১৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৫

১৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪২

ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রা.) যখন খিলাফতের মসনদে আরোহন করেন তখন বনু উমাইয়া বংশীয় মাবিয়া (মুআবিয়া) বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকার করেন। এক পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অতঃপর জুমাতুল জাদলে সালিশ বৈঠক হলেও তা ভেস্তে যায়। আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর লোকজন তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র হাসান (রা.) কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় মাবিয়া (রা.) হাসান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ইমাম হাসান (রা.) যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন। ফলে যুদ্ধের আগ্রহ তার ছিল না। একপর্যায়ে তিনি একটি শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে মনস্থ করেন। শর্ত হচ্ছে মাবিয়ার পর হোসেন (রা.) কে খিলাফত প্রদান। অতঃপর এ শর্তে সন্ধি স্থাপিত হলো। কিন্তু মাবিয়ার সহযোগী মুঘিরা হাসান (রা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। এতে হাসান (রা.) ক্ষুদ্ধ হন এবং নালিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে মাবিয়া সকাশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে মাবিয়া ষড়যন্ত্র করে বিষ প্রয়োগে তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। বিষয়টি হাসান (রা.) জানতে পেরে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর মাবিয়া পুত্র এজিদ দৃশ্যপটে আসেন। সে মদিনায় গভর্নর মেরোয়ানকে (মারওয়ান ইব্ন হাকাম) হাসান বধের নির্দেশ দেয়। মেরোয়ান আছানিয়া নাম্মী এক পাপীষ্ঠা নারীর সহায়তায় বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করে। সন্ধি অনুযায়ী মাবিয়ার পর ইমাম হোসেন (রা.) খিলাফতের মসনদে আরোহন করার কথা কিন্তু মাবিয়া মৃত্যু শয্যায় কতিপয় অনুচরের পরামর্শে ইয়াজিদকে ভাবী খলিফা মনোনীত করে মৃত্যুবরণ করেন। লোকজন ইমাম হোসেনের নিকট বাইয়াত হতে আগ্রহী হয়ে উঠে। তিনি মদিনা ত্যাগ করে মক্কায় গমন করেন। সেখানে কুফা থেকে হাজার হাজার পত্র আসতে থাকে। এক পর্যায়ে তিনি তার প্রতিনিধি মোশ্লেমকে কুফায় পাঠান। মোশ্লেম কুফায় ইমাম হোসেনের পক্ষের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে কুফার অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। সব জেনে ইমাম হোসেন কুফায় যাত্রা করেন। এজিদ সব জানতে পেয়ে কুফার গভর্ণর বাসীর (নোমান ইবনে বশীর) কে অপসারণ করে ওবেদুল্লাহ (ওবাইদুল্লাহ বিন রিয়াদ) কে গভর্নর করে পাঠায়। ওবেদুল্লাহ মোশ্লেম ও তার সন্তানদের হত্যা করে। কুফার উপকণ্ঠে ওবেদুল্লাহর সেনাপতি হুরের সাথে ইমাম হোসেনের সাক্ষাত হয়। হুর তাকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে বললে তিনি ভুল পথে কারবালায় উপনিত হন। স্থানটির নাম জানতে পেরে তার নানা রাসূল (স.)-এর ভবিষ্যতবাণী তার মনে পরে। অর্থাৎ কারবালায় তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। ওবেদুল্লাহ একুশ হাজার সৈন্য দিয়ে ওমরকে পাঠায়। ওমর

ফুরাতের পানি নেয়া বন্ধ করে দেয়। পানি পিপাসায় বাচ্চারা ছটফট করতে থাকে। ইমাম হোসেন শিশু পুত্র আলী আজগরকে কোলে নিয়ে বের হন পানির জন্য। পাপিষ্ঠ এজিদ বাহিনী আলী আজগরকে তীর নিক্ষেপে হত্যা করে। ইমাম হোসেন ওমরকে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে- (১) আমাকে মক্কায় ফিরে যেতে দাও (২) কাফির সীমান্তে নিয়ে যাও, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই (৩) এজিদের নিকট নিয়ে যাও, তার সাথেই বোঝাপড়া করি। কিন্তু ওবেদুল্লাহ একটি শর্তও গ্রহণ করেননি। ফলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। একুশ হাজারের মোকাবেলায় বাহাত্তর জন মর্দে মুজাহিদ। অতঃপর ইমাম পরিবারের একে একে সকল মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন, একমাত্র জয়নুল আবেদীন ছাড়া। অতপর ইমাম হোসেন স্বয়ং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। এক পর্যায়ে শেমরের আঘাতে তিনি আহত হন এবং শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন। পরিশেষে বলা হয়েছে, ইমাম পরিবারকে দামেস্‌কে পাঠানো হয়। সেখানে ইমাম পরিবারের প্রতি জনসাধারণের সহমর্মিতা ও ভালোবাসা লক্ষ্য করে এজিদ তাঁদেরকে মদিনায় পাঠিয়ে দেয়। ইমাম পরিবারের মস্তকসমূহ জান্নাতুল বাকীতে ফাতেমা (রা.)-এর কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।

৪- শ্মশান-ভস্ম

মহরম শরীফের পরবর্তী কাহিনীকাব্য হচ্ছে শ্মশান-ভস্ম কাব্য। এটির প্রকাশকাল ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২০ জুলাই ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ। এটি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। ত্রিভূজ প্রেমের কাহিনী নিয়ে লেখা বিয়োগান্তক করুণ রসাত্মক কাব্য এটি। কবির চারপাশের সমাজের ঘটে যাওয়া কাহিনী নিয়েই এ কাব্য রচিত। এটি বাইশটি সর্গে লেখা। এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রকাশিকা কবিপত্নী তাহের উন্নেসা খাতুন। তিনি লিখেছেন:

> "'শ্মশান-ভস্ম' কবির এই শেষ জীবনের বড় আদরের কাব্য। এই কাব্যখানা লিখিবার সময় তাঁহার চক্ষের জল তিনি রোধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। ... কবি এই কাব্যখানা উপন্যাসের ভাবে লিখিয়াছেন। ঔপন্যাসিকগণ গদ্যে উপন্যাস লিখিয়া যে রস ফুটাইয়া থাকেন, গীতি কবিতায় উপন্যাস লিখিয়া সেই রস ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

... এ আমাদের আশে-পাশের ও সামাজিক নর-নারীর চরিত্র লইয়া কাব্যাকারে উপন্যাস। কবি উপন্যাসের চরিত্রগুলি উপন্যাসের ভাবেই কাব্যে ফুটাইয়াছেন। ... ঔপন্যাসিক যেমন গদ্যে আমাদের সমাজের নর-নারীর চরিত্রগুলি আঁকিয়া থাকেন, এই কবিও তেমনি এই নূতন ধরণের কাব্যে তাঁহার আশেপাশের ও সামাজিক নর-নারীর, এমনকি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের চরিত্রগুলিও উপন্যাসের মতই আঁকিয়াছেন, ... বঙ্গ ভাষায় শ্মশান-ভস্মের মত এরূপ কাব্য আর দ্বিতীয় নেই।"[১৮৮]

প্রকাশিকার কথায় সহজেই অনুমেয় যে, কাব্যটি কবির অতি আদরের। এটি তিনি কাব্যোপন্যাস হিসেবে রচনা করেছেন। এ কাব্যের কাহিনী কবির আশে-পাশের সমাজ থেকে নেওয়া এমনকি তাঁর বন্ধু মহলের কারও কারও জীবন এতে জড়িয়ে আছে। প্রেমই এ কাব্যের মূল; কিন্তু তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রেমের করুণ পরিণতির সৃষ্টি করেছে। প্রতারণা স্বর্গীয় প্রেমকে বিধ্বস্ত করেছে।

শশ্মান ভস্ম কাব্যের কাহিনী

এ কাব্যের প্রধান চরিত্র হেমলতা দেবী। সে ব্রজেন্দ্র কিশোর ব্রহ্মচারী ও বিজনবাসিনী দেবীর কন্যা। প্রতিবেশী নলিনী মোহন ও হেমলতা একসাথে বড় হয়েছে। নলিনী মোহন হেমলতাকে ভালোবাসে কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি। অন্যদিকে হেমলতা নলিনী মোহনকে বন্ধু হিসেবে দেখেছে, প্রেমিক হিসেবে কোন দিন কল্পনাও করেনি। নলিনী মোহনের বন্ধু ব্যারিস্টার অবনীকান্তের পুত্র হিমাংশু রঞ্জন মুখার্জী কলেজে হেমলাতাকে দেখে অভিভুত হয়ে যায় এবং বন্ধু নলিনীমোহনকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ জানায়। নলিনীমোহন বন্ধুর অনুরোধ ফেলতে পারেনি। সে তাকে হেমলাতার বাড়ীতে নিয়ে যায়। হেমলতা ও তার পরিবারের সাথে হিমাংশু পরিচিত হয়। প্রথম পরিচয়েই হেমলতা হিমাংশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর হিমাংশু নলিনীকে আরেকটি অনুরোধ জানায়, সে যেন হিমাংশুর বিয়ের প্রস্তাব হেমলতার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেয়। নলিনীমোহন যথারীতি হেমলতার মাকে বিষয়টি জানায়। তারা তাতে সম্মতি দেয়। কেননা ইতোমধ্যে তারাও হিমাংশুর প্রতি আকষ্ট হয়ে

১৮৮. কায়কোবাদ, *শ্মশান-ভস্মের ভূমিকা* , ২য় সংস্করণ (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)

গেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে হিমাংশুর মামা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে। তবে এখনই বিয়ে হবে না। এখন আশির্বাদ হবে, হিমাংশুর মা শ্রীঘ্রই আশির্বাদ করতে আসবে। হিমাংশু এম.এ শেষে সিভিল সার্ভিস পড়তে বিলাত যাবে। বিলাত থেকে ফেরার পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু হেমলতার বাবা-মা তাদের কন্যার ভবিষ্যত চিন্তা করে হেমলতা ও হিমাংশুর বিয়ে গোপনে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিষয়টি গোপন রাখা হবে, জানবে শুধু হেমলতা, হিমাংশু, নলিনী ও হেমলতার বাবা-মা। হিমাংশুর মার আশির্বাদের পরেই তারা বিবাহ সম্পন্ন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে নলিনী মোহন তার সুপ্ত ভালোবাসার কথা চিঠির মাধ্যমে হেমলতাকে জানায়। হেমলতা এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না। সে হিমাংশুর সাথে পরামর্শ করে নলিনীর সাথে তার মেসোত বোন কুঞ্জলিনীর বিয়ে ঠিক করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু নলিনী কোনো ভাবেই রাজী হয় না বরং সে তার সমস্ত জমিদারী হেমলতার নামে লিখে দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে হিমাংশুর মা হেমলতাকে আশির্বাদ করে যায় এবং পূর্ব পরিকল্পনামত হিমাংশু- হেমের বিয়ে হয়ে যায়। অতঃপর হিমাংশু ও হেমলতা নলিনী ও কুঞ্জলিনীর বিয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। কেননা নলিনী স্পষ্ট জানিয়ে দেয় সে তাঁর আরাধ্য প্রেয়সীর ধ্যানে সারাজীবন কাটিয়ে দিবে। অতপর হিমাংশু বিলাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। প্রথম ছয়মাস সে ত্রিশটি পত্র লিখে। অতঃপর তা কমে আসে, এক পর্যায়ে কোনো চিঠি-পত্র আর আসে না। এভাবে তিন বছর কেটে যায়। বিলাতে হিমাংশু অমিয়া নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং তাকেই বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে হিমাংশুর কোনো চিঠি পত্র না পেয়ে হেমলতা রোগাক্রন্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে নলিনীমোহন হিমাংশু-হেমলতার বিয়ের পর কাশী যাত্রা করে। সেখানে সন্ন্যাসী গুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী গুরুদেব হেমের ভালোবাসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি বলে তাকে ফিরিয়ে দেয়। অতঃপর সে দেশে ফিরে এসে হেমলতাকে শয্যাশায়ী দেখে খুবই ব্যথিত হয় এবং তার সেবা-শ্রশ্রুষা করতে থাকে। হেমলতা নলিনীকে অনুরোধ করে তাকে বিলাত নিয়ে যেতে, যাতে সে হিমাংশুর শশ্মান দেখতে পারে। তার ধারনা হিমাংশু বেঁচে নেই। নলিনী জানতে পারে হিমাংশু কলকাতায় আসছে। নলিনী হেমলতাকে নিয়ে স্টেশনে যায়। সেখানে অমিয়া সহ হিমাংশুর সাথে দেখা হয়। হিমাংশু হেমের কথা এড়িয়ে যায়। সে শুধু অমিয়ার কথা বলে। হেমলতাসহ সবাই

হিমাংশুর বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারে। হেমলতা আরো মুষড়ে পড়ে। তার বাবা-মাও তাদের ভুল বুঝতে পারে। এমতাবস্থায় হেম জানতে পারে হিমাংশু অমিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছে। হেমলতা নলিনীকে অনুরোধ করে হেমের মৃত্যুর পর তার শশ্মান থেকে ভস্ম উঠিয়ে ও হিমাংশুর দেওয়া আংটি, হার, বালা একটি থালায় করে হিমাংশুর বাসর ঘরে যেন পৌঁছে দেয়া হয়। হিমাংশুর বিয়ের রাতেই হেমলতা মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তার কথামতো নলিনী হেমলতার শশ্মান-ভস্ম ও অলঙ্কারাদি হিমাংশুর বাসর ঘরে পৌঁছে দেয়। এসব দেখে হিমাংশু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। অতপর তাকে বিলাপরত অবস্থায় হেমলতার সমাধির পাশে দেখতে পাওয়া যায়। অতঃপর সেখানেই একদিন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

৫- প্রেমের রাণী

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কায়কোবাদ কর্তৃক লিখিত হয় 'প্রেমের রাণী' কাহিনীকাব্য। এটি প্রথম প্রকাশের মুখ দেখে ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। কাব্যটি চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডের নিচে একটি করে শিরোনাম দেয়া আছে। প্রথম খণ্ড অধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য, দ্বিতীয় খণ্ড জগদীশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তৃতীয় খণ্ড পাপ-পূণ্যের সংঘর্ষ, ধর্মের সহিত অধর্মের যুদ্ধ এবং চতুর্থ খণ্ড ধর্মের জয় অধর্মের পতন।

কাব্যগ্রন্থের শুরুতে যথারীতি কবির ভূমিকা রয়েছে। এতে কবি লিখেছেন, "রুগ্ন অবস্থায় বহু কষ্ট করিয়া এই কাব্যখানা শেষ করিলাম। এখানাও মহাকাব্য; এ যুগে মহাকাব্যের আদর নাই।[১৮৯]" কবির এ কথা দ্বারা বুঝা যায় এটা কবির শেষ বয়সের রচনা। কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসার একে কবির মৃত্যুর তিন বছর আগের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯০]

৬- প্রেম-পারিজাত

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ প্রেম-পারিজাত। এর অপর নাম হেমলতা ও বীণাপানি বা যোবেদা মহল কাব্য। এটি একটি কাহিনীকাব্য। কবির মৃত্যুর পর কাব্যটি ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট চারটি খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ডে একত্রিশটি, দ্বিতীয় খণ্ডে আটটি, তৃতীয় খণ্ডে আটটি এবং চতুর্থ খণ্ডে দুইটি সর্গ আছে। এটি একটি সত্য কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাব্যটির মূল বিষয়বস্তু প্রেম। কিন্তু বারবার শ্বাশত প্রেম ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার জীবনে নেমে এসেছে করুণ পরিণতি।

---

১৮৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

১৯০. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

এ কাব্যের ভূমিকাংশে কবি লিখেছেন:

> "এই কাব্যের ঘটনাগুলো প্রায় সত্য, তবে একটু আধটু রং ফলিয়ে দিয়েছি, দু'একটি নায়ক নায়িকার নাম বদলিয়ে দিয়েছি। এই কাব্যের নায়ক আমার বন্ধু। তার কোন কথা আমার নিকট গোপন নেই, তার জীবনের সব কথাই সে আমাকে বলেছিল, যখন আমি বাজিতপুর ছিলাম সে তখন ঢাকা জিলার নবাব ফ্যামিলির সুপারিনটেনডেন্ট ছিল। তার বাড়ি শহরের নিকটে গ্রামের নাম লিখব না। রাখালের শেষ জীবনের কতক অংশ আমার কাব্যের উপযোগী করে একটু বদলিয়ে দিয়েছি। সেজন্য সহৃদয় পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।"[১৯১]

প্রেম পারিজাত কাব্যের কাহিনী

রমানাথের পুত্র শিশিরকান্ত ঘোষাল। শিশির কান্ত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। এতে রাগে-দুঃখে রমানাথ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে। শিশির কান্তের একমাত্র কন্যা ইন্দুবালা দেবী। ইন্দুবালা ও তাঁর গৃহশিক্ষক মোহিদুর রহমানের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠে। শিশির কান্তের মা বিয়য়টি জানতে পেরে শঙ্কিত হয়ে তার স্বামীর শরণাপন্ন হয়। রমানাথ সন্ন্যাসীর বেশে ইন্দুবালা ও মোহিদুরকে ডেকে নিয়ে ভবিষ্যতবাণী করে বলে যে, যদি তারা পরস্পর বিয়ে করে তাহলে তাদের জীবনে অমঙ্গল ছেয়ে যাবে–মোহিদুর অকালে মারা যাবে আর ইন্দুবালা বিধবা হবে। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যতবাণী শুনে মোহিদুর-ইন্দুবালা তাদের পবিত্র প্রেম অন্তরে লালন করে নিজেদের ভাইবোন সম্পর্কে উন্নীত করে। সেই সাথে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইন্দুবালার ঠাকুরমা তাকে বিয়ে দিতে জোড় তৎপরতা চালালে মোহিদুর তাকে রাজি করায়। ইন্দুবালা মোহিদুরের নির্দেশে নৈহাটির জমিদার বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়। অন্যদিকে ইন্দুবালার অনুরোধে মোহিদুর বালিগঞ্জে নলিনাক্ষ রায়ের কন্যা বীণাপানি দেবীর সাথে বিয়েতে রাজী হয়। রাখালরাজের পিতা প্রচুর যৌতুক দাবী করে। কিন্তু রাখালরাজ ইন্দুবালাকে দেখতে এসে পিতার দাবীর টাকা নিজেই শোধ করে বিয়ে করতে চায়। এক পর্যায়ে ইন্দুবালার ঠাকুরমা সন্ন্যাসীরূপী রমানাথের পৌরহিত্যে ইন্দু-রাখালের বিয়ে দিয়ে দেয়। এ ঘটনা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মোহিদুরের সাথে বীণাপানির বিয়ে হয়ে যায়। বীণাপানির বাবা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী হওয়ায় কোন সমস্যা হয়নি। মোহিদুরের পিতা মুসলমান রীতি অনুযায়ী বিয়েদেন। অতঃপর পুত্রবধুর নাম রাখেন জোবেদা। অন্যদিকে রাখালরাজ ইন্দুকে বিয়ের কথা তার পিতাকে জানালে তিনি

---

১৯১. কায়কোবাদ, *প্রেম-পারিজাত*, ভূমিকাংশ (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)

ক্ষোভে ফেটে পরেন। রাখালরাজকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করেন। এরই মধ্যে ইন্দুর ঠাকুরমা মারা যান এবং সন্ন্যাসীরূপী ঠাকুর দাদা দেশত্যাগী। ফলে তার বিয়ের স্বাক্ষী কেউ রইল না। এক পর্যায়ে ইন্দুকে তার বাবা হাওরার অধিবাসি সুরেন্দ্রের সাথে বিয়ে দিয়েদেয়। ইন্দু-রাখাল বহু চেষ্টা করেও তা ফেরাতে পারেনি। বিয়ের রাতে সুরেন্দ্রকে সব কিছু খুলে বললে সুরেন্দ্র ইন্দুকে নাগপুরে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে রাখাল ইন্দুর জন্য পূর্বেই শিক্ষকতার চাকুরী ঠিক করে রেখেছিল। ইন্দুর নাগপুরে আসার দুই সপ্তাহ পর সুরেন্দ্র মৃত্যুবরণ করেন। এতে ইন্দু বিমূর্ষ হয়ে পরে। সে মনে করে সুরেন্দ্র যেহেতু তার স্বামী তাই সে বিধবা। সে আর রাখালকে পাবে না। এ চিন্তায় সে অসুস্থ হয়ে পরে। অন্যদিকে রাখালও পাগলের বেশে ইন্দুকে খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে হিমালয়ের নিকট বদরিকায় গমন করেন। অন্যদিকে ইন্দুবালাও সন্ন্যাসিনী বেশে রাখালের খোঁজে বের হয়। আগ্রার সন্নিকট এক সন্ন্যাসীর নিকট তার খোঁজ পায়। সন্ন্যাসিনী তাকে অপেক্ষা করতে বলেন। বদরিকায় সন্ন্যাসীরূপী রমানাথ রাখালকে নিজ পরিচয় দিয়ে সবকিছু খুলে বলে। সে জানায় হিন্দু ধর্মমতে রাখালের সাথে ইন্দুর যে বিয়ে হয়েছে তাই সঠিক। সুরেন্দ্রের সাথে বিয়ে সিদ্ধ হয়নি। অতঃপর রাখালকে সে নির্দেশ দেয় ইন্দুবালাকে বৃন্দাবনে এনে গৃহ নির্মাণ করে ভজনে-পূজনে জীবন কাটাতে। এদিকে ইন্দুবালা বৃন্দাবনে যুমনার তীরে গৃহ নির্মাণ করে রাখালের অপেক্ষা করতে থাকে। অতঃপর এক সময় দুজনের মিলন ঘটে। তবে দৈহিক মিলন হয় না। বৃন্দাবন আশ্রমে রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করে দীর্ঘ দুই বছর পর্যন্ত ধ্যান ও পূজায় কাটিয়ে দেয়। অতঃপর রমানাথ এসে ইন্দুকে নিজ পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বলে। সব শুনে ইন্দু রাখাল একে অপরকে রাধা-কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করে এবং পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। পরদিন এ অবস্থায় তাদের মৃত পাওয়া যায়। কিছুতেই তাদের পৃথক করা গেল না। এভাবেই তাদের সৎকার করা হয়। মোহিদুর ও বীণাপানি এসব জানতে পেরে বৃন্দাবনে আসে। বীণাপানি তাদের চিতার উপরে একটি স্তম্ভ তৈরি করে এবং তাতে স্বর্ণাক্ষরে 'প্রেমের রাণী' লিখে দেয়। সেখানে একটি সমাধি মন্দিরও স্থাপন করে। মোহিদুর সেখানেই বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একটি গৃহ নির্মাণ করে যার নাম 'বীণাপানি জোবেদা মহল'। সে ধর্ম ও সমাজ সেবায় ব্রতি হয় এবং ইন্দুর সমাধিস্থলে পরে থাকে। এক পর্যায়ে ইন্দুর শোকেই সে মারা যায়। বীণাপানি স্বামীর শোকে তার সমাধিতে কান্না করতে করতে ঘুমিয়ে যায়। ঘুমের মধ্যে ইন্দু ও মোহিদুরকে স্বপ্ন দেখে। মোহিদুর তাকে কুরআন পাঠ করতে বলে। জাগ্রত হয়ে বীণাপানি কুরআন পাঠ করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদের চম্পু ও জীবনীকাব্য

গদ্য ও পদ্য মিশ্রিম এক শ্রেনীর কবিতাকে চম্পুকাব্য বলা হয়।[১৯২]এসব কাব্যে কতটুকু গদ্য কতটুকু পদ্য থাকবে এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানা যায় না। এ জাতীয় কাব্যে গদ্যের বলষ্ঠিতা ও ওজস্বিতা এবং কাব্যের মাধুর্য কোনটাই প্রকাশ পায় না।[১৯৩] কায়কোবাদ লিখিত চম্পু কাব্যের নাম মন্দাকিনী-ধারা। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া একটি জীবনী কাব্যও রয়েছে– গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ। এটি ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় । এটি কবির সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা।

১. মন্দাকিনী-ধারা

১৩৭৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ মন্দাকিনী-ধারা। এ কাব্যে মোট চল্লিশটি কবিতা ও চারটি গদ্য রচনা স্থান করে নিয়েছে। কবিতার বিষয়সমূহে ভিন্নতা রয়েছে। কবিতাগুলো গীতি কবিতার পর্যায়ে পড়ে। কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা অনুভব ও অনুভূতিই এখানে পরিদৃষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থটিতে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো: ১. জগদীশ্বর, ২. নিশি হল ভোর, ৩. ঊষাদেবী, ৩. মায়ের আহ্বান, ৪. বিদ্যা, ৫. কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ভগ্নির উপদেশ, ৬. আজ বারুণী-মেলা, ৭. মিথ্যা কথা বলা, ৮. পরের অনিষ্ট, ৯. পর-নিন্দা, ১০. পরধনে লোভ, ১১. কানা খোঁড়া, ১২. নিচের দোষ পরের উপর দেওয়া, ১৩. পরস্ত্রীকাতরতা, ১৪. আপনাকে বুদ্ধিমান ভাবা, ১৫. আপনাকে বড় ভাবা, ১৬. ছোট-বড়, ১৭. শিশুর মুখের হাসি, ১৮. নম্র ও শিষ্ট ব্যবহার, ১৯. গুরুজনের সেবা, ২০. অত্যাচারের প্রতিশোধ, ২২. গৃহশত্রু, ২৩. আজ আমাদের ছুটি, ২৪. তোমরা সকলে ভাই ভাই, ২৫. ঈদ, ২৬. আমার পল্লীখানি, ২৭. আদর্শ বালক, ২৮. বিদ্বান, ২৯. পরিশ্রম, ৩০. যত্ন, ৩১. বর্ষা, ৩২. মাতৃআশীর্বাদ, ৩৩. পিতৃআজ্ঞা, ৩৪. পল্লী-শোভা, ৩৫. কর্মফল, ৩৬. উপদেশ-রত্নাবলী, ৩৭. পর-উপকার, ৩৮. হিংসা ও অহঙ্কার, ৩৯. প্রেমের সুরা, ৪০. ইকবাল স্মরণে: অশ্রু-উপহার।

মন্দাকিনী ধারা চম্পু কাব্যে কায়কোবাদ চারটি গদ্য রচনা সংযোজন করেছেন। এগুলো হচ্ছে (১) সংক্ষিপ্ত রামায়ন (২) দানবীর মহাত্মা আলী মিয়া ও স্যার নবাব আব্দুল গণি বাহাদুর ও তার বংশধরগণ (৩) মহাত্মা হাজী মোহাম্মদ মোহসীন হোসেন (৪) মোহাম্মদ হাদী চৌধুরী ও তার পুত্র গরীব হোসেন চৌধুরীর পাপের প্রায়োশ্চিত্ত।

---

১৯২. বদিউর রহমান, *সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

তার গদ্য রচনা সম্পর্কে ফাতেমা কাওসার বলেন:

"এই গদ্য রচনা থেকে আমরা কায়কোবাদের গদ্য রচনার দক্ষতা সম্পর্কে প্রমাণ পাই। তিনি অত্যান্ত সহজ, সাবলিল ভঙ্গিতে এগুলো রচনা করেছেন। তার গদ্য অত্যান্ত সহজ, সরল, গতিময় ও প্রাঞ্জল। আবেগময় অথচ যৌক্তিক ভাষাতে তিনি গদ্য রচনায় যে পারদর্শী ছিলেন তার প্রমাণ সংক্ষিপ্ত রামায়ন রচনাটি। তিনি যদি লেখুনির মাধ্যমে কাব্য না করে গদ্যও করতেন তাতেও যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতেন তার এই লেখাগুলো সে কথাই প্রমাণ করে।"[১৯৪]

২. গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ

কায়কোবাদের সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ'। এটি কবির নব্বই ঊর্দ্ধ বয়সের রচনা। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। কবি বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর ভক্ত ছিলেন। কবি বড়পীর (রহ.)-এর সুযোগ্য বংশধর হযরত সাইয়েদ এরশাদ আলী সাহেবের মুরিদ ছিলেন। মুর্শিদ কিবলার নির্দেশে ও বড়পীর (রহ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় এটি রচনা করেন। এতে কবি অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সঙ্গে বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন।

কাব্যটি প্রসঙ্গে কবি-দুহিতা জাহানারা বেগম প্রসঙ্গ-কথা অংশে লিখেছেন:

"গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ মহাকবি কায়কোবাদের প্রকাশিত সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ এবং নব্বই ঊর্দ্ধ বয়সের রচনা। ইহার বহু বৎসর পূর্বে কবির লেখনী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পীর কলিকাতা তালতলাস্থ খানকা শরীফের সৈয়দানা হযরত ইরশাদ আলী কাদেরী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্বার লেখনী ধারণ করিতে হয়। ... বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা হেতু গ্রন্থখানির রচনা বিঘ্নিত হইতে থাকে এবং ইহার রচনাকাল দীর্ঘ হইলেও সম্যকরূপে ইহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। সুস্থবোধ করিলে তিনি লেখায় মনোনিবেশ করিতেন এবং গওছ পাকের জীবনী রচনায় সত্যনিষ্ঠ হইয়া বহু তথ্য সংযোজন করিতে কবিকে বিবিধ গ্রন্থ পাঠে উদ্যোগী হইতে হয়। ইহাতেও তাঁহার বহু সময় ব্যয় হয়। ক্ষীণ দৃষ্টি শক্তি, অসুস্থ দেহ ও নিস্তেজ প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে বাঁধার সৃষ্টি করিয়া চলে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর এই কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়।"[১৯৫] উপর্যুক্ত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তিনি আরও চার পাঁচটি পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন যা অপ্রকাশিত অবস্থায় হারিয়ে গেছে।[১৯৬]

---

১৯৪. ফাতেমা কাওসার, *কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪১-৩৪২

১৯৫. কায়কোবাদ, *গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জের ভূমিকা* (ঢাকা: আবুল হেনা সাদউদ্দীন, ১৯৭৯)

১৯৬. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

কায়কোবাদের কবিতার বিষয়বস্তু

প্রথম পরিচ্ছেদঃ	বিষয়বস্তুর ভূমিকা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ	আল্লাহ প্রেম বা আধ্যাত্মিক কবিতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ	নারী-প্রেম ও বিরহ
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ	প্রকৃতির বর্ণনা
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ	দেশপ্রেম ও জাতীয় জাগরণ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ	নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা
সপ্তম পরিচ্ছেদঃ	মানব প্রেম
অষ্টম পরিচ্ছেদঃ	দুনিয়া বিমুখতা
নবম পরিচ্ছেদঃ	শোক গাঁথা
দশম পরিচ্ছেদঃ	শ্রেণিহীন কবিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়বস্তুর ভূমিকা

কায়কোবাদ কাব্যে প্রাত্যহিক জীবনের নানা বিষয় কবির ব্যকুল হৃদয়ের মাধুরীমায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্যে মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ, নারীর প্রেম ও সৌন্দর্য, বিরহ তথা প্রিয়া হারানোর বেদনায় বিক্ষত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ও অসহনীয় যন্ত্রণা লক্ষণীয়। গ্রামবাংলার নয়নাভিরাম নৈসর্গিক চির সুন্দর সবুজ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে কবি অবাক, বিস্মিত, বিমোহিত ও বিমুগ্ধ। অসাধারণ প্রকৃতির সৌন্দর্য আর তাঁর হারানো প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য যেন একাকার। সবুজাভ প্রকৃতির সৌন্দর্যের অভ্যন্তরে কবির প্রাণ-প্রেয়সীর যেন অবস্থান। কবি জাতীয় চেতনায় উজ্জীবিত। জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য তাঁকে গৌরবান্বিত করেছে। আর বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থা তাকে ব্যথিত করেছে। তিনি খুঁজেছেন জাতির পতন ঠেকানোর পথ এবং অতীত গৌরবের রাজমুকুট ফিরে পাওয়ার কৌশল। দেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা, আর্ত-মানবতার দুঃখ-দুর্দশা এবং এর প্রতি মমত্ববোধ, মানবতার প্রতি ভালোবাসা ইত্যাকার বহু বিষয় তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে। প্রেমের পাশাপাশি এসেছে প্রকৃতির সৌন্দযের্র বর্ণনা। জন্মভূমি স্বদেশের ভাবনা কবি হৃদয়ের লালিমা দিয়ে প্রতিভাত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আগলা পূর্বপাড়া থেকে গোটা ভারতবর্ষ তার স্বদেশ। স্বদেশের ভাবনায় কবি বারবার আবেগাপ্লুত হয়েছেন। বিচিত্র বিষয় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ প্রেম বা আধ্যাত্মিক কবিতা

কায়কোবাদ তাঁর কাব্যসমূহে প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। এ প্রেম যেমন তাঁর প্রিয়ার প্রতি তেমনি স্রষ্টার প্রতি, দেশের প্রতি - এমন কি বিশ্বমানবতার প্রতি। অপরিণত বয়সেও কবি তাঁর মহান স্রষ্টাকে পাশ কেটে যাননি। স্রষ্টার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ অবিচল। কবি মহান সৃষ্টিকর্তা - যিনি সৃজন করেছেন চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত্রি ও সমগ্র বিশ্ব জাহান তাঁরই প্রশংসা করেছেন, তাঁরই মহিমা গাওয়ার জন্য পাঠকদের আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বলেন:

গাও রে আনন্দে সবে, তারি যশ গুণগান
নিখিল ভুবন যেবা করিয়াছে নিরমাণ।
দিবানিশি, রবি, শশী, গগনে আসনে বসি
যাহার আদেশে কর করিতেছে পরদান।
বিহঙ্গম বনে বনে প্রকৃতি সঙ্গিনী সনে
গাইছে মহিমা যার ধরিয়া পঞ্চম তান।[১৯৭]

কবি সৃষ্টিকর্তার পরিচয় খুঁজতে পাঠককে প্রশ্ন করছেন এভাবে:

বল গো মেদিনি! কেবা গড়িল তোমায়,
মনুজ রতনে তব কে সাজাল কায়?
কমনীয় কণ্ঠে চারু তরঙ্গিনী হার,
বল গো অবনি, কেবা দিয়াছে তোমায়?[১৯৮]

অতঃপর কবি মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের দোষ স্বীকার করে লিখেছেন এবং তাঁরই পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করে পাপ থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছেন। কবি বলেন:

ভুলি নাথ! নাম তব, করিয়াছি পাপ কত,
তোমার অপ্রিয় কাজে সতত ছিলাম রত।
তুমি নাথ দয়াময়, পাপীজন মুক্তিদাতা,

১৯৭. কায়কোবাদ, সম্পা. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *কুসুম কানন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.)*, পৃ. ৫০৩
১৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

তুমি নাথ সর্বময়, জীবের জীবনধাতা,
একমনে তব নাম,
লইয়া হে গুণদাম,
মরি মরি হায় হায়! কাঁদিতেছি অবিরত।
তব পদ বিনে আর নাহি পাতকীর গতি,
ক্ষমা কর দীননাথ আমি অতি মূঢ়মতি,
এ-ভব অর্ণবে পড়ি
তোমাকে স্মরণ করি,
রক্ষা কর দীনবন্ধু, হল প্রাণ ওষ্ঠাগত।[১৯৯]

কায়কোবাদ পরকালে বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, একদিন সকলের এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হবে। জীবন সংসারের পতন অবশ্যম্ভাবী। কবি বলেন:

মিছে ভাই বন্ধু জায়া, মিছে ধন মিছে কায়া,
ভাবিয়া দেখ হে সবে আপন আপন।
মিছে এ ভবের হাট, মিছে সব ঠাটবাট,
অবশেষে কালগ্রাসে হইবে পতন।
মরি! এ মাটির কায় মাটিতে মিশিবে হায়,
ভবলীলা একদিন হবে সমাপন।[২০০]

কবির সেই অপরিণত বয়সেও আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁর মাঝে ছিল। তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিবেদন করেন:

হায় নাথ, বল দেখি, দীন হীন জনে।
পাব না কি দরশন, কভু এ নয়নে?
নিরধন প্রেমাধীন, জানিয়া কখন,
বল দেখি প্রাণনাথ দিবে দরশন।
হায় প্রাণ প্রিয়তম! তোমার বিরহে,
নিরন্তর দুখানলে এ পরাণ দহে।[২০১]

---

১৯৯. *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫০৩-৫০৪
২০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৪

কায়কোবাদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মানুরাগী মানুষ ছিলেন। তাঁর কবিতায় নিজের ধর্ম বিশ্বাস তুলে ধরেছেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যে বেশ কিছু কবিতা তার ধর্মানুভূতি ও খোদাপ্রেমের পরিচয় বহন করে। জনৈক মুসলিম দার্শনিকের বক্তব্য হলো من عرف نفسه فقد عرف ربه অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেকে চেনে, সে তার প্রতিপালককে চেনে। কায়কোবাদ মহান প্রভুকে চেনার জন্য নিজেকে চিনতে চেয়েছেন। 'আমি কে' কবিতায় কবি বলেন:

আমি কে?-আছে কি তবে অস্তিত্ব আমার?
জীবন, আকৃতি, রব
শৈত্য-ঔষ্ণ্য অনুভব
শুধু কল্পনার খেলা;-ছলনা ধাঁধার!
কে তুমি? কে আমি বিভো? দেও সত্যজ্ঞানে।
আমি কি তোমারে ছাড়া?
তুমি কি ব্রহ্মাণ্ড ভরা।
কোথা তবে তুমি আমি?-কত ব্যবধান?[২০২]

কবি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন যে, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে কী রকম তফাৎ। তিনি বুঝতে পেরেছেন সৃষ্টির দুর্বলতা আর মহান স্রষ্টার শক্তি সামর্থ ও দয়ার বিশালতা। ফলে কবি তাঁরই গুণগান গেয়েছেন - প্রশংসা করেছেন। কবি বলেছেন:

বিভো, দেহ হৃদে বল!
এ নিখিল বিশ্বে, তোমারি মহিমা,
গাইছে সতত, তপন-চন্দ্রিমা-
গ্রহ-উপগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডল!
তোমারি করুণা শিশিরের বিন্দু,
তোমারি জ্যোতিতে পূর্ণিমার ইন্দু
এত সমুজ্জ্বল!
দেহ হৃদে বল![২০৩]

---

২০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭২
২০২. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
২০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

কবি স্রষ্টার প্রশংসা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজের সমূহ দুর্বলতা ও অক্ষমতা নিয়ে প্রভুর সামনে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। কবি বলেছেন:

বিভো, দেহ হৃদে বল!
না জানি ভক্তি, নাহি জানি স্তুতি
কি দিয়া করিব, তোমার আরতি
আমি নিঃসম্বল!
তোমার দুয়ারে, আজি রিক্ত করে,
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সঁপিতে তোমারে
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল![২০৪]

প্রভুকে বলছেন যে, নিজের বহুবিদ দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। সুখে-দুঃখে, দারিদ্র্য-পেষণে কবি তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালোবাসায় স্মরণ রেখেছেন। কবি বলেন:

... ...
দারিদ্র্য-পেষণে, বিপদের ক্রোড়ে
অথবা সম্পদে, সুখের সাগরে
ভুলিনি তোমারে এক পল,
জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর সাথের সম্বল;
দেহ হৃদে বল![২০৫]

'ভুল ভেঙে দেও' কবিতায় কবি ভুলে ভরা জীবন নিয়ে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে এসে সব অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। মারাত্মক ভুলে, সংসারের মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে ষড়রিপুর কবলে পড়ে ভুলে ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় সত্ত্বা স্রষ্টাকে। কবি বুঝতে পেরেছেন জীবন সংসারের ফাঁদে

২০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
২০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

পড়ে তাঁর জীবন আজ চরম সঙ্কটে এসে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় কবি আপন প্রভুর আশ্রয় ও দয়া কামনা করছেন। কবি বলেন:

তুমিই আমার স্বামী, পথ ভ্রান্ত পাপী আমি
হাত ধ'রে প্রভু তুমি,
কোলে তুলে নেও!
যে ভুলে তোমারে ভু'লে, হীরা ফেলে কাঁচ তুলে
ভিখারী সেজেছি আমি -
- আমার সে ভুল প্রভু,
তুমি ভেঙ্গে দেও![২০৬]

কবি সর্বদা তার একান্ত প্রিয়জন মহান প্রভুর অস্তিত্ব অনুভব করেন। কী শৈশবে, কী কৈশোরে, কী যৌবনে, কী বার্ধক্যে, সর্বদা তিনি প্রভুর মায়া অনুভব করেন। মহান প্রভুর সংস্পর্শই কবির ব্যথিত হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করতে পারে। কবি হৃদয় সে কথা স্মরণে বলে উঠে:

তুমি শৈশবের খেলার সঙ্গিনী-
তুমি যৌবনের জীবন-তোষিণী,
বার্দ্ধকের তুমি জপের মালা!
তুমি যদি থাক প্রাণের নিকটে,
তুমি যদি থাক হৃদয়ের পটে,
না থাকে আমার যাতনা জ্বালা![২০৭]

কবি তাঁর মহান প্রভুকে স্মরণ করেন প্রতিনিয়ত - এমনকি প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁকে তিনি অনুভব করেন। কবি প্রভু প্রেমের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যে, প্রভুকে তিনি অনুভব করেন তাঁর চারপার্শ্বে, কাজে-কর্মে, আযানের সুমধুর ধ্বনিতে ও কোরআনের আয়াতসমূহে। কবি বলেন:

হে সাকি, তাহারি প্রেমে হৃদি ভরপুর!
জীবনে প্রতিশ্বাসে,

২০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬
২০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

তারি স্মৃতি সদা ভাসে,
আজানে প্রত্যহ শুনি তারি কণ্ঠসুর!
হৃদয়ের পত্রে পত্রে
কোরানের ছত্রে ছত্রে
বাজে সদা সপ্ত সুরে সে গীত মধুর![২০৮]

কবির ধারণা শুধু তিনি নন, সমগ্র বিশ্ব নিচয়ে যা কিছু আছে সবি মহান প্রভুর ভালোবাসায় নিমগ্ন। এক্ষেত্রে আকাশের চন্দ্র-সূর্য ও অগণিত নক্ষত্রও বাদ নেই। কবি চমৎকার ভঙ্গিতে বলে উঠেন:

রবি শশী গ্রহ তারা
তারি প্রেমে মাতোয়ারা,
সকলেই তারে আজি করে অন্বেষণ!
বিপদে সম্পদে সে যে রক্ষিছে তোমারে
সে তোমার হৃদি মূলে;
বিশ্ব ভরা কুলে কুলে,
তুমি কেন ওরে মন, ভু'লে গেছ তারে?[২০৯]

বিশ্ব বিধাতা মহান প্রভু সমগ্র সৃষ্টি নিচয়ের মঙ্গল করে থাকেন। তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ বান্দাকে ক্ষমার নিয়ামত দ্বারা শোভিত করেন। সৌরজগতে তাঁরই জয় জয়কার। সকলি তাঁরই সকাশে প্রার্থনারত। এমতাবস্থায় পাঠকের অলস ঘুমে অচেতন থাকা কবি বরদাশত করতে পারেননি। কবি ঘুম জাগানিয়া পাখির মতো বলে উঠলেন:

তাহারি অর্চ্চনা তরে এত আয়োজন,
এ সৌর জগতে আজ,
সবে বলে "সাজ সাজ"
তুমি কেন ওরে মন ঘুমে অচেতন![২১০]

---

২০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০
২০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

কবি শুধু স্রষ্টার প্রতি অনুরাগমূলক কবিতাই লিখেননি, তিনি ধর্মানুরাগ নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। ঈমান, নামাজ, রোজা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি তাঁর কবিতায় আলো ছড়িয়েছেন। কবি ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন:

ঘরখানি থাকে যেমন
খুঁটির উপরে!
ধর্মও তেমনি থাকে
ঈমানের প'রে
ঈমান যাহার নাই
সে নহে ধার্মিক!
পশু হ'তে সে যে বিশ্বে
অধম অধিক!
রোজা ও নামাজ পূজা
সবি মিথ্যা তার!
জগতের মাঝে সে যে
পাপী দুরাচার![২১১]

আল্লাহ প্রেমের গান গেয়েছেন কায়কোবাদ। খোদা ভক্তিকে তিনি মুক্তির মূল সোপান হিসেবে পরিগণিত করেছেন। কবি মনে করেন- আকাশের বাসিন্দারা (ফেরেশতা) মহান বারী তায়ালার প্রেমে আত্মহারা- এমনকি বিশ্ব নিচয়ের সকল সৃষ্টি খোদার প্রেমের পরশ পেয়েই এত সুন্দর, এত মনোহর। কবি লিখেছেন:

সার শুধু 'প্রেমভক্তি'
ভক্তি বিনে কোথা মুক্তি,
এ বারতা নিয়ে যেন নে'মে আসে হুর!
আকাশে ফেরেস্তা যারা,
হ'য়ে 'প্রেমে' আত্মহারা,
করিবে কুসুম-বৃষ্টি ঝুরঝুরঝুর;
হে সাকি, তাহারি প্রেমে, হৃদি ভরপুর![২১২]

---

২১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
২১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭
২১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেম ও বিরহ

কায়কোবাদ প্রেম ও প্রকৃতির কবি।[২১৩] প্রেমকে উপজীব্য করেই তাঁর কাব্য সাধনা। তাঁর গীতি কাব্যের বেশির ভাগ কবিতাই প্রেমের কবিতা। এসব কবিতায় শৈশবের প্রেম, স্মৃতিচারণ, বিরহের যন্ত্রণা, প্রিয়া হারানোর বেদনা, একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা, অভিমান, অবিশ্বাস-সন্দেহ প্রভৃতি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তাঁর কিশোর কাব্যে এর প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করেছি। তিনি তাঁর প্রেয়সীর সাথে যে সুন্দর দিনগুলো কাটিয়েছেন তা তাঁকে তাড়িত করেছে। তিনি বারবার স্মৃতি কাতরতায় ভুগেছেন। সেই সুন্দর দিনগুলো স্মরণে কবি বলেছেন:

প্রাণাধিক

সেই সুখ-আলাপন সেই 'বন্ধু' সম্বোধন
এবে আর কিছু তার পড়ে কিহে মনেতে।
সুখদ নিকুঞ্জ বনে যাইয়া তোমার সনে
গাইতাম কত গীত গুনগুন স্বরেতে
... ...
তখন দুজনে মরি ক'রে হাত ধরাধরি,
বেড়াতেম নদীতীরে অহোরে কি সুখেতে।[২১৪]

কবি তাঁর প্রণয়ীকে নিয়ে শুধু আলাপনে মশগুল থাকেননি। নির্জন নিভৃত কুঞ্জবনে তাঁরা পরস্পরকে প্রেমমাল্য পরিয়ে ভালোবাসাকে করেছেন আরো তীব্রতর। কবি বলেন:

প্রভাতে কুসুমবনে যাইয়া প্রফুল্ল মনে,
বিকচ সৌরভ মধু ফুলকুল কুড়ায়ে।
হায় কি কহিব আর গাঁথিয়া চিকণ হার,
দিয়িতাম দুজনাই দুজনারে পরায়ে।[২১৫]

---

২১৩. *আবুল ফজল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২১৪. *কায়কোবাদ*, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬

কবি তার প্রণয়ীর সৌন্দর্যে আত্মহারা। কবির প্রিয়া রূপ সৌন্দর্যের এক প্রতিবিম্ব। নিষ্কলুষ চরিত্র আর দৈহিক সৌন্দর্যে সে অদ্বিতীয়া, কবি তার প্রিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রিয়ার প্রতি বিমুগ্ধ কবি বলেন:

কি দেখিনু হায়! সেই মণ্ডপের কোণে,
প্রেমের প্রতিমা কিম্বা সোনার বিজলি!
সমুজ্জ্বল চারিদিক রূপের কিরণে,
... ...
বিমুক্ত কবরী পৃষ্ঠে পড়েছে দুলিয়া,
কমনীয় দেহ-লতা নীলাক্ত বসনে
... ...
মধুমাখা মুখখানি; সরল নয়নে;
ভাসিতেছে সরলতা, নাহি কাল কুটিলতা,
ফোটো ফোটো ফুল যেন যৌবন-কাননে।[২১৬]

অপুর্ব সাজসজ্জা ও অলঙ্কার পরিধান করার ফলে মানসীর রূপের যে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে:

দুলিছে নোলক নাকে করি ঝলমল!
রূপের সরসে কত খেলিছে বাহার,
আধো আধো বিকশিত বদন-কমল,
শোভিছে ভ্রমর ভুরু বঙ্কিম আকার!
দাড়িম্ব কুসুমনিভ অধর পল্লব,
পলকেতে মুনিজন মানস ভুলায়,
কুলীনের নিরমল কুলের গৌরব,
শোভিছে যুগল কর কনক বালায়,[২১৭]

---

২১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬
২১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯

কবি তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে গোপনে অভিসারে বের হয়েছেন। কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি চলে গেছেন কুঞ্জবনে। সেখানে তারা বৃষ্টিতে ভিজেছেন- কাছাকাছি হয়েছেন, আলাপনে মেতেছেন। কবি বলেন:

আত্ম পুরবাসীগণে ছলিয়া গোপনে,
যাইতে ছিলাম মরি, প্রেয়সীরে লয়ে!
হেনকালে বৃষ্টি হয়ে, ভিজাল দুজনে
... ...
প্রাণের প্রেয়সী মোর বসিল জঙ্ঘায়
জলদের কোলে মরি বিজুলি যেমন
তেমতি শোভিল প্রিয়া, কি কহিব হায়
মম অঙ্ক পরি কিবা, নয়নরঞ্জন।[২১৮]

কবি তাঁর প্রেম ভালোবাসাকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন। এ পবিত্র ভালোবাসার মর্যাদা কবি রক্ষা করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। কবির ভাষায়:

আমাদের ভালবাসা বিশুদ্ধ বিমল,
কলুষের লেশমাত্র লাগিতে না দিব!
পবিত্র পৃথিবী মুখ করিবে উজ্জ্বল,
হৃদয়-মন্দিরে সদা লুকায়ে রাখিব।[২১৯]

কবির প্রেম স্থায়ী হয়নি। তিনি তার প্রণয়ীকে হারিয়েছেন। প্রিয়া হারানোর বেদনা তাকে বিরহী করে তুলেছে। স্মৃতি কাতর হয়েছেন, স্মরণ করেছেন বারবার তাঁর প্রণয়ীকে। তিনি তাঁর প্রেয়সীকে ভুলতে পারেননি। বিক্ষত হৃদয় নিয়ে কবি হুতাশনে ভুগেছেন। এতো কষ্ট আর যাতনার মধ্যেও কবি তাঁর প্রেমিকার কল্যাণ কামনা করেছেন। কবি বলেছেন:

রঙ্গিনী সঙ্গিনী সনে জনম কাটাও রে

---

২১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯
২১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০০
২১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩

সুখ আলাপনে;

নিরাপদে বেঁচে রও পতিসোহাগিনী হও,

দূর হ'তে এ অভাগা দেখিবে নয়নে;

জনম কাটাও রে সুখ আলাপনে।[২২০]

এ কাব্যের বহু কবিতায় প্রিয়া হারানোর বেদনায় কবির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দৃশ্যমান হয়েছে। কবি বলেছেন,

প্রেয়সি!

তোমার কারণে নিয়ত কাননে

করেছি ভ্রমণ পাগল-মত,

হায় রে তোমারে পাইব কেমনে,

বিরহ যাতনা, সহিব কত![২২১]

এ কবিতায় কবি আরো বলেছেন, প্রণয়ীর কথা ভাবতে ভাবতে তার শরীর ভেঙে পড়েছে- এমনকি মৃত্যুর সন্নিকটে এসে পৌঁছেছে। কবির ভাষায়:

হা প্রেয়সী!-

তোমার কারণে ভাবিয়া ভাবিয়া,

হইয়াছে তনু কঙ্কালসার,

হায়রে কোবাদ, গেল রে মরিয়া!

তবু কি তোমায় পাবেনা আর।[২২২]

কবি আরো বলেন:

তোমার লাগিয়া

যেমন শুকায়ে ছিল, সে ফুল্ল কুসুম রে

---

২২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৮

২২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৮

২২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৮

দেখিতে দেখিতে।

আমিও তেমনি প্রিয়ে,

যাইতেছি শুকাইয়ে,

যামে যামে পলে পলে বিরহ-ব্যাধিতে

সে ফুল্ল ফুলের মত দেখিতে দেখিতে।[২২৩]

কবি তার প্রেমিকাকে এত ভালোবাসেন - কোন ভাবেই তাঁকে তিনি ভুলতে পারছেন না। বিরহের যন্ত্রণায় সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় কবি ব্যকুল হৃদয়ে পরকালে প্রেয়সিকে কামনা করেছেন।

কবি বলেন:

ও প্রেয়সি মুক্তকেশি প্রাণের পুতলি রে!

তুমি কি আমার?

যদি মোর হও তুমি রেখ মনে চন্দ্রাননি,

পরলোকে দরশন দিও একবার,

প্রাণের পুতলি রে, তুমি কি আমার![২২৪]

কবি প্রিয়ার প্রতি অভিমান করে বলেন যে, তিনি কিছুদিন কষ্ট ভোগ করবেন, ধৈর্য ধারণ করবেন। অতঃপর প্রিয়াকে ভুলে যাবেন। আর কোনদিন প্রিয়াকে স্মরণ করবেন না- এমনকি প্রেম-ভালোবাসায় আর কোনদিন আত্মহুতি দিবেন না। কবির ভাষায়:

কি হইবে? কিছুদিন জ্বলিবে এমন।

অবশেষে ক্রমে ক্রমে ভুলিব তোমা!

না রহিবে ভালবাসা, সুখের মনন,

মজিব না কভু আর প্রণয়-মায়ায়![২২৫]

---

২২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৬

২২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৮

২২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২

পরক্ষণেই কবি অভিমান ভুলে বাস্তবে চলে আসেন। প্রণয়ীকে উপদেশ দেন। সান্ত্বনা দেন। আর কামনা করেন তাদের মিলন হবে পর জগতে। কবি বলেন:

ভালবাস, ভালবাসি, জানি মনে মনে,
মুখ ফুটে কহিও না থাকিতে জীবন!
জ্বলিবে পুড়িবে কিন্তু রাখিও গোপনে,
পরকালে একদিন হইবে মিলন![২২৬]

কবি প্রেয়সীকে বলছেন চুপ থাকতে, তাদের ভালোবাসা প্রকাশ না করতে, ভুলে থাকতে। আর তিনিও ভুলে থাকবেন, পরজগতে তাদের মিলন হবে। কিন্তু তিনি জগৎ সংসারের সবখানে প্রণয়ীর মুখ দেখতে পান। তিনি তাকে শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারেন না। কবি বলেন:

... ...
যখনি ভুলিতে চাই
তখনি দেখিতে পাই,
আকাশ পাতালে তবসেই মুখখানি!
সেই মুখ বিনে আর কিছুই না জানি।[২২৭]

কবি তাঁর প্রেয়সীর ভালবাসায় বিভোর। তিনি তাকে ভুলতে চাইলেও ভুলিতে পারেন না। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য সকল স্থানে তিনি দেখতে পান। প্রেয়সীর চাঁদ মুখখানি ভুলতে গিয়ে কবির হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। কবির ভাষায়:

কেমনে ভুলিব সেই রূপের বাহার!
সে বিনে কিছুই ভাল লাগে না আমার
ভুলি ভুলি করি তারে,
কই পারি ভুলিবারে?
ভুলিতে চাহিলে
-হায়!
-দেখি এ নয়নে-
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে, সেই চাঁদ মুখ,
কে ভুলিবে?-কিসে ভুলি,-কেঁদে উঠে বুক;[২২৮]

---

২২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২
২২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৬

কায়কোবাদ একজন প্রেমিক কবি। তার কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য নারীর প্রেম। কবি ব্যক্তি জীবনের প্রেমকে উপজীব্য করেই রচনা করেছেন অসাধারণ সব কবিতা। কায়কোবাদ তাঁর বাল্য প্রেম ও প্রণয়ীকে কোনদিন ভুলতে পারেননি। হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদার কন্যা গিরিবালা দেবীর কথা উঠে এসেছে তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে। বাল্যপ্রেমের সুমধুর স্মৃতি, প্রেমে ব্যর্থতার গ্লানি কবিকে উতলা করেছে। সেই সাথে আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের মনমাতানো সবুজ প্রকৃতি আর ইছামতি নদীর ঢেউ কবিকে আরো প্রেমী ও বিরহী করেছে।

কায়কোবাদের প্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ কবিতা গিরিবালা দেবীকে নিয়ে। তবে সব কবিতা নয়। তিনি নীলিমাময়ী সেন ও স্ত্রী তাহের উন্নিসা খাতুনকে নিয়েও কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রেম বিষয়ক কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'অশ্রুমালা' কাব্যে কবির বাস্তব জীবনের অনুভূতি প্রকাশ পাওয়ায় - এ কাব্যের আবেদন সুগভীর। এ সম্পর্কে কায়কোবাদ গবেষক ফাতেমা কাওসার বলেন:

"কায়কোবাদ প্রেমের কবিতায় কবি বাঙালি কবির ঐতিহ্যের পথ ধরেই প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন। প্রিয়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, মিলনে হয়েছেন উৎফুল্ল, কখনও বা আক্ষেপ ও অভিমান করেছেন, বিরহ-ব্যথায় কাতর হয়ে করেছেন বিলাপ, প্রিয়াকে ছলনাময়ী বলেছেন, কখনও অতীত প্রেম সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে ব্যথিত হয়েছেন, অশ্রু বিসর্জন করেছেন। কবির প্রেম-ভাবনা একান্ত মানবীয় আবেগে ভরপুর। প্রেমানুভূতির নিবিড় প্রগাঢ়তায় কবিতাগুলি উজ্জ্বল ও জীবন্ত।[২২৯]"

আমি ইতোপূর্বে বলেছি কবির জীবনে আসা মেঘ বালিকা গিরিবালা দেবী, তাঁর হৃদয়ে অতি উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন। কবি তাঁকে নিয়ে বার বার স্মৃতিকাতর হয়েছেন। তাঁর অন্তর্ধানে বিরহের মহাসমুদ্রে তিনি পতিত হয়েছেন। কবিতায় তিনি ফিরে গেছেন বারবার তারই কাছে। অশ্রুমালা কাব্যের 'ভুল' কবিতার প্রথম ছয়টি পংক্তির আদ্যক্ষর মিলে দাঁড়ায় গিরিবালা দেবি। যেমন:

গি-য়াছিনু প্রিয়তমে প্রেমের নিকুঞ্জ বনে,
রি-ক্ত করে ফিরে এনু না পাইনু ফুল!

---

২২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭

২২৯. ফাতেমা কাওসার, *কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

বা-তাসে গিয়াছে ঝ'রে, নাই আর বৃন্ত 'পরে
লা-বন্য মাটির সনে হ'য়ে গেছে ধুল।
দে-খিনু সুগন্ধ তার সমীর নিয়াছে ধার
বি-ষাদে হৃদয় মোর মরু সমতুল![২৩০]

কবির বাল্য প্রণয়ী গিরিবালা দেবী কবিকে প্রতিদিন ফুল পাঠাতেন। কবি এক সময় চলে আসেন তাঁর শিক্ষা নিকেতন ঢাকা মাদরাসায়। বসবাস করেন ডাফরিন ছাত্রাবাসে। মনের অস্থিরতা দূর করতে খিলগাঁও - প্রণয়ীর গ্রামে যান। সেখানে গিরিবালা নেই তাই ফুলও নেই। অতঃপর কবি লিখলেন 'ভুল' শিরোনামে কবিতা।

'একটি বালিকার প্রতি' কবিতায় কবি সরাসরি তার মানস প্রিয়া গিরিবালার নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন:

কোমল কুসুমমম কে বলে তোমায়,
হায় গিরি, হৃদি তব কঠিন পাষাণ!
ভালবাসা দেখাইয়া ভুলা'লে আমায়,
ছলনা করিয়া শেষে বধিলে পরাণ![২৩১]

কবি গিরিবালা দেবীকে কোহিনূর মণির সাথে তুলনা করেছেন। গিরিবালা ফুল দিয়ে বরণ করতেন। তাই কবি তাকে ফুল্ল কমলিনী বলে অভিহিত করেছেন। সে কথা কবি তার 'সোহাগিনী প্রিয়া' কবিতায় বিদৃত করেছেন এভাবে:

কোথায় আমার সেই ফুল্ল কমলিনী?
যাহার প্রেমের স্মৃতি,
জাগে প্রাণে নিতি নিতি,
কোথায় আমার সেই কোহিনূর মণি?[২৩২]

---

২৩০. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
২৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১
২৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২

কবি তার প্রণয়ী গিরিবালাকে হারিয়েছিলেন ধর্মের ভিন্নতা আর সমাজ সংস্কারের কারণে। বিষয়টি কবি তাঁর 'ঊষাস্বপ্ন' কবিতায় এভাবে উল্লেখ করেছেন:

তুমি ছিলে ব্রাহ্মণ-কন্যা আমি ছিনু মুসলমান
কে জানিত দোঁহার মাঝে, 'এতখানি ব্যবধান'?[২৩৩]

নারীর রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা বাংলা কবিতার অন্যতম অনুষঙ্গ। বেশির ভাগ কবিই প্রণয়ীর অপরূপ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তা বর্ণনা করেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। কায়কোবাদের প্রণয়ী রূপে-গুণে অতুলনীয় - শ্রেষ্ঠ রমণী। কায়কোবাদ কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় প্রণয়ীর অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। আমার প্রিয়া, ঊষাস্বপ্ন, প্রেম-প্রতিমা, মানস-প্রতিমা, কারে ভালবাসি, প্রেমের স্মৃতি, পাগলিনী, হৃদয়-রাণী, প্রেমময়ীর পূজা, কে তুমি, সেই মুখ খানি, প্রিয়তমার প্রতি, প্রেমের স্বপ্ন, সোনার নলিনী, অপরিচিতা, উদাসীন প্রেমিক প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রণয়ীর সৌন্দর্য অসাধারণ মুন্সিয়ানায় রূপায়িত হয়েছে।

কবি তাঁর প্রণয়ীকে সকল নারীর সেরা মনে করেন। তাঁর (প্রিয়ার) অপরূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত কবি 'আমার প্রিয়া' কবিতায় বলেন:

আমার প্রিয়া-সকল নারীর সেরা!
চাঁপার বরণ রংটি তাহার, ছড়িয়ে পড়ে রূপের বাহার
জগৎ ভরে নাই তুলনা
ফুল দিয়ে তা'গড়া![২৩৪]

কবি তাঁর প্রিয়ার চোখের সৌন্দর্যে বিমূঢ়। প্রিয়ার চোখ সম্পর্কে কবি বলেন:

তার-চোখ দু'টি বড় ভালো!
কি জানি কোন্ যাদু ভরা, পলে পলে বাঁচায় মরা,
রাতের আলো দূর করিয়ে
জ্বালে দিনের আলো![২৩৫]

---

২৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০
২৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

'ঊষাস্বপ্ন' কবিতায় কবি তাঁর প্রণয়ী গিরিবালা দেবীর লাজুক চোখের সৌন্দর্য এভাবে তুলে ধরেছেন:

সেই নিরালা নদীর ঘাটে, তোমার সনে প্রথম দেখা,
লাজুক তোমার আঁখির কোণে প্রেমের কথা কতই লেখা!
আমায় দে'খে আঁখি তোমার লাজের ভারে নুয়ে এল,
সেই দিনই যে প্রেমের বন্যা, প্রাণে প্রাণে বয়ে গেল![২৩৬]

'পাষাণময়ী' কবিতায় কবি বলেন:

আঁখি দুটি কি সুন্দর, সুধা ঝরে ঝরঝর
হৃদয় মাতানো চারু
প্রেমের ফোয়ারা![২৩৭]

'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়াকে চন্দ্র-সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। আর প্রিয়ার তীক্ষ্ণ চাহনিকে ঝরণার সাথে তুলনা করে কবি বলেন:

তুমি পূর্ণ শারদ শশী!
মম চিত্ত-চকোর তব সুধা আশে,
উধাও সারাটি নিশি!
তব সে সৌন্দর্য তব সে সুষমা,
তব সে চাহনি প্রেমের ঝরণা
জাগায় পরাণে কি তীব্র বেদনা,
হিয়ার ভিতরে পশি![২৩৮]

---

২৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
২৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭
২৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
২৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

‘সোনার নলিনী’ কবিতায় কবি তার প্রেয়সীর প্রেমের মদিরাপূর্ণ নয়নযুগল আবিষ্কার করেছেন। কবির ভাষায়:

কোকনদ-মুখ তাহে। চটুল নয়নে
ভাসিতেছে সরলতা, নাহি কাল কুটিলতা,
ফোটো ফোটো ফুল যেন যৌবন-কাননে।
... ...
প্রেমের মদিরাভরা নয়ন যুগল,
অনঙ্গের পঞ্চশর চঞ্চল চাহনি![২৩৯]

‘সেই মুখ খানি’ কবিতায় কবি প্রণয়ীর বিলোল নয়নদ্বয়কে স্মরণ করে বলেন:

সদা মনে পড়ে-
সেই জ্যোতিঃ, সে লাবণ্য, সে চারু গঠন
বিলোল নয়নদ্বয়,
অতুলিতে শোভাময়
চন্দ্রমা জিনিয়া সে দেহের বরণ![২৪০]

কবি তাঁর প্রণয়ীর অপূর্ব চাহনি ভুলতে পারেননি। প্রেয়সীর তীর্যক কটাক্ষ তিনি এখনো যেন দেখতে পান। কবি বলেন:

সেই প্রেম, সেই চাহনি
সেই গল্প মনোহরা!
সেই হাসি মধুমাখা
চাঁদের কৌমুদী ভরা।[২৪১]

২৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮
২৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
২৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

নারীর চোখ যেমন সৌন্দর্যের অন্যতম অনুসঙ্গ তেমনি তাঁর হাসি আর প্রেমময় মুখ থেকেও বিচ্ছুরিত হয় অপার সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা। কবি তাঁর প্রেয়সীর মুখ বারবার স্মরণ করেছেন। তিনি প্রেয়সীর বাঁকা হাসি আজও ভুলতে পারেননি। স্মৃতি কাতর কবি বলে উঠেন:

আমি দেখিতাম শুধু তারে!
মধুর চাঁদনীময়ী মধুমাখা যামিনী,
শশধর হাসিতে অম্বরে!
সে তখন ধীরে ধীরে, এসে এই নদী তীরে,
গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী!
তাহার মধুর স্বরে মুকুতা পড়িত ঝ'রে
নীরবে বহিয়া যেত আকুলা তটিনী!
আমি দেখিতাম শুধু তারে![২৪২]

কবি এখানে তাঁর প্রিয়ার মধুমাখা লাবণ্যময় মুখ ও সুন্দর হাসির কথাই স্মরণ করেননি, তিনি প্রিয়ার অনন্য সাধারণ কণ্ঠস্বরের কথাও স্মরণ করেছেন। কবির প্রিয়ার কণ্ঠস্বর থেকে যেন মুক্তা ঝরতো, এতো কিন্নরী ছিল তার কণ্ঠ যেন তা বহতা নদী।

কবির প্রিয়ার দেহ বল্লরী ছিল গোলাপের মতো, হাসি ছিল মধুমাখা। লজ্জায় আরক্ত মুখে মৃদু হেসে কবির সাথে যখন কথা বলতো তখন যে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠতো তা কবি ভুলেননি কোনদিন। কবি বলেন:

সেই এক মধুমাখা ফুল্ল বসন্তের শেষে,
হাসি ও লজ্জার চারু অরুণ রঞ্জিত রাগে,
গোলাপ ফুলের মত, সে যে মৃদু হে'সে হে'সে,
চে'য়েছিল মোর পানে গোধূলির শেষ ভাগে![২৪৩]

২৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭
২৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

'প্রেমের স্বপ্ন' কবিতায় কবি তার প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রিয়াকে প্রতিমার সাথে তুলনা করেছেন। প্রিয়ার হাসি মাখা মুখ আর চাহনির সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেছেন। কবি বলেন:

ফুল্ল শতদলসম সেই মুখখানি!
চঞ্চল বিজলি ভরা
সে চাহনি মনোহরা
সে মধুর হাবভাব, সুধামাখা বাণী!
... ...
সেই বক্ষে পুষ্পকলি-সুধা-নির্ঝরিণী!
কেমনে ভুলিব আমি সেই মুখখানি![২৪৪]

এ কবিতার অন্যত্র কবি বলেছেন:

সেই মধুমাখা হাসি, সেই মুখে 'ভালবাসি'
এখনো বাজিছে মোর শ্রবণের কোণে![২৪৫]

কবি 'পাষাণময়ী' কবিতায় প্রিয়ার হাসি মুখকে ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। প্রিয়ার কোহিনূর মণির মতো চক্ষু যুগল আজানু ঢেউ খেলানো কেশ, স্ফীত বক্ষদেশ, গোলাপ গন্ধে সুরভিত অধর, সোনালী গণ্ডদেশ, মধুমাখা হাসি প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলেন:

কোমল ফুলের মত তব হাসিমুখ!
দেবী কি অথবা পরী, ইচ্ছে হয় হৃদে ধরি
শীতলি এ বুক!
আঁখি দুটি কি সুন্দর, সুধা ঝরে ঝরঝর
হৃদয় মাতানো চারু
প্রেমের ফোয়ারা![২৪৬]

---

২৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬-২২৭
২৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬
২৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

কবি আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন:

তব অই বক্ষস্থল, লাবণ্যতে ঢলঢল
অতৃপ্তি-মদিরা ভরা
অমৃতের খনি!
ফোঁটা ফোঁটা তাহে দুটি প্রণয়-পীযুষ ভরা
প্রেমিকের প্রাণহারা
সোনার নলিনী![২৪৭]

'সেই মুখখানি' কবিতায় কবি প্রেয়সীর সুন্দর হাসি, কুন্তল কেশ, সুভিত পোশাক ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

সে মধুর হাবভাব, সেই প্রেম হাসি!
সে চারু চিকন কেশ
সেই সুশোভন বেশ
সুধাংশু-কিরণ ভরা সেই রূপরাশি![২৪৮]

'প্রিয়তমার প্রতি' কবিতায় কবি তার প্রেয়সীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছেন এভাবে:

অমৃতের নদী, তরল কৌমুদী,
তোমারি মুখের হাসি!
তব সে অধর প্রেমের নির্ঝর,
সুধা ঝরে তাহে ঝর্‌ঝর্‌ঝর্‌
বক্ষে তোমার কোমল সুন্দর,
কুন্তলে প্রেমের ফাঁসী![২৪৯]

এ কবিতার অন্যত্রে অর্ধ বিবসনা প্রিয়ার সৌন্দর্যে বিমোহিত কবি বলেন:

অর্ধ বিবসনা রূপের সাগরে
সে নগ্ন সৌন্দর্যে কত সুধা ঝরে,
মুগ্ধ প্রাণ মোর সে সৌন্দর্য হে'রে,
কে তাহা দে'খেছে কবে![২৫০]

---

২৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
২৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
২৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

'সোনার নলিনী' কবিতায় প্রিয়ার সৌন্দর্যে মাতোয়ারা কবি এক এক করে প্রেয়সীর সৌন্দর্যের ডালি খুলে দিয়েছেন। এখানে এর অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো:

ভাসিতেছে সরলতা, নাহি কাল কুটিলতা
ফোটো ফোটো ফুল যেন যৌবন-কাননে!
দুলিছে মুকুতা নাকে করি ঝলমল,
সৌন্দর্য-সরসে যেন ফুটন্ত নলিনী!
প্রেমের মদিরাভরা নয়ন যুগল,
অনঙ্গের পঞ্চশর চঞ্চল চাহনি!
দাড়িম্ব কুসুমনিভ অধর-পল্লব
পলকেতে মুনিজন মানস ভুলায়!
ভ্রুদুটি অনঙ্গ ধনু রূপের গৌরব,
শোভিছে যুগল-কর কনক-বালায়![২৫১]

কবি তাঁর প্রিয়ার অসাধারণ সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটায় দীপ্যমান মুখখানি ভুলতে পারেননি। সদা-সর্বদা তাঁর চোখে ভেসে ওঠে প্রিয়ার সেই হারানো মুখ। কবি হারানো প্রিয়ার রূপ সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এভাবে:

এমনি সুন্দর!
কি দিব তুলনা তার?-ঊর্ধ্বে চন্দ্রমার
অতুলিত রূপ রাশি,
নিম্নে গোলাপের হাসি,
এ দু'য়ের শোভা জিনি মুখ-জ্যোতিঃ তার![২৫২]

---

২৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩
২৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮
২৫২. প্রাগুক্ত, *পৃ. ২৫১*

কবির প্রেয়সী যখন লজ্জিত হয় তখন তাঁর সৌন্দর্যের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কবির ভাষায়:

হায় কি মধুর!
একটুকু লজ্জা পেলে যেন মরে যায়!
তোলেনা নয়ন আর,
কি শোভা তখন তার!
আছে কি জগতে আর এত শোভা হায়?[২৫৩]

কবি এখানেই থেমে থাকেননি - তিনি মনে করেন তাঁর মানসীকে দয়াময় স্রষ্টা এতো সৌন্দর্য দিয়ে গড়েছেন যে, তাঁর তুলনা শুধু সেই, অন্য কেউ নয়। এমনকি এ বিশ্ব চরাচরে তার তুলনা হতে পারে - এমন কেউ নেই। কবি বলেন:

বিধাতা এমনি করি গড়িয়াছে তায়!
সে বিনে তুলনা তার
নাহি এ ভুবনে আর,
স্বর্গের কুসুম সে যে এসেছে ধরায়![২৫৪]

কবি তাঁর মানস প্রিয়াকে ভুলতে পারেন না। প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য সুধা তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শয়নে-স্বপনে, জাগ্রত-কল্পনায় প্রিয়ার সে সৌন্দর্য তাঁর মানস চোখে ভেসে উঠে। কবির প্রণয়ীর অনন্য সাধারণ সৌন্দর্যে ভরা হাসি, ফুলেল সুবাসের দেহ বল্লরী, আনত ঝরঝরে চোখ, সুধাময় কণ্ঠস্বর, সুষমাময় মুখ তিনি কোন ভাবেই ভুলতে পারেন না। এই না ভুলতে পারা তাকে উন্মাদে পরিণত করেছে। কবি বলেন:

কেমনে ভুলিব আমি তারে
তার সে রূপের জ্যোতিঃ, হৃদয়ে পশিয়া গো
পাগল করিয়া দিল মোরে!
না জানি কি ঘুম ঘোরে, তারে দেখিছিনু গো,
তাই তারে ভুলিতে না পারি!
শয়নে, স্বপনে ধ্যানে, তারে মনে পড়ে গো,
সে আমার-আমি যে তাহারি![২৫৫]

---

২৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
২৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

'সোনার নলিনী' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের শেষ পর্যায়ে কবি তাঁর প্রণয়ীর দেহ বল্লরীর সৌন্দর্য-সুষমা প্রকৃতির সৌন্দর্যে খুঁজে পেয়েছেন। কবি এ সম্পর্কে বলেন:

বেলীতে পেয়েছি তার দেহের সৌরভ,
গোলাপে মুখের গন্ধ, বিজলীতে হাসি!
চম্পকে দেহের বর্ণ অঙ্গের সৌরভ,
অমৃত অধরসুধা, চাঁদে রূপরাশি!
কুরঙ্গ নয়নে ঘোর মাদকতাভরা
তাহারি চক্ষের চারু চঞ্চল চাহনি!
মুহূর্ত হেরিলে যাহা মেতে উঠে ধরা,
কোকিলে মধুর কণ্ঠ সুধা নির্ঝরিনী।[২৫৬]

কবি তাঁর প্রিয়াকে ভুলতে পারেননি। চারপাশে, সবখানে তিনি তাঁরেই খুঁজে ফিরেন। বিস্মৃতির অতল গহীনে হারায়নি প্রাণ-প্রেয়সী। চির অম্লান অক্ষয় ও ভাস্বর হয়ে আছে প্রিয়া কবির হৃদয়-মানসে। প্রিয়ার সান্নিধ্যে ঘটে যাওয়া সব চমৎকার স্মৃতি এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে - ঘিরে ধরে কবিকে, আবেগে আপ্লুত হয়ে কবি ফিরে তাকান পেছন দিকে। স্বপ্নাতুর প্রেমিক কবি দেখতে পান তার মানস-প্রিয়াকে। সুন্দর স্মৃতির পীড়ায় কবি বিচলিত হৃদয় নিয়ে করেন স্মৃতি রোমন্থন। 'প্রেমের সে স্মৃতি' কবিতায় কবি বলেন:

শৈশবে তোমার সহ, খেলিতাম অহরহ
নদী-তীরে-তরুমূলে, কাননে বিজনে!
যৌবনে সৌন্দর্য রাশি, উছলিয়া কুলে কুলে,
পড়েছিল দেহে তব প্রেমের প্লাবনে!
... ...
কত প্রেম কত আশা, কত স্নেহ ভালবাসা,
জানাতে আমায় তুমি নয়নে নয়নে!
সে চাহনি-সেই হাসি সে অতুল রূপরাশি
নারিনু ভুলিতে আমি সারাটি জীবনে![২৫৭]

---

২৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২
২৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০

প্রিয়ার স্মরণে কাতরতা কবি হৃদয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কায়কোবাদ বারবার তাঁর বাল্য প্রণয়ীর স্মরণে কাতর হয়েছেন। তিনি ফিরে গেছেন প্রেয়সীর স্মরণে স্মৃতির পাতার ক্যানভাসে। কবি তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে সুন্দর চাঁদনী রাতে নির্জনে সাক্ষাত করতেন। তাই কবির হৃদয়ে ভেসে উঠে। কবি বলেন:

এমনি মধুরস্বরে সে গাইত স্বজনি
আমি শুনিতাম প্রাণ ভরিয়া!
মধুর চাঁদনীময়ী মধুমাখা যামিনী
নীরবে যাইত সখি বহিয়া!
দুজনে সরসীতীরে পাশাপাশি বসিয়া
হেরিতাম কত শোভা হরষে!
হাসিত মধুরে মরি কত সুখে ফুটিয়া
কুমুদ কহলরি কত হরষে![২৫৮]

বসন্ত পূর্ণিমা রাতের নির্জনে নিভৃতে সজল নয়নে কবির প্রিয়া কবিকে দিয়েছেন অশ্রুমালা। সে রাতে শুধু অশ্রু ঝরেনি, অপরূপ সৌন্দর্যের আঁধার কবির প্রণয়ীর মুখ থেকে ঝরে পড়েছিল অসম্ভব সুন্দর হাসির ফোয়ারা। আর সুমিষ্ট কণ্ঠ থেকে বের হয়েছে সুর-ঝঙ্কারের কথা মালা। কবি সে কথা স্মরণে বলে উঠেন:

নীরব সজল নেত্রে,
বসন্ত পূর্ণিমা রাত্রে,
দিয়াছিনু 'অশ্রু-মালা'! - হায় সেই দিন!
কত কথা ব'লেছিলে,
কত হাসি হেসেছিলে,
সে হাসি, সে কথা - হৃদে আঁকা চিরদিন![২৫৯]

---

২৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২
২৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮
২৫৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

'ঊষাস্বপ্ন' কবিতায় কবি তাঁর বাল্য প্রণয়ীর সাথে ঘটে যাওয়া সুন্দর সময়গুলো স্মরণ করেছেন। নদীর ঘাটে প্রথম দেখা, প্রথম প্রেমের পরশে প্রণয়ীর লাজ রাঙা মুখ, লাজুক আনত চক্ষুদ্বয় কবির চোখে এখনো ভাস্বর হয়ে আছে। গিরিবালার সুষমামণ্ডিত সৌন্দর্যের বর্ণনাও কবি দিয়েছেন চমৎকারভাবে। গিরিবালা যখন স্নান করে নদীর তীরে ভেজা চুলে দাঁড়াতো তখন তাকে যেন মনে হতো শিশির ভেজা গোলাপের একটি গুচ্ছ। তখন তাঁর সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা এতটাই দীপ্যমান হয়ে উঠতো যে, সে রূপ দর্শনে মুনি-ঋষির ধ্যান ভেঙে যেতো। কবি বলেন:

স্নান করিয়ে ভিজে চুলে, দাঁড়ালে সে নদীর কূলে,
গোলাপ ফুলের গুচ্ছ যেন, সিক্ত নৈশ নীহারজলে!
হেরিলে সেই রূপরাশি, মুনিঋষি হয় আপনহারা,
বহে তাদের প্রাণের মাঝে, মন্দাকিনীর সুধা-ধারা।[২৬০]

অতঃপর কবি প্রণয়ীর সাথে ঘটে যাওয়া সাক্ষাৎ আবেগ ভরে বর্ণনা করেছেন। প্রিয়ার দু'তলা বাড়ির পেছনের বাগানে তাঁদের গোপন অভিসার, দৃষ্টি বিনিময়, প্রিয়ার সখী নির্মলা, হেমনলিনী ও চারুবালার দুষ্টুমি আর লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠা ইত্যাদি কবির নিকট মনে হয় যেন স্বপ্ন। কবি স্মৃতিকাতর হয়ে তার প্রিয়াকেই প্রশ্ন করেন এভাবে:

তুমি কি তা' ভুলে গেছ?-কও ত আমায় প্রাণের গিরি,
কতই ভাল বাস্‌ত মোরে দাদা তোমার রাসবিহারী!
তোমার প্রেমের অতীত স্মৃতি প্রাণটি আমার আকুল করে
শিউলি ফুলের মধুর বাসে, তোমার কথা মনে পড়ে![২৬১]

এরপর আবার ফিরে গেছেন স্মৃতি রোমন্থনে। গিরিবালা স্নানের পরে দ্বিতলের বারান্দায় বসে চুল আঁচড়াতেন আর তাঁর পোষা ময়না পাখিকে চুমু দিতেন। দূর থেকে কবির সাথে চলতো

২৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭
২৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

খুনসুটি। আর ঈশ্বর ভাণ্ডারী ফুল নিয়ে আসতো। অতঃপর যখন সব জানাজানি হওয়ায় প্রিয়ার পিতা প্রিয়াকে নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন - ব্যকুল হৃদয়ে কবি পাগলপারা হয়ে গেলেন। প্রিয় বন্ধু 'চন্দ্র প্রকাশ' তখন কবিকে সান্ত্বনা দিতো। পরিশেষে ভালোবাসার উপর এলো কালবৈশাখীর ঝড়। বিয়ে হলো গিরিবালার। গিরিবালার অবহেলায় স্বামী হল ব্রহ্মচারী আর পিতা গেলেন কাশীধামে। এরপর আবার দেখা হলো ঈশ্বর ভাণ্ডারীর চেষ্টায়। কবির প্রাণ-প্রেয়সী তার বিরহের যন্ত্রণায় কঙ্কালসার হয়ে গেছে। তাঁর সোনার অঙ্গ মলিন হয়েছে - মলিন হয়নি শাশ্বত প্রেমের দেদীপ্যমান আলোকচ্ছটা। এরপর কবির সাথে প্রিয়ার কথা হলো। ক্ষণিকের এ মিলন কবি বিদৃত করেছেন এভাবে:

সন্ধ্যার পরে সবাই যখন চলে গেল আপন ঘরে
কবে এলে তুমি মোরে, জিজ্ঞাসিলে মধুর স্বরে,
"আজ এসেছি" ব'লেছিনু, হে'সে আমি মলিন হাসি,
সজল নেত্রে ছু'টে তখন, হাতটি আমার ধর্‌লে আসি!
মলিন মুখে কেঁদে কেঁদে, মাথা রে'খে আমার বুকে
বলেছিলে কতই কথা ক্ষণিকের সেই মিলন-সুখে![২৬২]

কবি প্রণয়ীকে দেওয়া প্রথম চুম্বনের মাদকতাপূর্ণ শিহরণ ভুলতে পারেননি। প্রথম চুম্বনের সুখ কবি হৃদয়কে সমৃদ্ধ করেছিলো - কবি এর তুল্য সুখ মর্ত জগতে আর খুঁজে পাননি। স্মৃতি কাতর কবি 'প্রণয়ের প্রথম চুম্বন' কবিতায় বলেন:

মনে কি পড়ে গো প্রিয়ে প্রথম চুম্বন!
যবে এলো থেলো কেশে
অর্ধ উলঙ্গিনী বেশে,
ক'রেছিলে তুমি মোরে স্নেহ-আলিঙ্গন!
মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন![২৬৩]

---

২৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

কবি মনে করেন প্রণয়ের প্রথম চুম্বন কোহিনূর মণির চেয়েও মূল্যবান। কবির ভাষায়:

সে চুম্বন-সেই হাসি-সে বক্র চাহনি!
পলকে মাতায় ধরা,
স্বর্গীয় পীযুষ ভরা
কি ছার তাহার কাছে কোহিনূর মণি?[২৬৪]

কবি তাঁর বাল্য প্রণয়ীকে বার বার স্মরণ করেছেন, না পাওয়ার বেদনা তাঁকে স্মৃতি কাতর করেছে। কবি দেশাচার আর ধর্মের ভিন্নতাকে দায়ী করেছেন। কবি বলেছেন:

স্বার্থপর দেশাচার ছেড়ে মোর কণ্ঠহার
পরায়ে দিয়েছে হায়
অপারের গলে।
তারি স্মৃতি বুকে ধরি, দিনরাত কেঁদে মরি
আর কি চাইব তারে
জীবনের ভুলে
কে দিল সে স্মৃতি আজ তু'লে?[২৬৫]

কবি তাঁর প্রিয়ার অন্তর্ধানে ব্যথিত মর্মাহত। কবি তাঁর প্রণয়ীকে খুঁজে ফিরেছেন আজীবন। কবি মর্মাহত হৃদয়ে বলে উঠেন:

এ সংসার-মরুস্থলে, আমারে একাকী ফেলে
সে আজি চলিয়া গেছে কোন্ দেশে হায়!
আমি একা পড়ে হেথা, বুকে নিয়ে শত ব্যথা
তার কথা ভেবে ভেবে অর্ধমৃত প্রায়
সে আজি কোথায়?[২৬৬]

---

২৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০
২৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১
২৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
২৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

স্মৃতিকাতর কবি মন থেকে প্রিয়াকে মুছে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। কেননা, প্রেয়সীর স্মৃতি না পাওয়ার বেদনা আরো বাড়িয়ে তোলে। কবি ব্যথাতুর হৃদয়ে বিস্মৃত হতে চান তার অতীত জীবন। কবির ভাষায়:

যাও, যাও, যাও-আর আসিও না,
অতীতের স্মৃতি-আর জাগা'য়ো না,
যাও, যাও, যাও, তুমি!
কেন এ'সে পুন: কাঁদাও আমারে,
ভাসাও দুঃখের আকুল পাথারে?
ক্ষমা কর প্রিয়ে!
আজি যাও তুমি![২৬৭]

কবি প্রেয়সীকে শেষ পর্যন্ত নিজের করে নিতে পারেননি। সত্যিকার ভালবাসা বিরহের যন্ত্রনায় পর্যবসিত হয়। প্রিয়া হারানোর ব্যথা-বেদনা কবি কোনদিন ভুলতে পারেননি - বিরহের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নির্মাণ করেছেন বিরহের পংক্তিমালা। কবি তার প্রিয়াকে হারিয়ে খুঁজে ফিরছেন - কোথায় তাঁর প্রিয়তমা, তাঁকে ছেড়ে কোথায় আছে সে? কবির ভাষায়:

কেউ দেখেছ কি তারে?
কণ্ঠে তাঁর ফুল-মালা হাতেতে বকুল-বালা
কুন্তলে গোলাপ গুচ্ছ
মুখে সুধা ঝরে।
অধরে চপলা হাসি উছলিছে রূপরাশি
কাহার ঘরনী সে যে
কোথা বাস করে।
কেউ দেখেছ কি তারে?[২৬৮]

২৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২
২৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১

কবি তার প্রিয়াকে ভালোবেসেছেন - দিয়েছেন সব উজাড় করে। কিন্তু প্রেয়সী তাঁর ছেড়ে গেছে তাঁকে। সারা জীবন কবি তারেই ভেবেছেন, তারেই খুঁজেছেন আর তার ব্যথাতুর হৃদয়ের রক্তক্ষরণ চোখের অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। কবি বলেন:

আমার যা ছিল, সবি দিয়াছিনু তারে গো,
সে আজি আমারে গেছে ফেলে!
সারাটি জীবন আমি, তারে ভেবে ভেবে গো,
ভাসিতেছি শোক-অশ্রু জলে!
কোথায় সে গেছে আজি, কোথা তারে পাই গো
কোথায় খুঁজিব আমি তারে!
আমি যে পাগল হয়ে খুঁজিয়া বেড়াই গো
জগতের প্রতি দ্বারে দ্বারে।[২৬৯]

কবি তাঁর প্রিয়াকে হারিয়েছেন। বেদনা বিধুর মন নিয়ে তিনি প্রিয়ার জন্য বিলাপ করেছেন। স্বার্থপর দেশাচার আর ধর্মের ভিন্নতা তাঁর আর প্রিয়ার মিলনে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যথাতুর হৃদয়ে কবি দেশাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। কবি বলেন:

স্বার্থপর দেশাচার ছেড়ে মোর কণ্ঠহার
পরায়ে দিয়েছে হায়
অপরের গলে।
তারি স্মৃতি বুকে ধরি, দিনরাত কেঁদে মরি
আর কি চাইব তারে
জীবনের ভুলে
কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে![২৭০]

২৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩
২৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

কবির অনুপস্থিতিতে গিরিবালা দেবী পরিবারের প্ররোচনায় অন্যের সাথে বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন। কবি প্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন শৈশব থেকে তাদের ভালোবাসা। কত স্মৃতি কত আশা। এ সব কি করে প্রিয়া ভুলে গেল। আশাহত কবি প্রিয়াকে করুণ স্বরে বলছেন:

বড় আশা ছিল মনে, আমার হইবে তুমি
পূর্ণ হবে আমার সে শৈশব-স্বপন!
আজি তুমি কোন্ প্রাণে, চলেছ পরের হ'তে
অতীতের সব স্মৃতি দিয়ে বিসর্জন![২৭১]

পরিশেষে কবি হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কবি অবুঝ প্রেয়সীকে বিদায় জানিয়ে ফিরে যাচ্ছেন আপন গন্তব্যে। প্রিয়ার ফেলে আসা স্মৃতিই তাঁর চির সাথী হিসেবে থাকবে সঙ্গী হয়ে। কবি বলেন:

এ জন্মের মত হায়, চির উদাসীন প্রায়,
চলিলাম আজি তব স্মৃতিটুকু নিয়ে!
আর ত হবে না দেখা, এই দেখা শেষ দেখা,
যাই তবে প্রাণময়ী বিদায়-বিদায়!
ভালবাসে যে যাহারে, সে কভু পায় না তারে
হৃদয় কাঁদিলে বল কি করিব হায়![২৭২]

কবি প্রিয়াকে মুখে বিদায় জানালেও মনে মনে আশা করেন প্রিয়া তাঁর ফিরে আসবে - ভালবাসবে আগের মতো। সেই সুন্দর দিনগুলো তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। কিন্তু প্রণয়ী তাঁর ফিরে আসে না - ভুলে যায় জনমের মতো। কবি বলেন:

সে বড় কঠিন, একবার
ফিরেও চাহেনা মোর পানে।
আকুল এ হৃদি, তারি তরে কাঁদে
চেয়ে আছি তারি পথ-পানে![২৭৩]

---

২৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩
২৭২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪
২৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪

কবির আক্ষেপ আরোও বেড়ে যায়। হতাশার সুরে কবি বলেন:

সাধের সে ভালোবাসা, প্রাণ ভরা প্রেম আশা,
সবি কি বিফলে যাবে তারে আর পাব না?
আমার এ ভাঙা প্রাণ, সে ক'রেছে খান্ খান্
চরণে দলিয় গেছে, ফিরেও সে দেখে না![২৭৪]

কবি ভেবেছিলেন প্রেয়সীকে ভুলে যাবেন। স্বস্তিতে থাকবেন। কোন চিন্তা ভাবনা থাকবে না। একাকী জীবন ভালোই থাকবেন তিনি। কিন্তু শত চেষ্টা করেও প্রিয়তমাকে ভুলতে পারছেন না। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মৃত্যুর মুখেও তাঁকে ভোলা সম্ভবপর নয়। কবির ভাষায়:

ভুলি ভুলি করি, ভুলিতে যে না'রি,
কি যাদু ক'রেছে সে আমায়!
শ্মশানে সে অন্তিম শয্যায়
ভুলিবনা সেই মুখ তার!
আঁধার জীবনে, বিমল জোছনা
অমৃত-ঝরণা সে আমার![২৭৫]

কবির হৃদয় অদৃশ্য অনলে দগ্ধ হতে থাকে। জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয় হৃদয়-মানস, তবুও প্রিয়াকে ভুলতে পারেন না। কবি নিজেই প্রশ্ন করেন কিভাবে তিনি প্রিয়াকে ভুলতে পারবেন। কবি বলেন:

আমার প্রাণের মাঝে যে অনল জ্বলে গো
কেমনে নিভাই আমি তারে!
ভুলি ভুলি করি আমি, ভুলিতে পারি না গো!
কেমনে ভুলিব আমি তারে![২৭৬]

---

২৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
২৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৪
২৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

প্রিয়াকে ভুলতে না পারার কারণ হচ্ছে - কবি প্রিয়াকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছেন। সেই ভালোবাসায় কোন খাদ নেই - নেই কোন কপটতা। প্রকৃত ভালোবাসা এমন যে, ভালোবাসার মানুষকে কখনও ভোলা যায় না। কবি প্রিয়াকে প্রাণের অধিক ভালোবেসে এখন আর তাঁকে ভুলতে পারছেন না। কবির ভাষায়:

সেই মুখ-সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি!
প্রাণের অধিক ভাল
বে'সেছিনু যারে!
কেমনে ভুলিব আমি তারে?[২৭৭]

কবি তাঁর প্রেয়সীকে ভুলতে পারেননি কিন্তু প্রিয়া কিভাবে কবিকে ভুলে গেলেন? কবির নিকট তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাই কবি প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চান কিভাবে তিনি তাঁকে ভুললেন। কবির ভাষায়:

প্রাণের অধিক হায়, ভালবাসে যে তোমায়?
কও প্রিয়ে তুমি তারে ভুলিলে কেমনে?
... ...
প্রাণে প্রাণে কত কথা, প্রাণে প্রাণে কত ব্যথা
বিচ্ছেদ মিলন কত এ-মরু জীবনে!
ভুলিলে কেমনে?[২৭৮]

কবি যখন বুঝলেন তিনি প্রিয়াকে ভুলতে পারছেন না, কিন্তু প্রিয়া অন্যের ঘরণী হয়ে ঠিকই তাকে ভুলে বসে আছেন। তিনি কখনও ভাবেননি তাঁর প্রিয়া এতো পাষাণময়ী হতে পারে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন:

নিঠুর কঠোর তুমি, হৃদি তব মরুভূমি
নাহি দয়া, নাহি মায়া গঠিত পাষাণে!
এক বিন্দু স্নেহ তায়, নাহি কোথা হায় হায়,
এক বিন্দু অশ্রুকণা নাহি সে পাষাণে!
ভুলিলে কেমনে?[২৭৯]

---

২৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১
২৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩

কবির প্রিয়া তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ায় এবং অবলীলায় তাঁকে ভুলে যাওয়ায় প্রিয়ার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কবি সংশয়ে পড়ে যান তাহলে কি প্রিয়া প্রেমের অভিনয় করে তাকে ফাঁকি দিয়েছে। অভিমানী কবি বলে উঠেন:

সবাই প্রিয়ারে চায় আমি করি 'হায় হায়'
আমার প্রিয়া কি শুধু করিবেই ছলনা!
তার কি হৃদয় নাই, দয়া নাই-মায়া নাই,
কেন তবে সে আমারে দেয় এত যাতনা।
সে বুঝি আমারে ভালবাসেনা![২৮০]

কবি হতাশার চরম পর্যায়ে পৌঁছে আরো বলেন:

তথাপি-তথাপি তুমি, পাষাণী পাষাণময়ী
নাহি দয়ামায়া।
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরল রাশি
প্রেমের জোছনা-মাঝে
বিষাদের ছায়া।[২৮১]

অতঃপর কবি প্রিয়াকে অভিযুক্ত করেছেন ছলনাময়ী হিসেবে। প্রিয়াকে ভর্ৎসনা করে কবি বলেন:

ভালবাসা দেখাইয়া ভুলা'লে আমায়,
ছলনা করিয়া শেষে বধিলে পরাণ!
উপরে লাবণ্য তব হলাহলে ঢাকা,
অধরে বিজলি-হাসি, সুধা-নির্ঝরিণী
নয়নে অমিয় রাশি কথা প্রেম-মাখা,
অন্তরে অনলভরা গরলের খনি![২৮২]

---

২৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩
২৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
২৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

প্রিয়ার প্রতি সন্দেহ, অভিযোগ, হতাশা ও অভিমান কবিকে সমগ্র নারী জাতির উপর আস্থাহীন করে তুলেছে। ক্ষুব্ধ হতাশ কবি নারী জাতির মধ্যে 'ছলনা' দেখতে পেয়েছেন। কবি বলেন:

জগতে কি সুখ নাই? প্রেম নাই-প্রীতি নাই,
নারীর হৃদয় ভরা কেবলি কি ছলনা?[২৮৩]

'প্রেমের সে স্মৃতি' কবিতায় কবি বলেন:

বুঝিলাম এ জগতে, কপট রমণী জাতি,
পাষাণে গঠিত হৃদি নাহি স্নেহ-কণা!
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরল রাশি,
দেবী বেশে যেন তারা সাক্ষাৎ ছলনা![২৮৪]

অতঃপর কবির ক্ষোভ যখন প্রশমিত হলো তখন প্রিয়ার প্রতি অভিমানী সুরে বললেন:

আসিও তখন? অভাগা যখন
মুদিবে নয়ন দু'টি
আকুল বাসনা যা'বে মুরছিয়া
চরণে পড়িবে লু'টি
আসিও তখন ছুটি![২৮৫]

কবির যখন রাগ কমে এলো, চৈতন্য ফিরে এলো তখন নিজেকেই প্রবোধ দিয়ে বলেন:

মিলনে কি সুখ বল
সে ত পুতিগন্ধ ভরা!
বিরহে পরম সুখ
পুলকে মাতায় ধরা![২৮৬]

---

২৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১
২৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩
২৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩
২৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩
২৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

কবি বলতে চান মিলনে নয় বিরহেই প্রেমের সুখ, মিলনে প্রেমের মর্যাদা বিনষ্ট হয়, টান কমে যায়। সংসার জীবনের টানা-পোড়েনে এক সময় ভালোবাসা হয়ে পড়ে ঠুনকো। জগত সংসারই হয়ে যায় গৌণ। এজন্য মিলনে নয় - বিরহেই ভালোবাসার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। কবির ভাষায়:

মিলনে ফুরায় সব
নাহি থাকে ভালবাসা,
বিরহে সবই বাড়ে
আকাঙ্ক্ষা, প্রাণের আশা।[২৮৭]

প্রেমিক কবি প্রেমের ক্ষেত্রে তার অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। কেন তিনি ভালবাসেন - সে কথাই তিনি বলেছেন। ভালো লাগে তাই ভালবাসেন। ভালবাসা ভালবাসার জন্য - পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রিয়াকে না পেলেও এমনকি প্রিয়ার ভালোবাসা না পেলেও কবির যায় আসে না। তিনি ভালোবাসেন তাঁর প্রিয়াকে। তাঁকে পেতেই হবে এমন কথা নয়। তিনি প্রেমিক, তার কাজ ভালোবাসা। কবি বলেন:

ভালবাসা পাব ব'লে
ভাল ত বাসিনে তারে!
চাইনে হৃদয় তার
আমি ভালবাসি যারে![২৮৮]

এক সময় কবি মান-অভিমান ও সব অভিযোগ ভুলে প্রেয়সীর পাশেই অবস্থান নেন। দায়িত্বানুভূতির সাথেই প্রিয়াকে সান্ত্বনা দেন। কবি আশ্বস্ত করেন তাঁর প্রাণ-প্রতিমাকে প্রাণের মিলন তাঁদের হয়েছে, পারলৌকিক জীবনে দেহের মিলনও হবে। কবির এ প্রত্যয় ফুটে উঠেছে নিম্নের পংক্তিমালায়:

প্রাণের মিলন আমাদের সই, হ'য়ে গেছে বহুদিন,
তুমি আমার-আমি তোমার, কেহইত নহে ভিন্!

---

২৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১
২৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

এ জগতে দৈহিক মিলন, হ'লনা প্রাণ তোমার সনে,
পর জন্মে হবে মিলন, গোলাপ ফুলের কুঞ্জবনে![২৮৯]

শাশ্বত প্রেমের বহ্নিশিখায় বিদগ্ধ কবি তাঁর আরাধ্য প্রতিমা প্রাণ-প্রেয়সীকে সকল অভিযোগ ও সন্দেহ থেকে মুক্তি দিয়ে বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছেন। তবে প্রিয়াকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দমে যায়নি। তিনি আশাবাদী - পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই তাদের মিলন হবে। কায়কোবাদ প্রেমিক কবি, সত্যিকার প্রেমিক কখনও আশাহত হয় না। তাই কবি আশাবাদী।

কায়কোবাদ কাব্যে কবির উত্তাল প্রেমের পরিচয় পাই। এখানে প্রেমের উন্মাতাল ঢেউ আছে, হৃদয়-মানসের মিলন আছে - আছে বিরহের তীব্র যন্ত্রণা। জীবন-সংসারের বাঁকে বাঁকে অসংখ্য মানব-মানবীর জীবনে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষরণ আমরা দেখতে পাই এ কাব্যে। এ কাব্য পাঠে বিরহের যন্ত্রণায় বিদগ্ধ কবির হৃদয়ের মতো পাঠকের হৃদয়ও পুড়ে ছারখার। ব্যথাতুর হৃদয়ের অব্যাহত রক্তক্ষরণ পাঠককে করে হত-বিহ্বল। আন্দোলিত করে হৃদয়-মানস। প্রিয়া হারানোর বেদনা আর লাঞ্ছনা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে পাঠকের হৃদয় ক্যানভাসে। অন্তরের গহীনের রক্তক্ষরণ অশ্রুজল হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

কায়কোবাদের প্রেমিক সত্ত্বার মূল্যায়ণে ফাতেমা কাওসারের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য:

> "কায়কোবাদের প্রেমে আবেগ আছে, বিরহের যন্ত্রণা আছে, কান্না ও হতাশা আছে কিন্তু অসংযম ও অনাচার নেই। বরং এক নৈতিক মূল্যবোধ, অন্তরের বিশ্বাসজাত প্রত্যাশা তাঁর প্রেমিক সত্ত্বাকে করেছে সুস্থির, সহনশীল, প্রত্যয়ী এবং আশাবাদী।"

---

২৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রকৃতির বিবরণ

কায়কোবাদ প্রকৃতি প্রেমী। নারীর প্রেমের মতো প্রকৃতি প্রেমও তাঁর কাব্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। কায়কোবাদ প্রকৃতির সন্তান। আগলা পূর্ব পাড়ার প্রকৃতির কোলে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। জন্মভূমির সবুজ বনানী, ইছামতি নদীর তীর ভাঙা ঢেউ, কর্মজীবনে উপভোগ্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কবিকে করেছে প্রকৃতি প্রেমী। ফুল, পাখি, নদী, সবুজ বনানী, নীলাকাশ আর মন মাতানো উন্মাতাল বাতাস কবিকে উতলা করেছে। প্রকৃতির নৈসর্গিক সৌন্দর্যে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। প্রিয়ার মতো প্রকৃতিকেও ভালোবেসেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যে অভিভূত কবি রচনা করেছেন বহু কবিতা। কখনও সরাসরি প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন আবার কখনও প্রিয়ার সৌন্দর্য রূপায়ণে প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রিয়ার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই কবি প্রিয়া আর প্রকৃতিকে একাকার করে ফেলেছেন। সোনার নলিনী, প্রেম সঙ্গীত, মান ভঞ্জনের একটি চুম্বন, প্রেমের স্মৃতি, বউ কথা কও, বনফুল প্রভৃতি কবিতায় প্রিয়ার সৌন্দর্য আর প্রকৃতি এক সাথে এসেছে। যেমন:

বিষাদিনী মূর্তি তার চোখ মুখ ভার ভার
অতৃপ্ত হৃদয় তার সদাই আকুল!
জানেনা চাতুরী ছল, আঁখি ভরা অশ্রু জল,
কিছুতেই তৃপ্তি নেই-প্রাণ ভরা ভুল।
সে যে বন-ফুল![২৯০]

কবি প্রকৃতির মাঝে তাঁর প্রিয়ার সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। 'সোনার নলিনী' কবিতায় প্রকৃতির মাঝে প্রিয়ার অপরূপ সৌন্দর্য এভাবে পেয়েছেন:

বেলীতে পেয়েছি তার দেহের সৌরভ,
গোলাপে মুখের গন্ধ, বিজলীতে হাসি!
চম্পকে দেহের বর্ণ অঙ্গের সৌরভ

২৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

অমৃতে অধর সুধা, চাঁদে রূপ রাশি!
কুরঙ্গ নয়নে ঘোর মাদকতা ভরা
তাহারি চক্ষের চারু চঞ্চল চাহনি!
মুহূর্ত হেরিলে যাহা মেতে উঠে ধরা,
কোকিলে মধুর কণ্ঠ সুধা নির্ঝরিণী।[২৯১]

কবি তাঁর প্রণয়ীর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে গ্রহণ করেছেন নদীর তীরের লতায় ঘেরা কুঞ্জবন। কবি বলেন:

নদীর ধারে বনের মাঝে লতায় ঘেরা কুঞ্জবনে,
থাকবো দোহে নিরিবিলি করতে প্রেমের আলাপন![২৯২]

কবি ভালোবাসেন প্রকৃতিকে, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে। তাই প্রিয়াকে প্রকৃতির সাথে একাকার করে দেখেন, তাঁকে সাজাতেন প্রকৃতির উপাদান দিয়ে। কবি বলেন:

এ'স আমার প্রাণ প্রেয়সী-এ'স আজি আমার বুকে,
ফুল্ বাগানের কুঞ্জে ব'সে, কোকিলগুলি তোমায় ডাকে!
ঊষা দেবী আঁচল দিয়ে, বাতাস করে তোমার গায়,
নিশীথিনী যাবার কালে, তোমার দেহের পরশ চায়!
তোমার লে'গে ফুল ফুটেছে, রাশি রাশি বাগান মাঝে
এ'স আমার ফুলের রাণি, সাজাব আজ ফুলের সাজে![২৯৩]

'মান ভঞ্জনের একটি চুম্বন' কবিতায় কবি তার প্রেয়সীকে এভাবেই প্রকৃতির সাজে সাজাতে চান। কবির ভাষায়:

মান ক'রনা প্রাণ প্রেয়সী,-মান ক'রনা প্রাণ আমার
আজকে তোমায় পরিয়ে দেব জুঁই চামেলী ফুলের হার!
এ'স এ'স প্রাণ প্রেয়সী, এ'স আমর হৃদয় মাঝে,
প্রাণ ভরি যে দেখ্ব তোমায়, সাজিয়ে আজ্ ফুলের সাঝে![২৯৪]

---

২৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০
২৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮
২৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭
২৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

কায়কোবাদ ঢাকায় অধ্যয়ন করার সময়ে প্রায়শই তিনি রমনার সবুজ প্রকৃতির মাঝে মিশে যেতেন, তন্ময় হয়ে থাকতেন। জন্মভূমি দর্শনে, কামিনী ফুল, বকুল বৃক্ষ দেখিয়া একটি ষোড়শীর উক্তি, নিশীথ ভ্রমণ, গোলাপ ফুল, সন্ধ্যা, শশীধর ও সৌদামিনী কবিতায় কবি প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। 'জন্মভূমি দর্শনে' কবিতায় কবি বলেন:

এই যে রে তরুপরে, ঘন পত্রচয়,
ইহাদের তলা দিয়া, শীতল পবন,
মন্দ মন্দ সঞ্চরিয়া মধুরতাময়
জুড়াইত পথিকের তৃষিত জীবন।
... ...
মাঝে মাঝে কুঞ্জবনে, গাছের তলায়;
চিত্রিত ধবল করী, কুরঙ্গ কেশরী;
বিমল কোমল চারু চাঁদের আভায়,
নাচিত সমীর সনে সন্‌সন্‌ করি।[২৯৫]

'নিশীথ ভ্রমণ' কবিতায় নীলাকাশে গ্রন্থিত নক্ষত্ররাজিকে কবি হীরার সঙ্গে তুলনা করে বলেন:

নিবিড় তমসাবৃত (নীরব অবনী)
নীলাকাশে তারামালা করে ঝলমল;
নিরখিলে বোধহয় সহসা অমনি,
হীরকে খচিত যেন কাল মক্‌মল।[২৯৬]

ফুলের প্রতি কবির অত্যধিক আকর্ষণ ছিল। তিনি ফুল ভালোবাসতেন। কবির প্রিয়াও তাঁকে প্রতিদিন ফুল পাঠাতেন। এতে কবি যারপর নাই আনন্দিত হতেন। ফুল নিয়ে কবি কবিতা রচনা করে এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরো তীব্র করেছেন। কবি বলেন:

ও ফুল্ল কামিনী ফুল কি সুন্দর তুমি,
তোমার সমান আর কি আছে ধরায়..
মোহিত করেছ বাসে এ কাননভূমি
নয়ন উজ্জ্বল কর রূপের ছটায়।[২৯৭]

২৯৫. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬২-৪৬৩
২৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭০

গোলাপ ফুলের প্রতি কার না আকর্ষণ নেই? কবি এ ফুল সম্পর্কে নিজের অনুভূতি প্রকাশে বলেন:

ও গোলাপ -
যে তোমারে একবার হেরিয়াছে নয়নে
ভুলিতে কি পারে কভু সে তাহার জীবনে?
মোহিনী মূরতি তোর আঁকিয়া রয়েছে ঘোর,
হৃদয়-পটেতে তার সমুজ্জ্বল বরণে
তাই তোরে নিরখিতে যায় ফুল কাননে।[২৯৮]

কবির বর্ণনায় যেমন ফুল এসেছে তেমনি পাখিও এসেছে। 'জাগরে' কবিতায় একটি পাখির রূপকে ভারতবর্ষের জনগণকে সচেতন করতে কবি সচেষ্ট হয়েছেন। 'সন্ধ্যা' কবিতায় কবি বলেন:

পাখীগণ ফুল্লমনে স্বকীয় কুলায়
যাইছে উড়িয়া ধীরে; করি কোলাহল
কেহ আসে, কেহ বসে, কেহ চলি যায়
কেহবা করিছে মরি কলকলকল।[২৯৯]

প্রেম ও প্রকৃতির কবি কায়কোবাদ ফুলকে খুব ভালবাসতেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যে ফুল সম্পর্কে বেশ কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। বনফুল, বেল ফুল, ফুল ও কলি এবং বাসি ফুল শিরোনামে কবিতা এ কাব্যে স্থান করে নিয়েছে। বেল ফুল কবিতায় কবি শুধুমাত্র 'বেল ফুল' নিয়েই ছিলেন না। এতে উঠে এসেছে চামেলী, সেওতী, মালতি, জুঁই, গোলাপ, ধুতুরা, কেতকী ও

---

২৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৯
২৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮২
২৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮২

টগরের কথা। কবি 'বেল ফুল'কে উচ্চসিত তরুণী ভেবে তার আর বাতাসের গোপন অভিসার চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। কবি বলেন:

মলয় সমীর এ'সে, চুপে চুপে কাছে ব'সে
চুমো খে'য়ে উর্ধ্বশ্বাসে উঠে দেয় দৌড়!
"আরনা - আরনা" বলে, হাসিয়া পরিস ঢ'লে
ছি ছি তুই প্রেম-মদে মাতোয়ারা ঘোর![৩০০]

বাতাসের সাথে বেল ফুলের অভিসার সবাই দেখে ফেলে। তাই কবি বেল ফুলকে নিয়ে আশংঙ্কা করছেন, ফুল সমাজের কেউ আর তাকে গ্রহণ করবে না। একাকী নিঃসঙ্গ জীবন তার অনিবার্য। এ ঘটনা দেখে আকাশের চাঁদ-তারা পর্যন্ত মিটি মিটি করে হাসছে। ফুল সমাজ লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আর ভ্রমর এমন কলঙ্কিনীর কাছে আসছে না এই ভয়ে যে পাছে যদি কিছু হয়। তাই কবি বেল ফুলকে ভর্ৎসনা করেন। কবি বলেন:

কেমনে কুসুম কুলে, কথা কবি মুখ তুলে,
কি লোভে পরিলি এই কলঙ্কেরি ডোর!
অমৃত পাইবি ব'লে, ঝাপ দিলি হলাহলে,
এ নহে-এ নহে প্রেম,-ব্যভিচার ঘোর!
আছিছি আছিছি বেলি লাজ নাই তোর![৩০১]

'বনফুল' কবিতায় কবি তার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা ভঙ্গিতে মনে হয় যেন সে কবির প্রণয়ী। যেমন:

সে যে বন-ফুল
না পরে ঢাকাই শাড়ি, বানারসী নীলাম্বরী
বাঁধে না কবরী,-তার এলোথেলো চুল!
সে যে বন-ফুল![৩০২]

---

৩০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬
৩০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

'ফুল ও কলি' এবং 'বাসি ফুল' কবিতায় কবি ফোটা ফুল থেকে ফুলের কলির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। আধ ফোঁটা ফুলের প্রতি কবির আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে এভাবে:

আধ ফুটো কলি অই কি মধুর হাসে!
রূপের কিরণে তার
ঝরে সুধা অনিবার
কি অমৃত সে মুখের সুরভি নিঃশ্বাসে।[৩০৩]

ফোঁটা ফুলে সরলতা ও প্রণয়ের গভীরতা পরিলক্ষিত হয় না। গোপন প্রেমিক বায়ু তাকে যে কতো চুমো খায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই কবি এর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন না। কবির ভাষায়:

যে ফুল ফুটিয়া গেছে কোন্ সুখ তায়
নাহি তাহে সরলতা,
প্রণয়ের গভীরতা
সমীর তাহারে নিয়ে কত চুমো খায়![৩০৪]

আধ ফোঁটা ফুল বা কলিকে কবি ভালোবাসেন। তার প্রতি কবির আকর্ষণ। এর মূল কারণ কলিকে বাঙালি বধূর মতো মনে হয়। আর এর মধ্যে রয়েছে অমৃত মধু। কবি বলেন:

ফুটা ফুলে কঠোরতা-কোমলতা নাই,
দেখিলে তাহার ভাব লাজে ম'রে যাই!
কলিতে কেবলি মধু, যেন বাঙ্গালীর বধূ,
সুধালে না কথা কয়,
লাজে পড়ে ঢালি!
ফুটা ফুলে মধু নেই - ভালবাসি কলি।[৩০৫]

---

৩০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০
৩০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫
৩০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪
৩০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

কবি ফুলে ও মুকুলে তার প্রিয়ার রূপ দেখতে পান। কবির ভাষায়:

নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাঁদে তার রূপ রাশি
তারি মুখ দেখি আমি
ফুলে ও মুকুলে![৩০৬]

কবি ফোঁটা ফুলের প্রতি এতো আগ্রহী না হলেও ফুলের মালার প্রতি তার যথেষ্ট দুর্বলতা লক্ষ্যণীয়। বেলী ফুলের মালা ছিল কবির খুবই প্রিয়। কবি পত্নী বেলী ফুলের মালা পড়তেন সে কথা তিনি কবিতায় বর্ণনা করেছেন:

দেহটি তার পড়ত নু'য়ে জুঁই চামেলী ফুলের ভারে!
কণ্ঠে দিলে বেলীর হার
ভাবত সে যে কতই ভার
পাষাণের ভার বুকে নিয়ে সে আছে আজ এই কবরে।[৩০৭]

কবি তার প্রিয়াকে ভুলতে পারেননি - ভুলতে পারেননি সেই চাঁদনি রাতকে। যে রাতে ফুলের মালা হাতে প্রিয়া এসেছিলো চুপি চুপি। চাঁদের মতো সুন্দর মুখে মধু মাখা হাসি হেসে আর বক্র চাহনির মোহনীয় রূপে প্রিয়া তার গলে দিয়েছিল ফুলের মালা। স্মৃতি কাতর কবি বলে উঠেন:

সেই যে চাঁদনী রাতি
সেই যে ফুলের মালা!
সেই মান অভিমান
প্রেমের অমিয় ঢালা!
সেই প্রেম, সে চাহনি
সেই গল্প মনোহরা।
সেই হাসি মধুমাখা
চাঁদের কৌমুদী ভরা![৩০৮]

---

৩০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২
৩০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

কবি ফুল যেমন ভালোবাসতেন তেমনি ভালোবাসতেন পাখিকে। 'অশ্রুমালা' কাব্যে পাখি ও পাখির কুজন আমরা দেখতে পাই। 'বিরহিনী রাধা', 'বউ কথা কও', 'প্রেম সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতায় পাখির সুমধুর গানের কথা বিদৃত হয়েছে। 'প্রেম সঙ্গীত' কবিতায় কবি তাঁর প্রণয়ীকেই পাখি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কবি পাখি রূপী প্রিয়াকে বলেন:

তোমার সে সুধা-তানে
ঝরিবে অমিয় ধারা!
দয়েলা কোয়েলা শামা
হইবে আপন হারা!
বাজিবে বীণার তারে
তব কণ্ঠ সুমধুর
পাপিয়া তাহারি মনে
দিয়া যাবে সদা সুর।[৩০৯]

'বিরহিনী রাধা' কবিতায় কোকিলের পঞ্চম স্বরে প্রিয়া হারানোর বেদনা প্রতিভাত হয়েছে। যদিও এ সুরের সাথে সাথে মোহিত সৌরভে ফুল ফুটে উঠেছে। আকাশে সূর্য হেসে উঠে আলো বিকিরণ করছে আর পত্রে পত্রে ফুলে ফলে সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কবি বলেন:

কেন লো তমালে সই কোকিলা কুজিছে অই
পঞ্চমে তুলিয়া কুহু তান!
কেন লো কুসুম রাজি, ফুটিয়া উঠিল আজি
মোহিত সৌরভে জগ-প্রাণ!
কেন লো গগনে শশী, হাসিছে অমিয় হাসি
ছড়াইয়া কিরণ মাধুরী!
পত্রে পত্রে ফুল ফলে, সে কিরণ ঝল মলে,
প্রকৃতির প্রেম খেলা মরি![৩১০]

---

৩০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১
৩০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

‘বউ কথা কও’ পাখির ডাকে কবি বিরহী হৃদয়ের সাক্ষাত পান। পাখির বেদনা বিধুর সুরে কবির বেদনা একাকার হয়ে উঠে। কবিও বিরহী পাখির দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠেন। কবি বলেন:

এমন মধুর স্বরে কে গায় ও স্বজনি
প্রকৃতির প্রাণে সুধা ঢালিয়া!
কি ব্যথা উহার প্রাণে জাগে দিবা রজনী,
থেকে থেকে কেন উঠে কাঁদিয়া!
... ...
এমনি মধুর স্বরে সে গাইত স্বজনি
আমি শুনিতাম প্রাণ ভরিয়া
মধুর চাঁদনীময়ী মধুমাখা যামিনী
নীরবে যাইত সখি বহিয়া![৩১১]

কবি কুল কুল স্বরে বয়ে যাওয়া নদীর প্রসঙ্গও এনেছেন তার কাব্যে। প্রিয় জন্মভূমির সৌন্দর্যের অন্যতম অনুষঙ্গ এই তটিনীর তীরে বসে প্রিয়ার ভাবনায় কত দিন তিনি কাটিয়েছেন। নদীর তরঙ্গ কবিকে ব্যকুল করেছে। প্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালিয়েছে তাঁর কিশোর হৃদয়কে। কবি বলেন:

চন্দ্রমার স্নিগ্ধ করে তরঙ্গিনী-জল,
খেলিতে কি মনোহর চঞ্চল লহরী!
... ...
প্রকৃতির এত শোভা নিরখি নয়নে,
মুগ্ধ প্রাণে বসি এই তটিনী-সৈকতে
শৈশবের কত কথা ভাবিতাম মনে,
হেরিতাম কত দৃশ্য জীবনের পথে![৩১২]

---

৩১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯
৩১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮
৩১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

নদীর তীরে অবস্থিত ফুলের বাগান থেকে ফুল এনে মালা গাঁথিয়া কবি তার বাল্য প্রণয়ী গিরিবালাকে দিয়েছেন। সে কথাই কবি স্মরণ করেছেন এভাবে:

অই পুষ্প বনে পুষ্প করিয়া চয়ন
কত দিন কত মালা গাঁথিয়াছি হায়।
কত দিন মুগ্ধ প্রাণে করিয়া যতন
দিয়াছি সে মালা এক ক্ষুদ্র বালিকায়![৩১৩]

'কারে ভালবাসি' কবিতায় আবহমান বাংলার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলা মায়ের প্রকৃষ্ট চিত্র তুলে ধরতে কবি সচেষ্ট হয়েছেন। অসাধারণ এ কবিতায় কবি বলেন:

নবীন বসন্ত যবে কোকিলের কণ্ঠ-রবে
হয় আত্মহারা ফুটে ফুল রাশি রাশি!
ধরণী শ্যামল বেশে, সাজে কি মধুর হে'সে
গোলাপের মুখে ফুটে কি মধুর হাসি!
চম্পক অনূঢ়া বালা, মালতি মতিয়া বেলা
অলির কুহকে ভু'লে পরে প্রেম-ফাঁসি
কমল না খুলে মুখ, আবরে সোনালি বুক
লাজে ভয়ে জড়সড় কেতকী ষোড়শী!-[৩১৪]

কবি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য কখনও ভুলতে পারেননি। প্রিয় গ্রামের অসাধারণ সৌন্দর্য নিয়ে 'অশ্রুমালা' কাব্যে গ্রন্থিত করেছেন 'আগলা গ্রাম' কবিতা। কবি তাঁর প্রিয় গ্রামের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

ঐ গ্রামে মোর জন্মভূমি
দেখলে জুড়ায় আঁখি!
গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়
কত রঙের পাখী!

---

৩১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯
৩১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

পার্শ্বে তার শ্যামল মাঠ
তৃণ শস্যে ভরা!
গ্রামের মাঝে কত বাড়ি
আম কাঁঠালে ঘেরা![৩১৫]

কবি প্রিয় জন্মভূমির অপার সৌন্দর্যে বিমোহিত। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বহতা নদী ইছামতি কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে। নদী তীরে সবুজ বনানী। গ্রামটিও আচ্ছাদিত সবুজ বনানীর চাদরে। কত জাতের গাছ-গাছালি। ফল-ফলাদির গাছের কোন অভাব নেই। বাড়ি ঘরে চারপাশে নানান জাতের ফুলের গাছ। গাছে গাছে গানে নিমগ্ন সুকণ্ঠী পাখি। পল্লী মায়ের অমন কোলে শুধু শান্তি আর শান্তি। তাই কবি শহরের কোলাহলে নয়, নিষ্প্রাণ পাথুরে জীবনে নয় বরং তিনি চলে যেতে চান প্রিয় জন্মভূমির কোলে। কবি সেখানে নির্জনে নিভৃতে থাকতেই পছন্দ করেন। মৃত্যুর পর তার সমাধি যেন হয় প্রিয় আগলা গ্রামের প্রকৃতির মাঝে কবির এই ইচ্ছাই ছিল। কবি বলেন:

পল্লী মায়ের বুকে ছিনু
কত শান্তি সুখে!
কোথায় সে শান্তি মোর
আজি দুঃখে দুঃখে!
আজো মনে পড়ে সেই
প্রিয় জন্মভূমি!
কত দিনে তার বুকে
ঘুমাইব আমি![৩১৬]

৩১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
৩১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেম ও জাতীয় জাগরণ

কায়কোবাদ প্রেমিক কবি। নারীর প্রেম তাঁর সমগ্র কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সাথে দেশ প্রেমও যুক্ত হয়েছে। তদানীন্তন পরাধীন ভারতবর্ষের পরাধীনতা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। 'কুসুম কানন' কাব্যে কবির স্বদেশ ভাবনা প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। "ভারতের বর্তমান অবস্থা দর্শনে কোন এক বঙ্গ মহিলার বিলাপ" কবিতায় কবির স্বদেশ ভাবনা লক্ষ্যণীয়। পরাধীনতাকে কবি এক মুহূর্তের জন্যও গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না, কবি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে আসতে বঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন:

ধিক্ সে পামরগণে শত শত ধিক্,
দেশের লাগিয়া যেই, না দেয় জীবন
তার সম এ জগতে পাতকী অধিক,
আছে কি আছে কি আর? বঙ্গবাসীগণ![৩১৭]

কবি জন্মভূমিকে মা সম্বোধন করেছেন। ভারত মাতার দুঃখ বেদনার সমব্যথি কবি বলেন,

মা তোমার!
সেই কান্তি সেই সুখ, কালের কবলে,
এ জন্মের মত হায়, হয়েছে পতন!
স্মরিলে এখন তাহা, চিত্ত-সিন্ধু-জলে,
উথলিয়া উঠে দুঃখ তরঙ্গ ভীষণ![৩১৮]

কবি জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রিয় স্বদেশবাসীকে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারত সন্তানগণ বীর পুরুষ কিন্তু তারা আজ ঘুমন্ত। তারা ভুলে গেছে তাঁদের ঐতিহ্য - শৌর্য, বীর্য

৩১৭. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৬২-৪৬৩
৩১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৩

আর সাহসিকতা। কবি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনতে ভারত সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলেন:

ভারত সন্ততি কোথা রে এখন?
তোদের কি আর নাই রে শোণিত
ধিক রে বাঙালি, কাপুরুষ ভীত
জননীর দুঃখ নিরখি নয়নে,
কিছুই কি খেদ নাহি হয় মনে?
কত কাল রবে ঘুমাইয়ে আর!
কত কাল সবে অধীনতা ভার?[৩১৯]

গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য ভুলে পরাধীনতা মেনে নেওয়ায় বাঙালি জাতিকে কবি ভর্ৎসনা করেছেন। তিরস্কার করে জাতিকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কবি বলেন:

ধিক রে বাঙালি অধম কাঙালি
পামর পিশাচ মাখি অঙ্গে ছালি
মর যেয়ে ডুবে যমুনা জীবনে
তোদের সমান ভারত-ভুবনে
হেন কাপুরুষ কে আছে কোথায়
মজালি ভারত তোরাই তো হায়
তোরাই মজালি আর্যদের নাম
তোরাই ডুবালি আর্য-গুণগ্রাম
জনমের তরে কলঙ্ক পাথারে।[৩২০]

৩১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭
৩২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৭

কবি জন্মভূমিকে ভালবাসতেন। ব্যাপক অর্থে তাঁর জন্মভূমি ভারতবর্ষ। পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নও তিনি দেখতেন। 'অশ্রুমালা' কাব্যের 'অচেনা পথিক' কবিতার মাধ্যমে সুকৌশলে ভারতবাসীকে স্বাধীনতার দিকে তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন।[৩২১]

ইংরেজ বেনিয়াদের বিষাক্ত ছোবলে ভারত মাতার আকাশ বাতাস তখন দূষিত, ভারতবাসী দিশেহারা। পরাধীনতার অর্গল ভেঙে মুক্তি আর স্বাধীনতার লাল সূর্যটা ছিনিয়ে আনতে কবি বলে উঠেন:

খুলে দে দ্বারের খিল
কত ডাক্ ডাকি হা রে,
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে!
উপরে গর্জ্জিছে বজ্র,
ভূমি নাদে "কড় কড়"
পদতলে গর্জ্জে সিন্ধু,
প্রাণ কাঁপে থর থর!
তাহে কত বিষধর
আসিছে বিস্তারি ফণা!
বারেক দংশিলে আর বাঁচিব না![৩২২]

দুঃখিনী ভারত মাতার সন্তানেরা তখন ঘুমে অচেতন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে তাদের কোন কার্যকর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। ঘুমন্ত জাতিকে কবি জাগ্রত করতে সচেষ্ট হন। কবি ঘুমন্ত জাতির দুয়ারে আঘাত হেনে স্বাধীনতার মন্ত্রে তাদের উজ্জীবিত করতে থাকেন। কবি বলেন:

পথিক ডাকিছে দ্বারে
কত আর রবি ঘুমে?

---

৩২১. এম.এ. মজিদ (সম্পাদিত) *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৩২২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

খুলে দেয় দ্বারের খিল্
ডাকিতে যে পারি না রে!
অচেনা পথিক আমি
এসেছি তোদের দ্বারে![৩২৩]

কায়কোবাদ যে যুগে কলম ধরেছিলেন তখন মুসলিম জাতির উপর নেমে এসেছিল ঘোর অমানিশা। রাজ্য হারানো মুসলিম জাতি নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। মুসলিম সমাজ তখন ভেঙে যায় যায় অবস্থা। কায়কোবাদ তখন ফিরে তাঁকিয়েছেন অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর দিকে - জাতীয় জাগরণে নির্মাণ করেছেন কবিতার পঙক্তিমালা। তাঁর এসব কবিতায় স্বসমাজের পুনরুজ্জীবনের সুর বেজে উঠেছিল। মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন:

সবাই জে'গেছে বিশ্বে কেহই ত নাহি আর ঘুমে,
শুধু কি' একাই তুমি রহিবে পড়িয়া এই ভূমে?
আলস্য জড়তা ত্যাজি বিভু নাম স্মরি নিজ মনে,
এস হে মোস্লেম এস আজি এই মহা শুভক্ষণে,
ভু'লে যাও হিংসা দ্বেষ দলাদলি শত্রুতা ভীষণ,
মোস্লেম-জগতে আজি বিশ্বব্যাপী মহা সম্মিলন!
আজি বিধাতার শুভ আশীর্বাদ লয়ে শির'পরে
এস হে মোস্লেম এস মিলনের এ মহা প্রান্তরে![৩২৪]

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলতার পরাজয় ঘটেনি, পরাজয় ঘটেছে বাংলার মানুষের, সমগ্র ভারতবর্ষের। পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয় কায়কোবাদের কবি মানসকে ব্যথিত করেছে। কবি বলেছেন:

এই সে সমাধি-গৃহ? এই স্থানে হায়

৩২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
৩২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩০

বঙ্গের গৌরব-সূর্য চির অস্তমিত!
এই স্থানে,-কি বলিব বুক ফে'টে যায়,
স্মরিলে সে কথা প্রাণ হয় আকুলিত![৩২৫]

কবি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে লিখেছেন 'মোস্লেম শ্মশান', 'আবাহন' ও 'দিল্লী' শিরোনামে কবিতা। এসব কবিতায় ভারতে প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনে স্বজাতির দুঃখ-বেদনা আর ভারত মাতার স্বাধীনতা বিপন্নের কান্না অনুরণিত হয়েছে। কবি চলে গেছেন অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সোনালী সময়ে - মুসলিম রাজন্যবর্গের শান-শওকত, নর্তকীর ঝংকারে রূপালী সন্ধ্যা, বীর সৈনিকদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠছে। শাহী মসজিদে রমজান মাসের তারাবীর নামাযের কুরআন তিলাওয়াত আর সুমধুর আযানের ধ্বনি যেন কবির কানে এখনো বাজে সুধার মতো। কবি বলেন:

তারাবীর সুধাস্বরে মধুর আজানে,
কোরানের পূণ্য শ্লোকে ললিত ঝঙ্কারে -
কত সুধা ঢে'লে দিত মোস্লেমের প্রাণে
আজি তা' কোথায়, জিজ্ঞাসিব কারে?[৩২৬]

মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর শান-শওকত আজ আর নেই। আছে শুধু গৌরব গাঁথা ইতিহাস। কবি হৃদয় হারানো ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে জাতীয় জাগরণের দোয়েল পাখি হয়ে ডাকছেন স্বসমাজের ঘুমন্ত মানুষকে। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছেন, তাদের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত ছিল, একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ছিল, ছিল অনাবিল সুখ-শান্তি আর আনন্দের ফল্গুধারা। আজ সব শ্মশানে পরিণত হয়েছে - শুধুই আছে ইতিহাস।

কবি বলেন:

কত যোদ্ধা-কত সৈন্য-কত মহাবীর
অই স্থানে হায় হায় রয়েছে পড়িয়া!
কত কবি-কত রাজা-পণ্ডিত সুধীর

---

৩২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০
৩২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬

অই ধূলাবালি সনে গিয়াছে মিশিয়া!
কত যে প্রেমিক, আর কত প্রণয়িনী
আছে হেথা সংসারের সুখ দুঃখ ভুলি!
কত শত্রু-কত মিত্র-কত দীন ধনী
রহিয়াছে একসঙ্গে করি কোলাকুলি[৩২৭]

কবি মুসলিম জাতির পতনের বর্তমান দৃশ্য অবলোকনে মর্মাহত। রাজধানী দিল্লীর দীনহীন অবস্থা পর্যবেক্ষণে কবির হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। দুঃখ আর বেদনার পাহাড় তাঁর উপর চেপে বসে। তিনি তাঁর এ দুঃখ-বেদনা পাঠকের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চান - জাগাতে চান ঘুমে কাতর সমাজকে। কবি বলেন:

সে দৃশ্য দেখিলে প্রাণে কি গভীর ক্লেশ
ইচ্ছা হয় এ পরাণ দেই লুটাইয়া!
প্রাচীন কীর্ত্তির সেই ভগ্ন-অবশেষ,
এখনো নীরবে হায় রয়েছে পড়িয়া!
হা অদৃষ্ট, ভাবি নাই এ পাপ জীবনে,
বিধিবে হৃদয়ে মোর এ তীক্ষ্ণ কৃপাণ!
ব্যথায় অস্থির আমি, দেখিনু স্বপনে
যমুনা-সৈকতে অই 'মোস্লেম-শ্মশান'।[৩২৮]

কবির পূর্ব পুরুষেরা এক সময় দিল্লীর রাজ প্রাসাদে অবস্থান করতেন। পূর্ব পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লী নগরী তথা মুসলিম জাতির অধঃপতনে কবি দিশেহারা। বেদনা বিধুর হৃদয়ে কবি স্মরণ করছেন দিল্লীর অতীত শান-শওকত। কবির ভাষায়:

ছিলে তুমি ভারতের চারু রাজধানী,
কে ছিল তোমার সম? ঝলসি নয়ন
শোভিত তোমার শিরে, কোহিনূর মণি,
স্তম্ভিত তোমার বীর্যে সমগ্র ভুবন!

---

৩২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭
৩২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

দিবানিশি এক ভাবে প্রমোদ-সাগরে
রহিতে ডুবিয়া, মুখে ধরিত না হাসি।
আজি কেন ম্লান-মুখে বিষন্ন অন্তরে?
চাঁপিয়া রে'খেছ বুকে কি অনল রাশি?[৩২৯]

ভারতবর্ষের তদানীন্তন মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কবি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ অবস্থা তাঁর অশান্ত হৃদয়কে আরো ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পতন ঠেকাতে মুসলিম সমাজ কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নিয়ে কাপুরুষের মতো পরাভব মেনে দীনহীন জীবন-যাপন করছে। কবির ব্যথিত হৃদয় বলে উঠলো:

ভারতে মোস্‌লেম নাহি কেহ আর,
সে রাজ্যের যারা ছিল কর্ণধার!
বহুদিন তারা গিয়াছে মরে!
ভারত এখন মরুভু সমান,
কেবলি সমাধি; কেবলি শ্মশান,
হেরিলে সে দৃশ্য ফেটে যায় প্রাণ![৩৩০]

কবি এহেন অবস্থায় মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করতে চান। ঘুমের আর সময় নেই। সবাই জেগে গেছে, এগিয়ে যাচ্ছে রণে। পিছিয়ে আছে শুধু মুসলিম জাতি। স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার তীব্রতা তাকে সামনের দিকে আহ্বান করতে বাধ্য করেছে। তিনি রাজ্যহারা, নির্যাতিত মুসলিম সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

এস হে মোশ্লেম এস কত আর ঘুমাইবে তুমি,
অই তব কর্ম-ক্ষেত্র জগতের মহা রঙ্গ ভূমি!
সবাই জে'গেছে বিশ্বে কেহই ত নাহি আর ঘুমে,
... ...
আজি বিধাতার শুভ আশীর্বাদ লয়ে শির'পরে
এস হে মোশ্লেম এস মিলনের এ মহা প্রান্তরে![৩৩১]

---

৩২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬
৩৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানব প্রেম

কায়কোবাদ দেশকে ভালবাসতেন। স্বদেশ ভাবনা তাঁর কবি মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশ-মাতৃকার আযাদীর জন্য তিনি কলমকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবি দেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন। ভালোবেসেছেন বিশ্ব-মানবতাকে। মানবপ্রেম কবির হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। কবি মানব সমাজের সমতার পক্ষে কথা বলেছেন। মানুষের মর্যাদা সমান সে ধনী হোক অথবা গরীব হোক। কবি এ প্রসঙ্গে বলেন:

কেন হে ধনীন! তুমি ধনের গৌরবে,
করিতেছ হেয় জ্ঞান, স্বজাতীয় সবে?
আবরিয়ে দেহ তুমি, বিচিত্র বসনে,
কেন বৃথা গর্ব কর সকলের সনে?[৩৩২]

কবি মানব সেবাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেছেন। এটি দায়িত্ব বলেও তিনি মনে করেন। মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ কবি বলেন:

বিবেক-নয়ন মেলি দেখ বন্ধু-গণ!
কি করিবে তব এই প্রবালরতন।
অতএব ধর বাক্য-ত্যাজি অহঙ্কার
প্রাণপণে সকলের কর উপকার।[৩৩৩]

কবি যেমন স্বসমাজের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তেমনি অন্য সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসার কমতি ছিল না। নিপীড়িত, দীনহীন মানুষের পক্ষে তিনি কলম তুলে নিয়েছেন। মর্তের সন্তানদের তিনি নিজের সমাজের অংশই মনে করতেন। তার এ মনোভাবকে আমরা মানব

---

৩৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০
৩৩২. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭২
৩৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩

প্রেম বলতে পারি। রাজা ও ভিখারিনী, সংসার, ত্রিধারা, মানব জন্ম, অন্ধ ভিখারিনী, কর্মফল, সাকী প্রভৃতি কবিতায় কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। কবি বলেন:

হাসিয়া উঠুক ধরা
দূরে যা'ক জ্বরা মরা,
স্বর্গ ও মরতে যেন নাহি থাকে দূর!
ভু'লে গিয়ে আত্মপর
ধন-রত্ন বাড়ী ঘর

বলি দিয়া পরার্থে সে স্বার্থের অসুর![৩৩৪]

কবি দীন-দুঃখীর দুঃখ অনুভব করতেন। দরিদ্রের অধিকার সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। আত্মীয়, প্রতিবেশী ও দেশের সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠতো। কবিতায় এসব মানুষের কথা তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে:

প্রতিবেশী আত্মীয়ের দেশবাসী দরিদ্রের
সাধ্য মত উপকার
ক'র সদা তুমি!
মানব জীবন হায়, নিশার স্বপন প্রায়
পশ্চাতে থাকিবে প'ড়ে
তব কর্ম্ম-ভূমি![৩৩৫]

অনাথ শিশু এবং যারা রাস্তায় জন্ম নিয়ে 'পথ শিশু' আখ্যা পেয়ে সেখানেই অবস্থান করছে তাদের জন্য কবির অফুরান ভালোবাসা। কবি তাদের কথা কবিতায় তুলে ধরে বলেন:

পিতৃ মাতৃহীন শিশু, যাহাদের কেহ নাই
পথে ঘাটে প'ড়ে কাঁদে
অনাহারে থাকি?
তাদেরে আদর ক'রে খে'তে দিও পেট ভরে
হাত বুলাইয়া শিরে
কাছে এ'নে ডাকি![৩৩৬]

---

৩৩৪. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৩৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

কবি অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন বিচিত্র মানব সংসারকে - তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষে মানুষে কত ব্যবধান। কেউ মহা সুখে অট্টালিকা পরে আর কেহ পথ ধারে। কোন দুঃখিনীর সংসারে এসে অবুঝ শিশু দুঃখ বেদনার জীবনকে বরণ করে নেয়। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কত সুখ কত আনন্দ আর কত তামাশা। কিন্তু অনাথ দরিদ্র শিশুর 'অশ্রুজল' ছাড়া আর কিইবা আছে। কবি অনাথ শিশুদের নিজের শিশুই ভেবেছেন। তাদের কল্যাণে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে দারিদ্র্যকে দোষারোপ করেছেন ব্যথিত কবি বিক্ষত হৃদয় থেকে রক্ত ঝরিয়েছেন যা কবিতার পঙক্তিমালায় প্রকাশ পেয়েছে। কবি বলেছেন:

আজি মহাপর্ব হায় প্রতি ঘরে ঘরে
আনন্দের কোলাহল, বাদ্যের নিক্কণ।
ভাসিতেছে বঙ্গ আজি সুখের সাগরে,
নব বস্ত্রে সুসজ্জিত নরনারীগণ!
অভাগা শিশুটি মোর বসি একাধারে
অই যে রে কাঁদিতেছে মলিন বদনে;[৩৩৭]

কবি অনাথ অসহায় পথশিশুদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে ব্যথা-বেদনায় মর্মাহত হয়েছেন। তাঁদের অধিকার নিয়ে ভেবেছেন। কবিতায় তাদের দুঃখ বেদনা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'অন্ধ ভিখারিনী' কবিতায় অন্ধ ভিখারিনী ও তার অবুঝ সন্তানদের দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরেছেন। আর্তমানবতার কল্যাণে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি করতে কবি বলে উঠেন:

অন্ধ ভিখারিণী, শিশুগুলি নিয়ে
বসিয়ে পথের ধারে!
শীর্ণ দেহ খানি রুক্ষ বিমলিন
নিতি নিতি অনাহারে!
নাহি বাড়ী ঘর সাথের দোসর
পথেই পড়িয়া থাকে!
এত কষ্ট ক'রে থাকে পথে প'ড়ে
কেউ না জিজ্ঞাসে তাকে![৩৩৮]

---

৩৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫
৩৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪

স্বার্থপর সমাজ ব্যবস্থায় সবল সর্বদা দুর্বলের উপর শোষণের খড়্গ-কৃপাণ চালায়। নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ আর বঞ্চনার শিকার অবহেলিত দুর্বল দরিদ্র দীনহীন মানুষেরা। 'অন্ধ ভিখারিনী' কবিতায় কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষেরা খড়্গ-কৃপাণ হয়ে উপস্থিত হয় রাজবর্মধারী এক কনস্টেবল। সাহেব রুষ্ট হবে ভেবে ধর্মধারী তাড়িয়ে দেয় ভিখারিনী ও তার শিশুদের। অন্ধ ভিখারিনী অবহেলিত দরিদ্র ও শোষিত মানুষের স্বরে মানুষের সমঅধিকার তাকে শুনিয়ে দেয়। কবি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন শোষক শ্রেণির ক্ষমতার লোভ আর নির্যাতনের উপাখ্যান। শোষিত আর্তমানবতার পক্ষে অবস্থান নিয়ে কবি 'ভিখারিনী' মাধ্যমে মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়:

অন্ধ ভিখারিনী কহিল কাঁদিয়া
কি দোষ ক'রেছি আমি!
কেন এ জুলুম দুঃখিনীর প্রতি
কর আজি বাবা তুমি?
যেই দেশের তুমি নিয়াছ জনম
আমারো জনম সেথা!
এক দেশবাসী, তুমি আর আমি
কেন তবে দেও ব্যথা?
তুমিও মানুষ আমিও মানুষ
একই বিধাতার সৃষ্টি!
কেন তবে বাবা, আমাদের প্রতি,
কর এ অনল-বৃষ্টি?[৩৩৯]

কায়কোবাদ প্রেমের কবি। মানবতার কবি। তিনি আজীবন মানবতার জয়গান গেয়েছেন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের আবহমান অসঙ্গতি, শ্রেণি বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের অন্যায় অত্যাচার,

---

৩৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮
৩৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য কবি হৃদয়কে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। কবি মনে করেন মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। সকল মানুষের মান-মর্যাদা ও অধিকার সমান। কবির ভাষায়:

যে ঈশ্বর গড়িয়াছে তোমারে রাজন,
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে অই ভিখারিণী
যে ঈশ্বর গড়িয়াছে সমুদ্র ভীষণ
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে মহা মরুভূমি!
ক্ষুদ্র বালু কণা হ'তে হিমাদ্রী শিখর,
অথবা সমুদ্র-তলে জীব ক্ষুদ্র প্রাণ
সকলেরি স্রষ্টা তিনি দয়ার সাগর,
ছোট বড় তার কাছে সকলি সমান![৩৪০]

বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ কবি মানতেন না। রাজায়-প্রজায় তথা শাসক আর শাসিতের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখেননি। তাই তিনি মনে করেন, সম্পদ ও ক্ষমতার দাপটে অহঙ্কার কারো সাজে না। কবি বলেন:

তার এ ভাণ্ডারে আছে যে সব রতন,
সে সকলে সকলেরি সম অধিকার!
রাজায় প্রজায় নাহি প্রভেদ কখন,
তবে কেন মোহবশে এত অহঙ্কার?[৩৪১]

মানব জীবনে উত্থান আছে পতনও আছে। সুদিন কারো চিরকাল থাকে না আবার দুর্দিনও চিরস্থায়ী হয় না। দু'দিনের এ সংসারে অর্থ আর বিত্তের জৌলুসে গর্ব ও অহঙ্কারে মত্ত হয়ে অপরের প্রতি অবিচার অত্যাচার করা উচিৎ নয়। কবি যথার্থই বলেছেন:

আপনি মানব হ'য়ে অপর মানবে
নৃশংসের প্রায় কেন দলিছ চরণে!
ধনের গৌরব তব কত দিন রবে?

---

৩৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
৩৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

চিরকাল বেঁচে তুমি রবে কি ভুবনে?
আজি যে তোমার ধারে দু'টি অন্ন তরে
জঘন্য দাসত্ব বৃত্তি করেছে গ্রহণ,
সংসারের আবর্তনে কিছুদিন পরে
হতে পারে সে তোমার প্রভু শ্রেষ্ঠতম![৩৪২]

'রাজা ও ভিখারিনী' কবিতায় কবি সাম্যের জয় গান গেয়েছেন। বিত্তের পাহাড় সম তফাৎ থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পর সকলি সমান, লাশের কোন আলাদা চিহ্ন নেই। কোন লাশ ধনীর কোন লাশ দরিদ্রের তা অনুমান করা সম্ভব নয়। কবির ভাষায়:

উভয়ের মৃত দেহ রাখিলে শ্মশানে,
কে চিনিবে তুমি রাজা, সে যে ভিখারিণী?
রাজার কি চিহ্ন বল থাকিবে সেখানে,
কে চিনিবে সে দরিদ্র, তুমি মহাধনী?
তোমার সে চিতা-ভস্ম শ্মশান শয্যায়,
মিশে যাবে ভিখারীর চিতা-ভস্ম সনে!
উভয়ের এক গতি ধনী ব'লে হায়
রবেনা পার্থক্য কিছু সে মহা প্রাঙ্গণে![৩৪৩]

কবি মানব সেবায় পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করতে চান। কবি বিশ্বাস করতেন মানব কল্যাণ ব্যতীত মানব জন্মের স্বার্থকতা থাকতে পারে না। কারো সাহায্য করতে না পারলেও অন্তত ক্ষতি না করা - এটাই ছিল কবির নীতি। কাউকে কষ্ট দেওয়া অনুচিৎ এবং অপরাধের শামিল। কবি বলেন:

অতএব কারু তুমি ভাঙিও না মন
মস্‌জিদের মত তিনি ক'রেছে নির্মাণ!
কারু প্রতি অত্যাচার ক'রনা কখন
মন ও মস্‌জিদ ভাঙা উভয় সমান।[৩৪৪]

---

৩৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩
৩৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

কবির বিশ্বাস সমাজের শতধা সমস্যা, অসঙ্গতি, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অসাম্য আর নিপীড়ন সবি মানুষের তৈরি। স্বার্থপর মানুষ বুঝে আবার কখনও না বুঝে সামাজিক অসাম্যের সৃষ্টি করে থাকে। অসাম্য ও বৈষম্য দূরীকরণে কবি মানবতার গান গেয়েছেন। মানুষের উপকার করাই মানুষের ধর্ম। মানব সেবাই মানব জাতির সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম। মানব জীবনের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। মানুষ যদি কর্মতৎপর হয়, সত্য পথের অনুসারী হয়, মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত থাকে, তবেই মানব জীবন স্বার্থকতা লাভ করবে।

কবি কায়কোবাদ মানুষের কল্যাণকামীতায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। মানব সেবাকে তিনি মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

অতএব ধর বাক্য - ত্যাজি অহঙ্কার
প্রাণপণে সকলের কর উপকার।
পরম ধরম - ধন করহ সঞ্চয়,
থাকিতে থাকিতে ত্বরা থাকিতে সময়।[৩৪৫]

মানুষের উপকার করতে না পারলে, অপকার করতে নেই। অন্যের অনিষ্ট করা পাপ বৈ কিছুই নয়। আবার পরোপকার করতে যেয়ে যেন অন্যায় - অপরাধকারীকে প্রশ্রয় দেয়া না হয়। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

পরের অনিষ্ট - চেষ্টা মহাপাপ ভবে,
পর উপকার ধর্ম, কিন্তু তাই বলি
দুষ্টরে প্রশ্রয় দিতে শাস্ত্রে নাহি বলে।
দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন
ইহাই শাস্ত্রের বিধি।[৩৪৬]

সাধারণভাবে মানুষ মনে করে সুখ হচ্ছে অর্থবিত্ত আর ক্ষমতায়, কিন্তু প্রকৃত সুখ সম্পদ ও ক্ষমতায় পাওয়া যায় না, প্রকৃত সুখ হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে

---

৩৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০
৩৪৫. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩
৩৪৬. *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬০

পরের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারলে সুখী হওয়া যায়। এ সম্পর্কে কবির উপলব্দি নিম্নের পঙ্‌ক্তিতে উদ্ধৃত হয়েছে। কবি বলেন:

ধনরত্ন সুখৈশর্য্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই
"আমিত্ব"কে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবাধ।
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু- ঘুচালে পরের ব্যথা।[৩৪৭]

নিজেকে যারা পরের জন্য বিলিয়ে দিতে পারবে তারাই সুখ পাবে - সুখী মানুষের অভিধায় অভিহিত হবে। কবি বলেন-

আপনাকে বিলাইয়া দীন দু:খীদের মাঝে,
বিদুরিলে পর দু:খ সকালে বিকালে সাঁঝে!,
তবেই পাইবে সুখ আত্মায় ভিতরে তুমি,
যা রুপিবে - তাই পাবে, এ সংসার কর্মভূমি![৩৪৮]

৩৪৭. আবুল ফজল, ভূমিকা, *কাব্য সংকলন: কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৩৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা

আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষের নারীরা অবহেলিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত। কবি মায়ের জাতির প্রতি ভালোবাসা ও দরদ নিয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। কবি স্বামীর অবহেলায় স্ত্রীর ব্যথাতুর হৃদয়ের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

যে অবধি প্রিয় সখি, বিবাহ হয়েছে লো,
নিঠুর স্বামীর সহ মরি,
সে অবধি একদিন সুখ না পাইনু লো
এ পোড়া জনম কাল ভরি।
সে অবধি নাহি জানি, শয়নে স্বপনে লো,
পতিবা কাহারে সই বলে,
সে অবধি সারা নিশি, কাঁদিয়া কাঁদিয় লো
বিছানা ভিজাই আঁখি জলে।[৩৪৯]

কবি নিপীড়িত নারী জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

যদি কেহ নাহি মজে, আমিই মজিব;
আমিই মনের সাধে সঙ্গীত গাইব;
বলীয়ান বীর সাজি নাশিয়ে বিপক্ষরাজি
ভারত ললনাগণে স্বাধীন করিব
নতুবা এ পণ মম জীবন ত্যাজিব।[৩৫০]

৩৪৯. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৮-৫০৯
৩৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুনিয়া বিমুখতা

কবি মনে করেন সংসার জীবনের মায়া শুধুই ফাঁকি। জীবন ও জগতের কুহক মায়ার বন্ধনে আষ্টে পিষ্টে আবদ্ধ থেকে পরপারের পাথেয় সংগ্রহ হয়ে উঠে না। অথচ একটা সময় এমন আসে, যখন জগত সংসারের সকল মানুষ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কবি এ কথাই নিম্নোক্ত পংক্তিতে বিদৃত করেছেন:

এ সংসার মরুময়
কেউ যে কাহারো নয়,
ভাই-বন্ধু-মাতা-পিতা
সবি যে রে ফাঁকি।
ছেলে মেয়ে পরিবার
সবি মিথ্যা - কে কাহার?
স্বার্থ স্বার্থ ব'লি সবে
করে হাঁকা-হাঁকি![৩৫১]

কবি পাঠক সমাজকে অবহেলা আর অলসতায় সত্য-সুন্দর মানব জীবন ধ্বংস না করে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মানব জন্মকে কবি দুর্লভ মনে করেন। এ জীবন মহামূল্যবান - সুতরাং এটি নষ্ট না করে ভালো কাজে ব্যয় করে একে মহীয়ান করে তোলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কবি বলেন:

মানব জীবন ভাই শুধু কিরে ফাঁকি?
পাপের কুহকে ভুলি কুড়ায়ে পথের ধূলি
নিও না, মাথায় তুলি
স্বর্ণ ফে'লে রাখি!
দুর্ল্লভ মানব জন্ম হেলায় ক'রনা নষ্ট
একবার দেখ চে'য়ে
খুলে জ্ঞান আঁখি![৩৫২]

---

৩৫১. এম. এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

কবি মনে করেন 'আমার আমার' বলতে কিছু নেই। পার্থিব দুনিয়া তুচ্ছ বিষয়। মূল সম্পদ হলো পরকালের পাথেয়। কতটুকু তা সংগৃহীত হয়েছে সেটিই বিবেচ্য বিষয়। ষড়রিপুর ফাঁদে পড়ে পারলৌকিক জীবনের পাথেয় ধ্বংস করার কোন মানে হয় না। কবির ভাষায়:

আসিয়া ভবের হাটে, কি সওদা কিনেছ তুমি?
একে একে সবগুলি
ভেবে দেখ ভাই!
'আমার আমার' বলি, ঝগড়া করিলে কত
কি ছিল তোমার আগে?-
-কি এখন নাই!
ছয়টি দস্যুর মেলা সবি হেথা জুয়া খেলা
এদের ফাঁকিতে প'ড়ে
বিপথে যাবে কি?[৩৫৩]

কবি মনে করেন জগৎ সংসারের স্নেহ-ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-সাধ সবই মরীচিকা। কারণ ক্ষণিকের এ জীবনের লয় অনিবার্য। মরণ নামক মহাসত্যের অমোঘ থাবা থেকে কেউ মুক্তি পাবে না। তাই মিথ্যে মায়া মরীচিকার পেছনে না ছুটে মহাসত্য তথা খোদার পথেই চলা বাঞ্ছনীয়। কবি বলেন:

এ ক্ষুদ্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা,
জান না কি এ জগৎ নিশার স্বপন!
মায়া-মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা,
জীবনের পাছে অই র'য়েছে মরণ!
হে পান্থ হেথায় শুধু আঁধারের স্তর;
মৃত্যুর উপরে মৃত্যু-মৃত্যু তার পর।[৩৫৪]

---

৩৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪
৩৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭
৩৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

নবম পরিচ্ছেদ

শোক গাঁথা

কায়কোবাদের কাব্যে বৈচিত্র্যধর্মী বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। এর মধ্যে মর্সিয়্যা বা শোকগাঁথা রয়েছে কয়েকটি। শোকসঙ্গীত, সিরাজ-সমাধি, পিসীমা আমার ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এ শ্রেণির কবিতা। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় কবির ব্যথাতুর হৃদয়ের হুতাসন আমরা এসব কবিতায় লক্ষ্য করেছি। কবির পিসীমার প্রয়াণে কবি হৃদয়ের হাহাকার জ্বলন্ত অগ্নি রূপে ফুটে উঠেছে। কবি বলেছেন:

পিসীমা আমার!
কোথায় গেলি গো তুই ত্যাজিয়া আমারে!
হায়রে এ হৃদি তলে
ভীষণ অনল জ্বেলে
ডুবাইয়ে এ পরাণ ঘোর হাহাকারে![৩৫৫]

বঙ্গ সমাজের বিধবা নারীদের অভিভাবক সুহৃদ পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কবি হৃদয় ব্যকুল হয়েছে। জাতির অপূরণীয় ক্ষতি অনুধাবন করে কবির প্রিয় হারা ব্যথাতুর হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কবির দীর্ঘশ্বাস কবিতার পঙক্তিমালায় প্রকাশ হয়েছে। যেমন:

যে ক্ষতি হইল আজি,-যুগ যুগান্তরে
পূরিবে কি পূরিবে না, - পূরিবে না আর![৩৫৬]

শোক সঙ্গীত কবিতায় দুঃখিনী মায়ের সন্তান বিয়োগের করুণ বিলাপ রূপায়িত হয়েছে সুন্দরভাবে। কবির ভাষায়:

কোথা গেলি ওরে বাছা নয়নের মণি,
অকালে কাঁদা'য়ে আজি অভাগিনী মায়!
তোর শোকে অবসন্ন নিখিল ধরণী
গভীর রোদন-ধ্বনি চারদিকে হায়।[৩৫৭]

---

৩৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪
৩৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রেণিহীন কবিতা

কায়কোবাদের গীতি কাব্যে এমন কিছু কবিতা রয়েছে যেগুলোকে কোন শ্রেণিভুক্ত করা যায় না। এর মধ্যে স্মৃতিলিপি, একবর্ষ, বঙ্গ ভাষার প্রতি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গ ভাষার প্রতি কবিতাটি কাব্যগ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত। মুসলিম সমাজের পর্ব নিয়ে এ কাব্যে দু'টি কবিতা স্থান পেয়েছে - 'ঈদ আবাহন' ও 'শবে কদর'। এ দু'টি কবিতাকে ব্যাপকার্থে ঈশ্বরানুরাগ বা ধর্মানুভূতিমূলক কবিতা বলা যেতে পারে। ঈদ আবাহন কবিতাটি যতটুকু ধর্মানুভূতির তার চেয়ে বেশি মুসলিম জাতি সত্তার ঐতিহ্য চেতনা ও জাগরণের। ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে কবির আহ্বানই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কবি বলেছেন:

ভুলিয়া কর্তব্য কর্ম পতিত হয়েছ তুমি ভবে,
আসিয়াছে 'ঈদ' তাই জাগাইতে আজি তোমা সবে!
বিসর্জিয়া চিরতরে রাশি রাশি অতুল বৈভব,
ভুলে গেছ হা মোশ্লেম, তোমার সে জাতীয় গৌরব![৩৫৮]

কায়কোবাদ তাঁর কবি-প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বত্র কোন একটি বিষয়ে তিনি থিতো হয়ে যাননি। তার কাব্যে সমাবেশ ঘটেছে বৈচিত্রের। প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা কবি হৃদয়কে অনুরণিত করেছে - তিনি বিচিত্র বিষয়ে সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ সব কবিতা। তাঁর কাব্যে বহু বিচিত্র বিষয় স্থান করে নিয়েছে। এ কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতার কাব্যমান প্রশংসনীয়। কবির গভীর অন্তর দৃষ্টি, ও ঐকান্তিকতা প্রায় কবিতাতেই প্রতিফলিত হয়েছে।

---

৩৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪
৩৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

চতুর্থ অধ্যায়

কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার

প্রথম পরিচ্ছেদঃ আরবী শব্দের ব্যবহার পরিচিতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দ

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্যাংশ

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্য

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ কায়কোবাদের সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারের নমুনা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

আরবী শব্দের ব্যবহার পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। সেই মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর অনন্য কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে আরবী শব্দ ব্যবহার করেন।[৩৫৯] পরবর্তীতে প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার অব্যাহত রাখেন। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে জনজীবনের বহুল ব্যবহৃত আরবী শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একদল কবি-সাহিত্যিক আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করলেও সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যকসহ বাংলা সাহিত্যের প্রথিতসশা কবি-সাহিত্যিকগণ আরবী-ফার্সী শব্দ তাঁদের কাব্যে ও সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবিগণ আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার উপেক্ষা করতে পারেননি।

কায়কোবাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে দোভাষী পুঁথি থেকে বাঙালি মুসলমানের কাব্য সাধনাকে শুদ্ধ বাংলার দিকে ধাবিত করা। এ কাজে তিনি সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঊনিশ শতকের মুসলমান কবিদের মধ্যে যাদের নাম অগ্রগণ্য তাঁরা হলেন, কায়কোবাদ (১৮৮০-১৯৫৬), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ও সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬)। এরা তিনজনই শুদ্ধ বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন। মোজাম্মেল হকের (১৮৬০-১৯৩৩) 'জাতীয় মঙ্গল' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে। আর সৈয়দ এমদাদ আলীর 'ডালি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে।[৩৬০] আর কায়কোবাদের 'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। আর 'অশ্রুমালা' প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই সুধী মহলে এর সাড়া পড়ে যায়। এ হিসেবে মুসলিম সমাজে শুদ্ধ বাংলায় কাব্য রচনার রাহবার কবি কায়কোবাদই।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আরবী-ফারসী শব্দের সার্থক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী মোহিতলাল মজুমদার

---

৩৫৯. কাজী রফিকুল হক, *আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দি উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭ খ্রি.), পৃ.৫

৩৬০. আবুল ফজল, ভূমিকা, *কাব্য সংকলন: কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

(১৮৮৮-১৯৫২) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) কথা বলা হলেও কায়কোবাদকেও আমরা উভয়ের সাথে যুক্ত করার পক্ষপাতী। কেননা কায়কোবাদ তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'মহাশ্মশান' কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি মহাকাব্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারকারী। এর আগে আর কেউ মহাকাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেনি। এ ক্ষেত্রে গবেষক কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ... প্রথম বারের মতো মহাকাব্যে স্থান দিয়েছেন কায়কোবাদই। মহাকাব্যে - সাধারণ কবিতাতেও এসব শব্দ ব্যবহার সেদিন ছিল অকল্পনীয়। তবে সাধারণভাবে কায়কোবাদের ভাষা আরবি-ফারসি শব্দবহুল নয়, পরিমার্জিত বাংলা ভাষা। উত্তরকালে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটান, তার পূর্বসূরী হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদারকেই মূল্যায়িত করা হয়। এখন থেকে কায়কোবাদের নামও উচ্চারিত হওয়া উচিত।[৩৬১]

৩৬১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, ভূমিকাংশ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী শব্দ

নিম্নে কায়কোবাদ কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার প্রদত্ত হলো:

কায়কোবাদ ব্যবহৃত আরবী শব্দ	প্রকৃত আরবী শব্দ	সঠিক বাংলা উচ্চারণ	অর্থ	কবিতায় ব্যবহারের প্রেক্ষাপট	তথ্যসূত্র
অছুল[৩৬২]	أصول	উসুল	নিয়ম-নীতি	আব্দুল কাদির জিলানীর প্রাত্যহিক কার্যাবলীর বিবরণ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৩
অলী[৩৬৩]	ولى	ওলি	অভিভাবক	ওলি আউলিয়াদের কথা	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২০১
আওলিয়া[৩৬৪]	أولياء	আউলিয়া	অভিভাবকগণ	ওলি আউলিয়াদের কথা।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২৩১
আল্লা[৩৬৫]	الله	আল্লাহ	মহান আল্লাহ তা'আলা	আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশার্থে।	মহাশ্মশান, (ঢাকা স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭ খ্রি. পৃ. ৬৮

৩৬২. প্রদানিত সকলেরে, প্রত্যেক দিবস
পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে করিত তফসির
কুরানের, শিক্ষা দিত হাদীস অছুল

৩৬৩. মাতৃগর্ভজাত অলী, ধর্মের আলোকে
উদ্ভাসিত করেছিল সমগ্র ধরণী।

৩৬৪. বড় সাধু পবিত্রাত্মা পরবর্তীকালে
হয়েছিল আওলিয়া এবং অধিকাশ
ছাত্র মহাজ্ঞানী বলে' লভেছিল খ্যাতি

৩৬৫. স্থাপিয়া ধর্ম্মরাজ্য "আল্লা আল্লা" রবে
কাঁপাইয়া স্বর্গ মর্ত্য, সে ভীষণ স্বর
আজিও ধ্বনিত সেই নীলনদ নীরে।

আলেম[৩৬৬]	عالم	আলিম	বিদ্বান	আব্দুল কাদির জিলানীর নিকট আলিমগণের আগমন।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২০৭
আরব[৩৬৭]	عرب	আরব	আরবের লোক / আরব ভূমি / আরব জাতি	সম্মানার্থে।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৯৭
আরাফা[৩৬৮]	عرفة	আরাফা	আরাফাতের মাঠ	আরাফাতের মাঠে অলৌকিক ঘটনা।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২০৩
আরবী[৩৬৯]	عربى	আরবী	আরবী ভাষা	আব্দুল কাদির জিলানীর বিদ্যান্বেষণ।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১০
আজান [৩৭০]	أذان	আযান	আহ্বান, আযান, ইসলামী পরিভাষা	আব্দুল কাদির জিলানীর বিদ্যান্বেষণ।	মহাশ্মশান, পৃ. ৬৮

৩৬৬. নিশিদিন; বিদ্যা-শিক্ষা, জ্ঞান আলোচনা
হইত যেখানে নিত্য; আলেম সমাজে
ফেকাহ্ ও হাদীস আর কোরানের ব্যাখ্যা

৩৬৭. আরব সরাই অই পল্লী মনোহর
কালের কঠোর অস্ত্রে শ্মশান ভীষণ!

৩৬৮ . একদিন হৃষ্ট মনে আরাফা দিবসে
আসিয়া প্রান্তর মাঝে একটি বৃষের
পশ্চাতে করিল তাড়া, মানুষের মত

৩৬৯. আরবী সাহিত্য ফেকা দর্শন-বিজ্ঞান
বুৎপত্তি করি লাভ পাইলেন তিনি

৩৭০ . আজিও আজান-শব্দে, কোরানের শ্লোকে
ধ্বনিত সে মহাদেশ, প্রচণ্ড রুশিয়া
কাঁপিয়া উঠিত যার ভ্রূকুটি দর্শনে
দুর্বর সজারু প্রায়।

আজমী[৩৭১]	عجمى	আ'যমী	অনারব	জনৈক অনারবের প্রতিজ্ঞা।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১১
আযম[৩৭২]	أعظم	আ'যম	শ্রেষ্ঠতম, সুমহান মহত্তর	আব্দুল কাদির জিলানীর সহচর্য।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২০৩
আমির[৩৭৩]	أمير	আমীর	শাসনকর্তা, নেতা, সম্রাট, ধনাঢ্য ব্যক্তি, যুবরাজ	মুসলিম নেতৃবৃন্দের মর্যাদা।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৫৮
আদালত[৩৭৪]	عدالة	আদালত	বিচার,ন্যায় বিচার, ন্যায়পরায়নতা	বিচার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫
আয়েত[৩৭৫]	أية	আয়াত	কুরআনের আয়াত, নিদর্শন	আব্দুল কাদির জিলানীর বিদ্যা শিক্ষাদান।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১০
ইশ্লাম ইস্লাম[৩৭৬]	إسلام	ইসলাম	হযরত মুহাম্মদ (স.) প্রবর্তিত	ইসলামের সুমহান আদর্শ বর্ণনার	মহাশ্মশান, পৃ. . ৬৪/৭০/৭৫

৩৭১. একদা আজমী এক করেছিল মনে
এ প্রতিজ্ঞা, যদ্যপি সে অন্য লোকাপেক্ষা
অত্যল্প কালের জন্য নাহি পার হ'তে
নিমগ্ন এ বিশ্বপতি ঈশ এবাদতে

৩৭২. সহচর্যে থাকিয়া সে গওছল আযম
আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি সাধিতে

৩৭৩. আমির ওমরাহ আর দেশীয় নৃপতি
লভিত আসন স্ব স্ব পদ অনুসারে,

৩৭৪. মোক্‌বুলের আজি তার হইবে বিচারে
আদালত গৃহ আজি লোকে লোকারণ্য,
সমস্ত গৃহটি আজি গিয়াছে ভরিয়া
লোক সমাগমে,– সবে নিরব নিশ্চয়।

৩৭৫. পঠিত মোস্লেম সবে ছিল বুঝাইতে
একটি একটি করি প্রতি আয়েতের

৩৭৬. আবার কাঁপাও বিশ্ব; উড়াও গগণে

ইসলাম			ধর্ম, আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।	জন্য।	
ইমামা[৩৭৭]	يامة	ইয়ামামা	জর্ডানের ইয়ারমুক শহরের একটি স্থানের নাম	ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের সৌর্যবীর্য।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২
ইহুদি[৩৭৮]	يهودي	ইয়াহুদী	মুসা (আ,)-এর কথিত অনুসারী।	বসরা নগরীর সৌন্দর্যের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩৪
ঈমান[৩৭৯]	إيمان	ঈমান	ঈমান এখানে ইসলাম অর্থে ব্যবহার হয়েছে	ঈমানের গুরুত্ব।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩৮
ঈদ[৩৮০]	عيد	ঈদ	মুসলিম উৎসব পর্ব,	ঈদের মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে।	কায়কোবাদ রচনাবলী: শিব মন্দির, (ঢাকা:

ইস্লামের 'অর্দ্ধ চন্দ্র' পতাকা সুন্দর।

৩৭৭ . মোস্লেম সেনানীবৃন্দ এরমুক সমরে,
যে বীর্য দেখায়েছিল মনে কি তা পড়ে?
মুতা ও ইমামা যুদ্ধে মুসলমান্‌গণ্
করেছিল কি ভীষণ কালান্তক রণ।

৩৭৮. কোথাবা পথের ধারে আরব ইহুদি
বালক বালিকা কত খেলিছে আনন্দে
লুকোচুরি দ্রাক্ষাকুঞ্জে - বকুল বিতানে।

৩৭৯. ঈমানের পঞ্চ অঙ্গ - কলেমা নমাজ
হজ্ব ও জাকাত রোজা; এ মহা সৌধের
স্তম্ভ-ভিত্তি একমাত্র পবিত্র ঈমান।

৩৮০. এ ঈদ কি শুধু
নিরর্থক আসে ভবে? - ভ্রমান্ধ মানব
না বুঝিয়া ভাসে শুধু আনন্দ-সলিলে!

			মুসলমানদের খুশির উৎসব। মুসলিম পরিভাষা।		বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭১
উকিল[৩৮১]	وكيل	ওয়াকীল	আইনজীবি, আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি	বিচার কাজের বর্ণনা। বিচার কাজের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪২৩
উম্মিয়া[৩৮২]	امية	উমাইয়া	কুরাইশ বংশের একটি গোত্র / বনু উমাইয়া, উমাইয়া বংশ।	আমীর মু'আবিয়া (রা.) এর পরামর্শ সভায় তাঁর নিজের উক্তি।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৬৪
এতিম[৩৮৩]	يتيم	ইয়াতিম	অনাথ	ইয়াতিমের দুঃখ-বেদনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ২০৬
এবাদত[৩৮৪]	عبادة	ইবাদত	উপাসনা	আব্দুল কাদির জিলানীর প্রজ্ঞা।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১১

৩৮১. পক্ষে তার সমর্থিতে
ব্যারিষ্টার তিন জন এসেছে এখানে
একটি সাহেব আর দুজন বাঙ্গালী,
দুজন উকিল, বহু আত্মীয়স্বজন।

৩৮২. হাসেম বংশের সনে উম্মিয়া বংশের
চির শত্রুতার ভাব; বিদূরিত তাহা
হজরত মহাম্মদ ভগ্নীরে আমার
বেঁধেছিলা সুপবিত্র বিবাহ-বন্ধনে।

৩৮৩. আমার হৃদয় মাঝে বহে প্রেম তটনী!
আর্তের বেদনা ভার
এতিমের হাহাকার
বিপন্নের অশ্রুধার দেখি আমি যখনি।

৩৮৪. কাবাকে কভু জনশূন্য করে
সপ্তবার পরিক্রম করিলে উহারে
তাহার সে অঙ্গীকার হইবে পালিত;
কেননা তখন কেহ পারিবে না আর
অইরূপ এবাদত করিতে খোদার।

এরাক[৩৮৫]	العراق	ইরাক	ইরাক, মধ্যপ্রাচ্যের একটি আরব রাষ্ট্র।	মু'আবিয়া (রা.) এর বিরূদ্ধে ইরাকবাসীর বিদ্রোহ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২০-২১
এমাম[৩৮৬]	إمام	ইমাম	মসজিদে যিনি নামাযের ইমামতি করেন / ধর্মীয় নেতা / মুসলিম শাসক।	ইমাম হাসান (রা.)	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৯
এললেল্লাহ [৩৮৭]	إلا الله	ইল্লাল্লাহ	আল্লাহ ব্যতীত (কোন উপাস্য নাই)	আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪০
ওজু[৩৮৮]	وضوء	ওদু	অযু	হাসান (রা.) এ মৃত্যুর সময়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৫৩
ওক্ত[৩৮৯]	وقت	ওয়াক্ত	সময়	নামাজের সময়	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৪৩

৩৮৫. বীরশ্রেষ্ঠ কয়েসের মৃত্যুর সংবাদে
সমস্ত এরাকবাসী সৈনিক আমার
হয়েছে বিদ্রোহী।

৩৮৬. শুনি এ বিপদবার্তা এমাম হাসান
প্রস্তরের মূর্তি প্রায় নির্বাক নিশ্চল
রহিলা বসিয়া তথা।

৩৮৭. উঠিলা বলিয়া জোরে বজ্রের নির্ঘোষে
মেঘ মন্দ্রে 'এল্‌লেল্লা,- জাল্লে জালালুহু'

৩৮৮. পানান্তে হাসান উঠি ভক্তিপূর্ণ হৃদে
ঈশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলা
ওজু করি, প্রাণ যেন দেহটি ছাড়িয়া
চলি গেল কোন্ দেশে খোদার উদ্দেশ্যে!

৩৮৯. ধর্মকে জড়িয়া ধর সকলেই দুহাতে,
পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়, সবে মিলি জমাতে।

ওহোদ[৩৯০]	أهود	ওহুদ	ওহুদ পাহাড়	শহীদদের স্মরণে।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩২২
কদর[৩৯১]	قدر	কদর	নিয়তি, ভাগ্য	খোদার আদেশ মানা।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২৩৬
কলম[৩৯২]	قلم	কলম	লেখনী কলম, লিপি।	কলমের শক্তি।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৬৪
কলেমা[৩৯৩]	كلمة	কালিমা	পবিত্র কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"	পবিত্র কালেমার মহিমা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৫০
কানুন[৩৯৪]	قانون	কানুন	বিধি-বিধান	ইসলামী আইন প্রসঙ্গে।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২২৪
কোরান[৩৯৫]	قرآن	কুরআন	মহাগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ।	পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরিণাম।	মহাশ্মশান,ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭খ্রি. পৃ. ২৮৩

---

৩৯০. ওহোদ বদর যুদ্ধ করেছিল যারা,
আজি কি ধরার বক্ষে বেঁচে আছে তারা,

৩৯১. কাজা এবং কদরের বশ্যতায়-অর্থাৎ
স্বীকৃতিতে মানবমন্ডলী কাছে হও
তুমি মৃতবৎ, আল্লার আদেশ সব
করিয়া পালন অকুণ্ঠিত চিত্তে সদা,

৩৯২. মানুষ দেখিলে কাছে, মুখখানি ভার করে,
যেন কোন বিদ্যানিধি কলমে আগুন ঝরে।

৩৯৩. অতঃপর মক্‌বুল কলেমা পড়িয়া
ফাঁসীর সে রজ্জুখানি নিলা তুলি হাতে,
ডোম্‌কে সে নিষেধিলা না ছুঁইতে তারে।

৩৯৪. হে মানব, ধর্মের সে আইনকানুন
অবনত শিরে তুমি মেনে নেও সবি

৩৯৫. হইলা রঞ্জিত সেই পবিত্র কোরান
আসনের পার্শ্বদেশে ছিল যা' রক্ষিত।

কাবা[৩৯৬]	كعبة	কা'বা	মক্কা নগরীতে অবস্থিত পবিত্র কা'বা গৃহ।	মক্কা নগরীর বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৮৩
কওসর[৩৯৭]	كوثر	কাওসার	বেহেশতি শরবত হাশরের মাঠে বেহেশতীদের পানীয়, বেহেস্তের একটি নহর।	হোসাইন (রা.) - এর স্বপ্ন।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২৬
কাজা[৩৯৮]	قاضة	কাজা	ফয়সালা	আল্লাহর আদেশ পালন।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২৩৬
কাজী[৩৯৯]	قاضى	কাজী	বিচারক	মোক্তাজালি আমারাল্লা কর্তৃক অত্যাচারী পাপী ওফ এয়িহাবে কাজী পদে নিয়োগ।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১৭
কালাম[৪০০]	كلام	কালাম	ধর্মতত্ত্ব	কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন প্রসঙ্গ।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২৫৩

৩৯৬. যে মক্কায় "কাবা" নামে উপাসনা-গৃহ
গ'ড়েছিলা এব্রাহিম পরম যতনে
সঙ্গে ল'য়ে আপনার পুত্র ইস্‌মাইলে

৩৯৭. মাতামহ অগ্নিপূর্ণ হাসরের মাঠে
প্রদানিয়া স্নিগ্ধতর "আবে কওসর"
দারুণ পিপাসা এর করিবে বারণ।

৩৯৮. কাজা এবং কদরের বশ্যতায়-অর্থাৎ
স্বীকৃতিতে মানবমন্ডলী কাছে হও
তুমি মৃতবৎ, আল্লার আদেশ সব
করিয়া পালন অকুণ্ঠিত চিত্তে সদা,

৩৯৯. মোক্তাজালি আমরাল্লা* করিলে নিযুক্ত (* বোগদাদের খলিফা)
ঘোর অত্যাচারী পাপী ওফ এয়িহাবে* কাজী পদে, (* আবুল ওফা এয়াহিয়া)

৪০০. এ যুবক, কিন্তু মোর নিষেধ সত্ত্বেও
সর্বদাই রত সে কালাম অধ্যয়নে।

কাফের[৪০১]	كافر	কাফির	অবিশ্বাসী	কাফিরদের ভীরুতা।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৮৮
কাদের[৪০২]	قدير	কাদির	সর্বশক্তিমান	আল্লাহ সর্বশক্তিমান।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা পৃ. ১৮৩
কাসিদা[৪০৩]	قصيدة	কাসিদা	আরবী কবিতা	আব্দুল কাদির জিলানী সম্পর্কিত কাব্য।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১০
কুতুব[৪০৪]	قطب	কুতুব	সুফিদের একটি পরিভাষা। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা	আব্দুল কাদির জিলানীর শিষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১০
কোরবানী[৪০৫]	قربانى	কোরবানী	ত্যাগ, নৈকট্য, আত্মোৎসর্গ।	ইসলামী বিধান প্রসঙ্গ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৩৮
খলিফা[৪০৬]	خليفة	খলীফা	মুসলিম শাসকদের	আব্দুল কাদির জিলানীর	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১৭

৪০১. বীর সেনাপতি? ভীরু পাপিষ্ঠ কাফের,
কে বলেরে বীর? - তুই তস্কর অধম।

৪০২. তোর-মোহন সুরে প্রাণের পুরে
তুল্‌বে প্রতিধ্বনি!
তোর-প্রতি তানে শব্দ হবে
"আল্লা কাদের গণি!"

৪০৩. শ্রেষ্ঠ ইমামের আখ্যা সমগ্র জগতে।
কাসিদায় তার তিনি গিয়াছেন লিখে

৪০৪. অত্যুচ্চ গভীর জ্ঞান লাভ করে তিনি
হ'য়েছিলা বিশ্বমাঝে কুতুবপ্রধান।

৪০৫. মস্‌জিদ সে ভাঙ্গে না ত ছলে ও কৌশলে।
কোরবানী করে না বন্ধ আইনের বলে।

৪০৬. অসংখ্য পন্ডিত জ্ঞানী সাধকমন্ডলী,
আমীর খলীফা জিন ফেরেশ্তানিচয়,
পবিত্র আত্মা পয়গম্বরদের এবং
আকাশে ভ্রমণকারী কাফ পর্বতের
অধিকারী, অনেকেই হ'ত উপস্থিত
শুনিতে বক্তৃতা।

			উপাধি, প্রতিনিধি	মজলিসের শান।	
খারেজী[৪০৭]	خارجي	খারিজী	একটি বাতিল সম্প্রদায়।	কারবালার প্রান্তরের বিভীষিকা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২৭
খেলাফত[৪০৮]	خلافة	খিলাফাত	খিলাফাত, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নাম।	মু'আবিয়া (রা.) - এর পরামর্শ সভা ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৪
খলিফা[৪০৯]	خليفة	খলীফা	ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা/ প্রতিনিধি।	মু'আবিয়া (রা.) এর পরামর্শ সভা	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২
গওছ[৪১০]	غوث	গাওস	সাহায্য, ত্রাণ, সুফিবাদের একটি স্তর।	হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) এর বংশ মর্যাদা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৫১
গনি[৪১১]	غنى	গণি	ধনী, সম্পদশালী।	আল্লাহর প্রশংসা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ১৮৩

৪০৭. সবংশে খারেজী কয়ে ঘোর পিপাসায়
"জল জল" করি সেই কারবালা প্রান্তরে!

৪০৮. যে কৃতঘ্ন অবিশ্বাসী কুফাবাসীদের
চাঞ্চল্যের জন্য হায় এমাম হাসান
তেয়াগিয়া খেলাফত যোগ সাধনায় ছিলা রত,

৪০৯. সিংহের শাবক সিংহ, - কি বিশ্বাস তারে?
খলিফার পদে সে যে হইয়াছে বৃত
মোস্লেম জগতে এবে তারে না বধিলে
কিছুতেই শান্তি নারিব লভিতে।

৪১০. গওছ পাকের সেই বংশের প্রদীপ
যোগীশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ মেদিনীপুরের
মহাত্মা মোর্শেদ আলী,

৪১১. তোর-মোহন সুরে-প্রাণের পুরে
তুলবে প্রাতধ্বণি!
তোর-প্রতি টানে–শব্দ হবে
আল্লা কাদের গণি।

গোলাম[৪১২]	غلام	গোলাম	সেবক	কংগ্রেসের মুসলিম অনুসারীদের নিন্দা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৫০
জুলুম[৪১৩]	ظلم	জুলম	অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন, অন্যায় আচরণ	একটি অন্যায় আচরণের বিভীষিকাময় বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৫৩
গাফেল[৪১৪]	غافل	গাফিল	অমনোযোগী	আল্লাহর মহিমা বর্ণনায় উৎসাহ দান।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২২১
জালেম[৪১৫]	ظالم	যালিম	অত্যাচারী, নির্যাতনকারী।	সত্যিকার রাজা-বাদশাহর দায়িত্বের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৫৩
জাহান্নাম[৪১৬]	جهنم	জাহান্নাম	নরক, দোযখ, অবিশ্বাসীদের পরকালীন ঠিকানা।	অবিশ্বাসীদের পরিণিতির বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৯

৪১২. দু'চারটি মুসল্‌মান উচ্চ পদে আছে,
গোলামের মত ফেরে কংগ্রেসীর পাছে!

৪১৩. বিধাতার রাজ্য মাঝে এমন জুলুম
কে সহিতে পারে বল? এ ঘোর অন্যায়।

৪১৪. এইরূপ গীতবাদ্য করি কাটাইবে,
খোদার নিকটে তবে যাইতে হইবে,
তাহার মহিমা গান করার সময়
উপস্থিত, এবে আর যে'কন গাফেল।

৪১৫. পিতৃ তুল্য রাজা, - প্রজা পুত্রের সমান
পিতা হয়ে পুত্র সম প্রজারে যে মারে,
সে কি রাজা? সে যে বিশ্বে দুরন্ত জালেম,
রাজার সে যোগ্য নহে - ঘোর উৎপীড়ক

৪১৬. খোদার বিরুদ্ধে সদা করিয়া বিদ্রোহ
যাবে তারা জাহান্নামে ভুল নাহি ইথে।

যাকাত[৪১৭]	زكاة	যাকাত	ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি	যাকাত প্রদানের আবশ্যকতা বর্ণনা।	মহাশ্মশান, পৃ. ২৮১
জানাজা[৪১৮]	جنازة	জানাযাহ	জানাযাহ্‌র নামায, মুসলমানদের মৃত্যু পরবর্তী একটি দু'আ অনুষ্ঠানের নাম।	হাসান (রা.) এর শাহাদাত পরবর্তী বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৫৭
জেহাদ[৪১৯]	جهاد	জিহাদ	একটি মুসলিম পরিভাষা।	কারবালার যুদ্ধের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৪২
তফসির[৪২০]	تفسير	তাফসীর	কুরআনের ব্যাখ্যা	আব্দুল কাদির জিলানীর প্রত্যহিক কাযাবলীর বিবরণ।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২৩৩

৪১৭. রছুলের ফরজ ছুন্নত
তেয়াগিয়া, তেয়াগিয়া রোজা ও নমাজ
হজ্জব্রত, দান ধ্যান ফেতরা জাকাত
সতত করিস তোরা পাপ অনুষ্ঠান।

৪১৮. স্নানান্তে কাফন দিয়া জানাজার পর
মদিনার শোক তপ্ত মোশ্লেম নিচয়
নিয়ে গেল শব দেহ রওজার নিকটে
সমাধিস্থ করিবারে,

৪১৯. যে "ঝাণ্ডা" উড়িলে নভে সমগ্র বিশ্বের
মোশ্লেম সমাজে হয় "জেহাদ" ঘোষণা;
হায় সেই সুপবিত্র "ঝাণ্ডা মোহাম্মদী"
এজিদ কর্তৃক অই লুণ্ঠিত ভূতলে।

৪২০ . প্রদানিত সকলেরে, প্রত্যেক দিবস
পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে করিত তফসির
কুরানের, শিক্ষা দিত হাদীস অছুল

তৈয়মম[৪২১]	تيمم	তায়াম্মুম	অযু-গোসলের বিকল্প।	কঠিন বিপদে ও ফরজ ইবাদত ত্যাগ না করার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৫৩
তৌহিদ[৪২২]	توحيد	তাওহীদ	একত্ববাদ।	প্রগার ঈমানের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৪০
দীন[৪২৩]	دين	দীন	ইসলাম	দীনের উপর আবিচল থাকার বর্ণনা।	মহাশ্মশান, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭খ্রি. পৃ. ২৬৭
দৌলত[৪২৪]	دولة	দৌলাতুন	সম্পদ, রাজত্ব, দেশ।	ধন ও দৌলতের অসারতার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৩৬৮
দেওয়ান[৪২৫]	ديوان	দিওয়ান	জমিদারের প্রধান কর্মচারী।	দেওয়ান পুত্রের অভিলাস।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪০৫

৪২১. শোণিতাক্ত বালু দিয়া তৈয়মম্ করি
মুমূর্ষু হোসেন, আহা ধীরে - ধীরে - ধীরে
কত কষ্টে - কত দুঃখে, স্মরি বিধাতারে,
তার - সে আঘাত প্রাপ্ত রক্তাক্ত ললাট
স্থাপিয়া বালুকাপরে পড়িলা নামাজ!

৪২২. ক্ষণ কাল পরে
ভক্তিতে - তৌহিদে তেজে সম্মোহিত হয়ে
উঠিলা বলিয়া জোরে বজ্রের নির্ঘোষে
মেঘ-মন্দ্রে 'এল্‌লেল্লা, - জাল্লে জালালুহু।

৪২৩. ধর অসি বজ্র মুঠে, "দীন দীন" রবে
"উড়াও সে অর্দ্ধচন্দ্র" - কাঁপাও অম্বর।

৪২৪. এ সংসার কিছু নয় - ধন ও দৌলত
সম্পত্তি- রাজত্ব মাগো সব ভোজবাজি

৪২৫. জমিদার সাহেবের দেওয়ানের পুত্র
প্রমোদরঞ্জন সদা বলিত মোদেরে
উষারে আনিয়া যদি দিস্ মোর কাছে
একদিন পুরস্কৃত করিব তোদেরে।

দোজলা/ দ্বিজলা[৪২৬]	دجلة	দিজলা	দিজলা নদী, তাইগ্রিস নদী।	বসরা নগরীর সৌন্দর্য।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩৪
নবী[৪২৭]	نبى	নবী	নবী (স.)	নবীর উপদেশ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৪৬
নাজির[৪২৮]	نظير	নাযির	জমিদারের কর্মচারী।	জমিদারদের অত্যাচার।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ২৬১
নূর[৪২৯]	نور	নূর	আলো/ নবীকে (স.) আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।	মদিনা থেকে হোসাইন (রা.) - এর প্রস্থান।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৮২
ফকির[৪৩০]	فقير	ফাক্বীর	অভাবী, দরিদ্র, আধ্যাত্মিক সাধক।	আধ্যাত্বিক সাধকের পরার্মশ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪২৮
ফাতেহা[৪৩১]	فاتحة	ফাতেহা	ভুমিকা, শুরু, সূচনা, সূরা ফাতিহা পাঠ	ফাতেহা দোয়জ দহমের প্রতি গুরুত্বারোপ	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহাশ্মশান, পৃ. ১৬১

৪২৬. দেখিলা সুদূরে চারু স্বর্ণরেখা প্রায়
দ্বিজলা ফোরাত নদী শোভিছে কেমন!
৪২৭. এক ভিন্ন পূজ্য নাই সারা ভূমন্ডলে,
নবীর সে বাক্য তোরা গেছিস্ কি ভুলে?
৪২৮. জমাজমি লিখে দিয়ে টাকা কর্জ করে!
নাজির পেয়াদা এনে,
সুদ ও আসল গণে,
মহাজন নেয় সবি দুই দিন পরে!
৪২৯. নূর নবী রছুলের পূত জন্মভূমি
তীর্থ শ্রেষ্ঠ মক্কাভূমি উতরিলা আসি।
৪৩০. কহিলা ফকিরুন মৃদু মৃদু হেসে,
‘ যাও তবে দেখ যেয়ে কৈলাস শিখরে
তোমাদের সাধু, সেই ইবলিসের শিষ্য
৪৩১. ফাতেহা দোয়াজ দাহমে, - এ পবিত্র দিনে
রাজ-গৃহে - নগরের প্রতি ঘরে ঘরে
মৌলুদ হইত পাঠ, ভক্ত মুসলমান
সারা রাত্রি জে’গে জে’গে পড়িত কোরান একমনে

ফোরাত[৪৩২]	فرات	ফুরাত	ফোরাত নদী	বসরা নগরী ও ফোরাত নদীর সৌন্দর্যের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩৪
মসজিদ[৪৩৩]	مسجد	মাসজিদ	মুসলমানদের ইবাদতগাহ।	মসজিদের গুরুত্ব ও সৌন্দযের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহাশ্মশান, পৃ. ৯৫
ছদকা[৪৩৪]	صدقة	সাদাকাহ	দান	দান-খয়রাত।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ২৫৮
জাকাত[৪৩৫]	زكاة	যাকাত	ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।	দান-খয়রাত।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ২৫৮
জুমা[৪৩৬]	جمعة	জুমু'আ	জুমু'আর নামাজ	দিল্লীর জামে মস্‌জিদের বর্ণনা	কায়কোবাদ রচনাবলী: অশ্রুমালা, পৃ. ৭৬
মহজুব[৪৩৭]	مهزوب	মোহজযুব	আল্লাহ প্রেমিক।	খোদা প্রেম।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ১৯৪

৪৩২. দেখিলা সুদূরে চারু স্বর্ণরেখা প্রায়
দ্বিজলা ফোরাত নদী শোভিছে কেমন!

৪৩৩. অই যে মস্‌জিদ, অই সৌন্দর্য্য আঁধার
স্বর্গ হতে কেহ যেন আনি এই স্থানে
স্থাপিয়াছে রম্য ভাবে।

৪৩৪. কেউবা দেয় ছদকা জাকাত কেবা সাজে সুরী
পরের ধনে বুক ফুলায়ে কেওবা হাঁকায় জুরী

৪৩৫. কেউবা দেয় ছদকা জাকাত কেবা সাজে সুরী
পরের ধনে বুক ফুলায়ে কেওবা হাঁকায় জুরী

৪৩৬. দেখ যেয়ে দিল্লী, সে দেওয়ান খাস,
সে শিশমহল, সৌন্দর্য - আবাস,
সে জুমা মস্‌জিদ দেখ যেয়ে আজ
গাইছে তাহারা কি শোক-গাঁথা!

৪৩৭. মহজুবের উক্তি
তুই হবি প্রাণ লতা পাতা, আমি হব তোর বুকের ফুল,
তুই হবি মোর ফুলের রাণী, আমি হব তোর মাথার চুল!

মিনার[৪৩৮]	منار	মিনার	বাতিঘর, আলোকস্তম্ভ	এখানে মসজিদ ও মিনারের অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে	মহাশ্মশান, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭খ্রি. পৃ. ২২১
মোয়াজ্জিন ৪৩৯	مؤذن	মু'আযযিন	আযান দাতা	মোয়াজ্জিনের দায়িত্বের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২৯
মোমেন[৪৪০]	مؤمن	মুমিন	বিশ্বাসী	বিশ্বাসী অবিশ্বাসীদের বর্ণনা ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ২৫৮
মোস্লেম মোশ্লেম[৪৪১] মোস্লেম	مسلم	মুসলিম	মুসলমান, ইসলামের অনুসারী	হাসান (রা.) এর পরামর্শ সভা ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৯/৫/২০
মোশরেক[৪৪২]	مشرك	মুশরিক	আল্লাহর সাথে অংশীদারকারী । শিরককারী।	মুসলিম সমাজকে উৎসাহ দান।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৩৬
মদিনা[৪৪৩]	مدينة	মাদীনাহ্	পবিত্র মদীনা নগরী,	হাসান (রা.) -এর পরামর্শ সভা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২০

৪৩৮. কোথাও বা ভগ্ন পাঠাগার
মস্জিদ মিনার ভগ্ন, ভগ্ন দেবগৃহ
ভগ্ন স্নানাগার, ভগ্ন চিকিৎসা আলয়,
কোথাও বা অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাচীর সকল।

৪৩৯. অই যে মসজিদ চারু মোশ্লেম গৌরব;
আহবানে মোশ্লেমবৃন্দে ভক্ত মোয়াজ্জিন
প্রত্যহ আজান দেয় মধুর সুস্বরে
দাঁড়ায়ে সে মস্জিদের সুউচ্চ মিনারে।

৪৪০. কেউবা আস্তিক, কেউবা নাস্তিক, কেউবা পৌত্তলিক
কেউবা মোমেন, কেউবা কাফের, কেউবা ক্যাথলিক!

৪৪১. যুদ্ধ সাজে অসণিত মোশ্লেম সেনানী
সুসজ্জিত, যোধৃবেশে সৈন্য আগণন।

৪৪২. এস ছুটে হে মুসলিম, এসো ছুটে আজি
থেক না মুশরেক দলে মুনাফিক সাজে

৪৪৩. যাও তুমি আমার সে শরীর রক্ষক
মক্কা ও মদিনাবাসী সৈনিক সবার
সেনাপতি যেইজন, আন তারে ডাকি
যা কর্তব্য, আমি তারে বলিব এখনি।

			মদীনাতুর রাসূল (স.)		
মক্কা[৪৪৪]	مكة	মাক্কাহ্	মহানবী (স.) এর জন্মস্থান, পবিত্র মক্কা নগরী	হাসান (রা.) এর পরামর্শ সভা ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২০
মোনাফেক ৪৪৫	منافق	মুনাফিক	কপটচারী / নামধারী মুসলমান।	সাধুর বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪২৮
মৌলুদ[৪৪৬]	ميلاد	মীলাদ	জন্ম জয়ন্তী, দু'আর অনুষ্ঠান।	মিলাদের বহুল প্রচলনের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৮
মোকাদ্দমা ৪৪৭	مقدمة	মুকাদ্দামা	মামলা	বিচারের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৪৬
মহরম[৪৪৮]	محرم	মুহাররম	হিজরী সনের প্রথম মাস।	কারবালার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২৯

৪৪৪. যাও তুমি আমার সে শরীর রক্ষক
মক্কা ও মদিনাবাসী সৈনিক সবার
সেনাপতি যেইজন, আন তারে ডাকি;
যা কর্তব্য, আমি তারে বলিব এখনি।

৪৪৫. আমি মোনাফেক নহি, - মনে মুখে এক
সৃষ্টি কর্তা খোদাতালা একজন জানি

৪৪৬. বঙ্গের তাপসশ্রেষ্ঠ মোর্শেদ আলীর
সুরম্য মস্‌জিদখানি মুখরিত সদা
নামাজে কোরান পাঠে মৌলুদ শরিফে।

৪৪৭. দেখেছি মা মনশ্চক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট তোর
স্বামীর যে মোকদ্দমা দিয়াছিল সঁপে
সেশন জজের কাছে, করিয়া বিচার
সে তাহার প্রাণ দণ্ড দিয়াছিল আজ্ঞা।

৪৪৮. আত্ম-বিসর্জন
মহরম মাসের ১০ই তারিখ- শুক্রবার, আশুরা ৬১ হিজরী।

মৌলভী[৪৪৯]	مولوي	মৌলভী	বন্ধু, ইসলাম ধর্মে বিশেষজ্ঞ, মুসলিম পরিভাষা।	সে সময়ে নিখিল ভারতের আলেম সমাজের দীন প্রচারের বর্ণনা।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৬৪
মৌলানা[৪৫০]	مولانا	মাওলানা	আমাদের বন্ধু,ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, আমাদের অভিভাবক, কামিল বা দাওরা পাশ ব্যক্তি।	ঐ	মহাশ্মশান, পৃ. ১৬৪
মোবারক[৪৫১]	مبارك	মুবারাক	কল্যাণময়, বরকতময়।	মহানবী (সা.) এর রওজা বিদ্যমান থাকায় মদীনা নগরীর বিশেষত্ব।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২৮
মুতা[৪৫২]	مؤطة	মু'তাহ	সিরিয়ার একটি স্থানের নাম।	ইসলামের ঐতিহ্য বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩২২

৪৪৯. মৌলভী মৌলানাগণ রাজবৃত্তি পেয়ে
প্রচার করিত ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে।

৪৫০. মৌলভী মৌলানাগণ রাজবৃত্তি পেয়ে
প্রচার করিত ধর্ম্ম দেশ দেশান্তরে।

৪৫১. যে নগরী মোস্তফার "রওজা মোবারক"
ধরি বক্ষে, অতুলিত গৌরব সম্মান
লভিয়া হ'য়েছে মহা তীর্থে পরিণত।

৪৫২. মোশ্লেম সেনানীবৃন্দ এরমুক সমরে,
যে বীর্য দেখায়েছিল মনে কি তা পড়ে?
মুতা ও ইমামা যুদ্ধে মুসলমান্‌গণ
করেছিল কি ভীষণ কালান্তক রণ।

নিকা[৪৫৩]	نكاح	নিকাহ	ডববাহ	বিচিত্র মানব জীবনের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: অমিয়ধারা, পৃ. ৩৬৬
রছুল[৪৫৪]	رسول	রাসূল	হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.), আল্লাহ প্রেরিত নবী।	ইসলামী অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা।	মহাশ্মশান, পৃ. .২৮১
রমজান[৪৫৫]	رمضان	রামাদান	মহিমান্বিত মাস, হিজরী সনের নবম মাস।	বিশেষ বিশেষ সময় বেশি দান করার বর্ণনা।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৬৩
বদন[৪৫৬]	بدن	বাদান	শরীর	কারবালার করুণ ঘটনার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১১৪
বসরা[৪৫৭]	البصرة	বাসরা	বসরা নগরী, ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহর।	বসরা নগরীর সৌন্দর্য বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩২

৪৫৩. কেহ চোখে চশমা দেয়, কেহবা চুরট টানে,
বৃদ্ধ কালে নিকা করে কেহ ষোড়শী আনে।

৪৫৪. রছুলের ফরজ ছুন্নত
তেয়াগিয়া, তেয়াগিয়া রোজা ও নমাজ
হজ্জব্রত, দান ধ্যান ফেতরা জাকাত্
সতত করিস তোরা পাপ অনুষ্ঠান

৪৫৫. পবিত্র রমজান আর ঈদ মহরমে
ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত মোস্লেম সকল
সানন্দে করিত দান দীন দুঃখী জনে
সাধ্যমত

৪৫৬. কি যে এক ভাবনার ঘোর কৃষ্ণ ছায়া
উঠিল ভাসিয়া তার নয়নে-বদনে!

৪৫৭. তীরে তার মনোহর বসরা নগরী;
-মোশ্লেমকুলের সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর
ধর্মপ্রাণ ওমরের কীর্তি নিদর্শন।

রহিম[৪৫৮]	رحيم	রাহীম	অতি দয়ালু, আল্লাহ, আল্লাহর গুণবাচক নাম।	আল্লাহর গুণ বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৯
রওজা[৪৫৯]	روضة	রাওদাহ	বাগান, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র কবর।	মদীনা নগরীর মর্যাদার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ২৮
শাফায়াত[৪৬০]	شفاعة	শাফা'আত	সুপারিশ	কিয়ামত দিবসে পাপি-তাপি উম্মতের প্রতি মহানবীর (স.) করনীয় ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২২
শয়তান[৪৬১]	شيطان	শাইতান	বিতাড়িত ইবলিস	দাম্ভিকতার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৯
শহিদ[৪৬২]	شهيد	শাহীদ	আল্লাহর পথে জীবনদানকারী	হাসান (রা.) এর শাহাদাত।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৫০

৪৫৮. সর্বশক্তিমান সেই গফুরে রহিম,
তাহার অনন্ত লীলা, লীলাময় তিনি
অসীম করুণা তার - কোদ্‌রৎ অসীম।

৪৫৯. যে নগরী মোস্তফার "রওজা মোবারক"
ধরি বক্ষে, অতুলিত গৌরব সম্মান
লভিয়া হ'য়েছে মহা তীর্থে পরিণত।

৪৬০. ইশ্লাম ধর্মের
প্রবর্তক, শাফায়াত করিবেন যিনি
হাসরের মাঠে

৪৬১. অহঙ্কার বশে সেই ইবলিস তাহারে
না করে সালাম, হল শয়তান অধম
বিধাতার অভিশাপে

৪৬২. দেখিতেছ বাছা চারু মন্দাকিনী তীরে
সবি ধর্মযুদ্ধে হত - শহিদের গৃহ।

			/ সাক্ষী।		
শিয়া[৪৬৩]	شيعة	শি'আ	দল, একটি বাতিল ফেরকা, আলী (রা.) এর প্রতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের শ্রদ্ধাশীল 'দল'।	ভারতে মুসলিম ঐতিহ্য/ ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।	মহাশ্মশান, পৃ. .১৫৪
সাহাবা[৪৬৪]	صحابة	সাহাবা	রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সাথীগণ।	রাসুল (স.) দৌহিত্র হোসাইনের মর্যাদা ও সাহাবী পুত্রদের তাঁর প্রতি অশোভ আচরণের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১২৩
শেখ[৪৬৫]	شيخ	শায়খ	ধর্মীয় নেতা	দাওয়াতে ইসলাম।	গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. ২১৮
সুন্নি[৪৬৬]	سني	সুন্নী	আহলুস সুন্নাত ওয়াল	ইসলাম বিরোধীদের	মহাশ্মশান, পৃ. ১৫৪

৪৬৩. তাই এবে ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম শিয়া সুন্নী শেখ্ সৈয়দ মোগল্ পাঠান হইয়াছে একত্রিত বধিতে কাফেরে ধর্ম্ম যুদ্ধে।

৪৬৪. রছুলের সেই প্রিয় সাহাবার পুত্র হ'য়ে তুমি, আজি তার দৌহিত্রের পরে ধরেছ ভীষণ অসি বিধর্মীর মত!

৪৬৫. এত মনোহর হ'ল সে বক্তৃতা তার শোনেনি কখনো যাহা আবুল হাসান এইরূপে বারবার শেখ মহোদয় বিভিন্ন বিষয়ে তার শুনিতে বক্তৃতা

৪৬৬. তাই এবে ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম শিয়াসুন্নী শেখ্ সৈয়দ মোগল্ পাঠান হইয়াছে একত্রিত বধিতে কাফেরে ধর্ম্ম যুদ্ধে।

			জামা'আতের অনুসারী।	বিরুদ্ধে সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আচরনের বিবরণ।	
সালাম[৪৬৭]	سلام	সালাম	অভিবাদন / মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদনের ভাষা।	শয়তানের দুষ্কর্ম ও দাম্ভিকতার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৯
সৈয়দ[৪৬৮]	سيد	সাইয়েদ	মহানবী (স.)-এর বংশধরদের উপাধী।	ভারতের মুসলিম ঐতিহ্য।	মহাশ্মশান, পৃ. ১৫৪
হজ্জ[৪৬৯]	حج	হাজ্জ	ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি।	ইসলামের বিধান পালনে উৎসাহ প্রদান।	মহাশ্মশান, পৃ. ২৮১
হাসর[৪৭০]	حشر	হাশর	একত্রিত করা / শেষ বিচারের দিন। পুনরুত্থান	বিচার দিবসে পাপীদের বিচারের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৫০

৪৬৭. অহঙ্কার বশে সেই ইবলিস তাহারে
না করে সালাম, হল শয়তান অধম
বিধাতার অভিশাপে

৪৬৮. তাই এবে ভারতীয় সমগ্র মোস্লেম
শিয়াসুন্নী শেখ্ সৈয়দ মোগল্ পাঠান
হইয়াছে একত্রিত বধিতে কাফেরে
ধর্ম্ম যুদ্ধে।

৪৬৯. রছুলের ফরজ ছুন্নত
তেয়াগিয়া, তেয়াগিয়া রোজা ও নমাজ
হজ্জব্রত, দান ধ্যান ফেতরা জাকাত্
সতত করিস তোরা পাপ অনুষ্ঠান

৪৭০. অধম সন্তান আমি, তুমি না ক্ষলি
কোন্ দসা হবে মোর হাসরের মাঠে।

হালাল[৪৭১]	حلال	হালাল	বৈধ বস্তু।	আসাদের প্রতি হাসান (রা.) এর উপদেশ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৪১
হারাম[৪৭২]	حرام	হারাম	নিষিদ্ধ	আসাদের প্রতি হাসান (রা.) এর উপদেশ।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৪১
হেজাজ[৪৭৩]	حجاز	হিজায	লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী আরব অঞ্চল।	মু'আবিয়া (রা.)-এর পরামর্শ সভা / হোসাইন (রা.) এর অসহায়ত্বের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩০
হুজুর[৪৭৪]	حضور	হুদুর	উপস্থিতি / জনাব / ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিকে এ অভিধায় সম্বোধন করা হয় / মহানবী (সা.) কেও উপমহাদেশে হুজুর (স.) বলে সম্বোধন করা হয়।	বিচারের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪২৩

৪৭১. ক্ষুধায় জ্বলিয়া গেলে উদর তোমার,
তথাপি হালাল ভিন্ন খে'ওনা হারাম

৪৭২. ক্ষুধায় জ্বলিয়া গেলে উদর তোমার,
তথাপি হালাল ভিন্ন খে'ওনা হারাম

৪৭৩. হেজাজ এরাকবাসী সমস্ত আরবে
সহায় করিয়া যদি আক্রমে আমারে,
কি দিয়া রক্ষিব আমি রাজ-সিংহাসন?

৪৭৪. "না হুজুর, বক্তব্য আমার
কিছু নেই, এই খুন করিয়াছি আমি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্যাংশ

কায়কোবাদ ব্যবহৃত আরবী বাক্যাংশ	প্রকৃত আরবী শব্দ	সঠিক বাংলা উচ্চারণ	অর্থ	কবিতায় ব্যবহারের প্রেক্ষাপট	তথ্যসূত্র
কুতুব মিনার[৪৭৫]	قطب منار	কুতব মানার	ভারতের একটি দর্শনীয় স্থান, ভারতে মুসলিম শাসক কুতুবুদ্দীন আইবেক স্মরণে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।	ভারতে মুসলিম ঐতিহ্যর বিবরন।	মহাশ্মশান, পৃ.২২১
গফুরে রহিম[৪৭৬]	غفور رحيم	গাফূরুর রাহীম	ক্ষমাশীল দয়ালু।	আল্লাহ্‌র গুণ বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: প্রেমের রাণী, পৃ. ৪৩৯
ছাইয়াদেন মুরছালীন[৪৭৭]	سيد المرسلين	সাইয়িদুল মুরসালিন	রাসূলদের সরদার/ নেতা।	রাসুল (সা.) এর স্তুতি।	মহাশ্মশান, প্রারম্ভাংশ
জিন্নাতুল বাকি	جنة البقيع	জান্নাতুল বাকী'	মদিনার বিখ্যাত কবরস্থান।	হাসান (রা.) কে সমাহিত করার বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৫৭
জোলফোক্কার [৪৭৮]	ذو الفقار	যুল ফিকার	মহানবী (সা.) ব্যবহৃত একটি তলোয়ারের নাম; পরবর্তীতে	সিফ্‌ফিনের যুদ্ধের বর্ণনা।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১০

৪৭৫. পুরাতম দিল্লী - কুতুব মিনার

৪৭৬. সর্বশক্তিমান সেই গফুরে রহিম,
তাহার অনন্ত লীলা, লীলাময় তিনি
অসীম করুণা তার - কোদরৎ অসীম।

৪৭৭. 'বফজ্‌লে খোদাওন্দ দুনিয়া ও দীন
তোফেলে নবী ছাইয়াদেন মোরছালীন।"

৪৭৮. পুন সংগ্রাম ভীষণ
বাঁধিল, মোর্ত্তজা আলী ভীষণ বিক্রমে
জোল ফোক্কার হাতে নিয়ে আরোহি দুল্‌দুলে।

			তা আলী (রা.) ব্যবহার করেন, দু'ধারী তলোয়ার		
তোফেলে নবী[৪৭৯]	طفيل النبي	তুফাইলুন্নাবী	মহানবী (সা.)-এর উসীলা	রাসুল (সা.) স্তুতি	মহাশ্মশান, প্রারম্ভা
মদিনা মুনায়ারা[৪৮০]	المدينة المنورة	মাদীনাহ মুনাও ওয়ারাহ	মাদীনা নগরী	হাসান (রা.) -এর পরামর্শ সভা	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৪২
রছুলোল্লা[৪৮১]	رسول الله	রাসূলুল্লাহ (সা.)	মহানবী মুহাম্মদ (সা.)	মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশস্তি বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৫৭
শাহাদাত জাহেরী[৪৮২]	الشهادة الظاهرية	শাহাদাতে জাহেরী	প্রত্যক্ষ শাহাদাৎ	মহানবী (সা.) -এর ভবিষ্যত বাণী বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৭৯
সরাবান তহুরা	شراباً طهوراً	শারাবান তাহুরা	পবিত্র পানীয়, হাওজে কাওছারের সুমিষ্ট পবিত্র পানি।	রাসুল (সা.) কর্তৃক পুরস্কার।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ,
সাতেল আরব[৪৮৩]	شاطئ العرب	শাতিল আরব	ইরাক ও ইরান সীমান্তবর্তী নদী আরবের উপকুলবর্তী অঞ্চল।	বসরা নগরীর সৌন্দর্য বর্ণনায়।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ৩২

৪৭৯. 'বফজ্‌লে খোদাওন্দ দুনিয়া ও দীন
তোফেলে নবীছাইয়াদেন মোরছালীন।"

৪৮০. মদিনা মুনয়ারা;
হযরত এমাম হাসান, হোসেন ও ধার্মিক মুসলমানবৃন্দ।

৪৮১. হজরত ছিলা বিশ্বে পূণ্যের আদর্শ!
কেহকেই খোদাতালা করেনি ভূষিত
সবগুণে, মাত্র এক রছুলোল্লা বিনে।

৪৮২. তুমি বাছা "শাহাদতে জাহেরী" লভিবে
এ জগতে, ধন্য হবে ওম্মত আমার
তোমার এ স্বার্থশূন্য আত্ম-বিসর্জনে।

৪৮৩. সাতেল আরব - তীরে এ কোন্ নগরী
শোভিত গোলাব-কুঞ্জে? - কহলা কল্পনে
সুধামুখী; - আমোদিত মধুর সৌরভে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদ সাহিত্যে আরবী বাক্য

কায়কোবাদ ব্যবহৃত আরবী বাক্য	প্রকৃত আরবী শব্দ	সঠিক বাংলা উচ্চারণ	অর্থ	কবিতায় ব্যবহারের প্রেক্ষাপট	তথ্যসূত্র
আল্লা-হো-আকবর	الله أكبر	আল্লাহু আকবার।	আল্লাহ মহান, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।	আল্লাহর মহত্বের বর্ণনা।	মহাশ্মশান, প্রারম্ভাংশ
আচ্ছালামু ওয়ালাইকুম	السلام عليكم	আসসালামু আলাইকুম।	আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।		গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ, পৃ. . ২১৫
ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না-এলায়হে রাজেউন[৪৮৪]	إنا لله وإنا إليه راجعون	ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন	নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।	কারবালার যুদ্ধে হোসাইন (রা.) -এর রণ হুঙ্কার।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. ১৩১
লায়েলাহা ইললেল্লাহ[৪৮৫]	لا إله إلا الله	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ	লা-ইলাহা ধ্বনির	মহাশ্মশান, ঢাকা:

৪৮৪. মুহূর্তে হোসেনী সৈন্য স্মরি বিধাতারে
"ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না এলায়হে রাজেউন"
বলে সবে স্ব স্ব অসি করিলা ধারণ!

৪৮৫. মোয়াজ্জেন যে মুহূর্তে দাঁড়ায়ে মিনারে
"লায়েলাহা ইল্‌লেল্লাহ" উঠিলা বলিয়া
"ভ্রম" করি সে মুহূর্তে একটি বন্দুক
গরজিল কাঁপাইয়া সে বন প্রদেশ।

			নাই	গভীরতা ও বিশালতা।	স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৭খ্রি. পৃ. .২৮২
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম[৪৮৬]	بسم الله الرحمن الرحيم	বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।	পরম দাতা ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে	ইমাম হাসানের পতাকায় খচিত আয়াত।	কায়কোবাদ রচনাবলী: মহরম শরিফ, পৃ. . ১৯

৪৮৬. খলিফার বিজয় কেতন:-
শোভিছে তাহার বক্ষে অর্ধচন্দ্রাকারে
"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদের সাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহারের নমুনা

কায়কোবাদ খণ্ড কাব্য ও কাহিনী কাব্য উভয় প্রকার কাব্যে আরবী শব্দের যথার্থ ব্যবহারে দক্ষতা দেখিয়েছেন। আমি এ পর্যায়ে কবির উভয় প্রকার কাব্য থেকে কিছু নমুনা পেশ করবো।

১. এ সংসারে কিছু নয় - ধন ও দৌলত[৪৮৭]
সম্পত্তি - রাজত্ব মাগো সব ভোজবাজি।

২. ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতের মাঝে[৪৮৮]
এক আল্লা বিনে তারা মানে না কিছুই।
(প্রেমের রাণী, ২:৪)

৩. স্ব স্ব স্থানে বসে আছে, - বাদী প্রতিবাদী[৪৮৯]
উকিল ও ব্যারিষ্টার উপস্থিত সবে।
(প্রেমের রাণী, ৩:৮)

৪. আমি মোনাফেক নহি; - মনে মুখে এক
সৃষ্টিকর্তা খোদা তালা একজন জানি।
(প্রেমের রাণী, ৩:৯)

৫. সুরম্য মস্‌জিদ খানি মুখরিত সদা
নামাজে কোরান পাঠে মৌলুদ শরিফে।
(প্রেমের রাণী, ৩:১০)

৬. ইশ্লাম জগতে
ব্যক্তি বিশেষের সুখ সমৃদ্ধির জন্য
খলিফা পদের সৃষ্টি হয়নি ত কভু?
(মহরম শরিফ, ১:৪)

৭. হাসানের অকস্মাৎ খেলাফত ত্যাগে

---

৪৮৭. কবি কায়কোবাদ, প্রেমের রাণী, ১:১০
৪৮৮. প্রাগুক্ত, ২.৪
৪৮৯. প্রাগুক্ত, ২.৪

রাজ্য মাঝে স্থানে স্থানে মহাগণ্ডগোল

(মহরম শরিফ, ১:২)

৮. মোশ্লেমকুলের সেই মধ্যাহ্ন ভাস্কর

ধর্মপ্রাণ ওমরের কীর্তি নিদর্শন।

(মহরম শরিফ, ১:৭)

৯. ঈমানের পঞ্চ অঙ্গ – কলেমা নমাজ

হজ্ব ও জাকাত রোজা; এ মহা সৌধের

স্তম্ভ-ভিত্তি একমাত্র পবিত্র ঈমান।

(মহরম শরিফ, ১:৯)

১০. খোদাকে যথার্থ জানা, কোরানে বিশ্বাস

রছুলের আজ্ঞা মানা, একেশ্বরবাদ,

নিষ্কাম হৃদয়ে সদা বিশ্বের মঙ্গল

(মহরম শরিফ, ১:৯)

১১. উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে "দীন দীন" বলে,

পড়েছিলাম লম্ফ দিয়া সে রণ-সাগরে!

(মহাশ্মশান, ২:১৩)

১২. যুঝেছিল অগণিত কাফেরের মনে

বাউলি প্রান্তর মাঝে ভীষণ বিক্রমে।

(মহাশ্মশান, ২:১৩)

১৩. কিন্তু নাথ কাফেরের অন্ন,

হারাম আমার কাছে – জীবিকা তোমার,

কেমনে যাইব আমি তোমার সকাশে?

(মহাশ্মশান, ২:১৫)

১৪. রছুলের উপদেশ মানিয়া সতত

অটল বিশ্বাস রাখি ধর্ম্মে আপনার

রোজা ও নমাজ দান ফরজ ছুন্নত

ধর্ম্ম কার্য্য রীতিমত করিলে পালন,

(মহাশ্মশান, ২:২৩)

১৫. কিছুক্ষণ পরে
একটি ফকির সহ করিল প্রবেশ
সভাস্থলে, সকলেই কহিল চাহিয়া
নীরবে সে ক্ষীণকায় ফকিরের পানে।
(মহাশ্মশান, ২:২০)

১৬. হে সাকি, তাহারি প্রেমে হৃদি ভরপুর
জীবনে প্রতি শ্বাসে,
তারি স্মৃতি সদা ভাসে,
আজানে প্রত্যহ শুনি তারি কণ্ঠস্বর।
(অশ্রুমালা : সাকী)

১৭. শিখায়ে একতা-মন্ত্র বাঁধিতে মোশ্লেম এক-ডোরে
এসেছে এ "ঈদ" আজি মোশ্লেমের প্রতি ঘরে ঘরে।
(অশ্রুমালা : ঈদ আহ্বান)

১৮. যেখানে রমজান মাসে নিশীথে সময়ে
তারাবির প্রতি শব্দ বায়ু স্তরে স্তরে
ভ্রমিয়া, উদাস প্রাণ প্রকৃতি – হৃদয়ে
ঢালিত অমৃত, সৃষ্টি আকুলিত করে!
(অশ্রুমালা : দিল্লী)

১৯. দেখ যেয়ে দিল্লী, সে দেওয়ান খাস
সে শিশ মহল, সৌন্দর্য - আবাস,
সে জুমা মসজিদ দেখ যেয়ে আজ
গাইছে তাহারা কি শোক-গাঁথা!
(অশ্রুমালা : আবাহন)

২০. তারাবীর সুধাস্বরে মধুর আজানে
কোরানের পূণ্য শ্লোকে লালিত ঝঙ্কারে –
কত সুধা ঢে'লে দিত মোশ্লেমের প্রাণে

আজি তা' কোথোয়, হায় জিজ্ঞাসিব কারে?

(অশ্রুমালা : মোশ্লেম শ্মশান)

২১. গওছ পাক সেই পথ দেখাবে

সে জানে সেই পথের খবর।

(প্রেমের ফুল : প্রেমের সুরা)

২২. আমার প্রাণের ক্ষত গুলি সব

হয়ে যাবে মুসলমান

সেই মুহূর্তে সেই জ্যোতিতে

কাবা হবে আমার প্রাণ

(প্রেমের ফুল : প্রেমের ফুল)

২৩. ঐ বাজলো তোর যাওয়ার ভেরী

হাসরের দিন বিচার হবে

পাপ-পূণ্যের এই লগেজ ধরে

আয় ছুটে আয় ও মোছাফের।

(প্রেমের ফুল : গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ)

২৪. কেউ গাইছে কোরান পাক

কেউ গাইছে তৌহিদের গান

কেউ গাইছে কুলহু আল্লাহ

শুনলেরে জুড়াইবে প্রাণ।

(প্রেমের ফুল : গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জ)

২৫. তারি প্রেমের মুজনু হয়ে

ঘুরে বেড়াই উন্মাদ সাজি

ডাক্তার বৈদ্য হেকিম ওঝা

কেহই তা - ধরতে নারে।

(প্রেমের ফুল : প্রেমের সাকি)

পঞ্চম অধ্যায়

কায়কোবাদ কাব্যে ইসলামী ভাবধারা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ভাবধারার পটভূমি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ স্রষ্টার প্রশংসা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের স্তম্ভসমূহের বিবরণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ মৃত্যু ও পরকালীন জীবনের বর্ণনা

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ মুসলিম পর্বসমূহের বর্ণনা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ উপকার ও কল্যাণ কামনা

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের কতিপয় অনুশাসনের বিবরণ

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের গৌরব ও জাতীয় ঐতিহ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

কায়কোবাদ কাব্যে ইসলামী ভাবধারার পটভূমি

আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আরব মরুভূমি ছিল কাব্যের ঝংঙ্কারে মুখরিত। কাব্যের ঝর্ণাধারা বইছিল মরুর দেশে। কাব্য সাহিত্যের এ চরম উৎকর্ষতার সময়েই মহাবিশ্বের মহাবিস্ময় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হলো। পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হলো অন্ধকারে নিমজ্জিত জাযিরাতুল আরব। সাহিত্যমোদী আরবজাতি কুরআনের বাচনিক ভঙ্গি, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলঙ্কার, সর্বোপরি এর সাহিত্যিক মানের উচ্চাসনে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গেলো। এ সময় পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্ভুলতার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন। ইরশাদ করলেন:

الم- ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ[৪৯০]

"আলিফ্–লাম–মীম, ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ"

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[৪৯১]

"আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।"

সাহিত্যামোদী আরব জাতি কুরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা এক পর্যায়ে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কুরআন হয়ে উঠে তাদের

৪৯০. *আল-কুরআন*, ২ : ২
৪৯১. *আল-কুরআন*, ২ : ২৩

জাতীয় সাহিত্য। কুরআনের প্রভাবে প্রভাবিত আরব কবিগণ এক নতুন ধারায় কাব্য রচনার সূত্রপাত করেন। ইসলামী শরীয়াহর বিভিন্ন বিষয় তাদের কাব্য সাহিত্যে স্থান করে নেয়। ফলে তাদের কাব্য সাহিত্য ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ঠ হয়ে উঠে। নতুন পরিভাষার সৃষ্টি হয় 'ইসলামী ভাবধারা'।

সাহাবী কবিগণ এ ধারার সূচনা করেন। এদের মধ্যে শায়িরুর রাসূল হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)[৪৯২], আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.)[৪৯৩], লাবিদ ইব্‌ন রাবিয়া (রা.)[৪৯৪], কা'ব বিন যুহাইর (রা.)[৪৯৫], আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)[৪৯৬], কাব ইব্‌ন মালিক (রা.)[৪৯৭], আবদুল্লাহ ইব্‌ন

---

৪৯২. *হাসসান ইবন সাবিত* (রা.): তাঁর পুরো নাম আবু আবদির রহমান হাসসান ইব্‌ন সাবিত আল-আনসারী (রা.)। তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ৬০ বছর পরে ৬০ বছর। তিনি খ্যাতিমান কবি ছিলেন। জাহিলী যুগে কবি আ'শা ও খানসার সাথে উকাজ মেলায় কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুল (স.) এর পক্ষ থেকে মক্কার মুশরিক কবিদের সমুচিত জবাব দেন। মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির জন্য রাসুল (স.) তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করেন। তিনি শায়িরু রাসুলিল্লাহ (স.) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৪৯৩. *আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আবু তালিব* (রা.)। তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। শিশুদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি রাসুল (স.) এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। জাহেলী যুগে যে কয়জন লেখাপড়া জানতেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি হুদায়বিয়া সন্ধির লেখক। জিহাদের ময়দানে তাঁর বীরত্ব অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর দিওয়ানে অনেক কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। নাহজুল বালাগা নামে তার একটি বক্তৃতা সংকলনও রয়েছে।

৪৯৪. *লাবিদ ইব্‌ন রাবীয়া* (রা.): তাঁর প্রকৃত নাম আবু আকীল লাবীদ ইব্‌ন রাবীয়া আল-আমিনী আল-মুদারী। তিনি আরবের ঐতিহ্যবাহী হাওয়াযিন গোত্রে ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মু'আল্লাক্বার একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে ১১৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন মুখাদরাম কবি। তার বেশির ভাগ কবিতাই দিওয়ান আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৯৫. *কাব ইব্‌ন যুহাইর* (রা.): মুআল্লাকার অন্যতম কবি যুহাইর ইব্‌ন আবী সুলমার পুত্র। তাঁর পিতা, ভাই, বোন–সবাই কবি ছিলেন। প্রথম জীবনে ইসলামের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। রাসূল (স.) তাকে মৃত্যদন্ড প্রদান করেন। তিনি পালিয়ে বেড়াতে থাকেন এবং একপর্যায়ে রাসূল (স.) এর দরবারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত কাসিদা 'বানাদ সুআদ' আবৃত্তি করেন। রাসূল (স.) খুশি হয়ে তাঁর পরিহিত চাদর উপহার দেন। ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৪৯৬. *আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা* (রা.): তাঁর প্রকৃত নাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা আল-আনসারী। তিনি বনু খায়রাজ গ্রোত্রের বনু আল-হারিস শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৃতীয় আকাবার শপথে ৭০ জন মদিনাবাসীর সাথে রাসুল (স.) এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। অতঃপর মদীনায় দাওয়াতের কাজ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, খাইবার ও উমাবতুল ক্বাযা- প্রত্যেকটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। মুতার যুদ্ধে তিনি তৃতীয় সেনাপতি ছিলেন এবং সে যুদ্ধেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ইসলামের স্বপক্ষে বহু কবিতা রচনা করেছেন।

৪৯৭. *কাব ইব্‌ন মালিক* (রা.): প্রকৃত নাম আবু আবদিল্লাহ কাব ইব্‌ন মালিক আল-আনসারী (রা.)। ২৫ বছর বয়সে আকাবার দ্বিতীয় শপথে অংশ গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আহলে সুফফারও একজন সদস্য ছিলেন।

যুবাইর (রা.)[৪৯৮] প্রমুখের নাম প্রণিধানযোগ্য। এরপর এ ধারাবাহিকতা বহতা নদীর মতই চলতে থাকে এমনকি আজ পর্যন্ত এর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে।

আরবগণ পারস্য জয় করার পর পারস্যবাসীরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। পারস্যকবিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী কাব্য প্রতিভা নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেও ইসলামী ভাবধারার্পূণ কবিদের দেখা পাওয়া যায়। ওমর খৈয়াম[৪৯৯], হাফিজ সিরাজী[৫০০], শেখ সাদী[৫০১], জালালুদ্দীন রুমী[৫০২], মাওলানা আবুল কাসেম ফেরদৌসী[৫০৩] এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে।

উহুদ যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এ যুদ্ধে তাঁর দেহের ১১টি মতান্তরে ১৪টি স্থানে জখম হয়। হাসসান ইব্ন সাবিত (রা.) ও আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)- এর সাথে তিনিও মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতার লড়াইয়ে অংশ নেন।

৪৯৮. *আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর* (রা.) তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) ও আসমা বিনতু আবু বকর (রা.) এর সন্তান। তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, বাগ্মী ও কবি। সেই সাথে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী খলীফা। ৯২ হিজরী সনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

৪৯৯. *ওমর খৈয়াম* : তাঁর প্রকৃত নাম গিয়াস উদ্দিন আব্দুল ফাত্তাহ ওমর ইব্ন ইব্রাহিম আল-খৈয়াম নিশাপুরী্। তিনি ইরানের নিশাপুরে ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩ বছর বয়সে ১১৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে কবি, গণিতবিদ, দার্শনিক, ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তার রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

৫০০. *হাফিজ সিরাজী*: প্রকৃত নাম শামছুদ্দিন মুহাম্মদ ইদরিস আস-সিরাজী। তাঁর সঠিক জন্ম তারিখ জানা যায়নি। তিনি ইরানের সিরাজ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে বুলবুল-ই-সিরাজ বলে অভিহিত করা হয় । তিনি সুফি মতালম্বী ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা পরস্পর পত্র যোগাযোগ করতেন। কাজী নজরুল ইসলাম তার রুবাইয়াত-ই-হাফিজ অনুবাদ করেছেন।

৫০১. *শেখ সাদী*: তাঁর প্রকৃত নাম আবু মুহাম্মাদ মুসলিহ উদ্দিন ইব্ন আব্দুল্লাহ সিরাজী। তিনি ইরানের সিরাজ নগরে ১২১০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সুফি মতালম্বী ছিলেন। তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে- গুলেস্তা ও বুস্তা। ইরান ছাড়া অন্যান্য মুসলিম দেশেও তিনি সমাদৃত। তার কবিতা ভারত উপমহাদেশের মাদরাসা সমূহে পাঠদান করা হয়।

৫০২. *জালাল উদ্দিন রুমী*: তিনি মাওলানা রুমী নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি একাধারে কবি, ফকীহ, ধর্মতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও সুফি। ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি খাওয়ারিজমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে রোমের কোনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। তার লেখা 'মসনবী' বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম সেরা সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

৫০৩. *আবুল কাশেম ফেরদৌসি*: প্রকৃত নাম আবুল কাশেম ফেরদৌসি তুসী। তিনি ইরানের তুস নগরে ৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০২০ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তার অমর মহাকাব্য শাহনামা। এটি তিনি দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় নিয়ে সুলতান মাহমুদ গজনভীর নির্দেশে রচনা করেছেন। ৩০ হাজার শ্লোকের এ মহাকাব্য বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক অধিকাংশ মুসলিম কবি ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ঠ ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা পারস্য কবিদের দ্বারা প্রভাবান্নিত ছিলেন। ইসলামী ভাবধারায় যারা খ্যাতির উচ্চ শিখরে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন, কায়কোবাদ তাদের অন্যতম। তিনি সমকালীন মুসলিম কবিদের মধ্যে সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা প্রয়োগের পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কায়কোবাদ কাব্যে 'ইসলামী ভাবধারা' বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্রষ্টার প্রশংসা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা সকল প্রশংসার অধিকারী। সমগ্র বস্তুনিচয় তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পবিত্র কুরআনের প্রথম সুরাহ 'আল-ফাতিহা' এর শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[৫০৪]

"সকল প্রশংসা জগতসমুহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক।"

কবি কায়কোবাদ মহান স্রষ্টার এক অনুরক্ত বান্দা। স্রষ্টার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। কবি তাঁর স্রষ্টার প্রশংসা করতে সকলকে আহ্বান করেন। কবি বলেন:

গাওরে আনন্দে সবে, তারি যশ গুণগান
নিখিল ভুবন যেবা করিয়াছে নিরমান।
দিবানিশি, রবি, শশী, গগনে আসনে বসি,
যাহার আদেশ কর করিতেছে পরদান।
বিহঙ্গম বনে বনে প্রকৃতি সঙ্গিনী মনে
গাইছে মহিমা যার ধরিয়া পঞ্চম তান।[৫০৫]

অতঃপর কবি নিজেই তাঁর প্রিয় স্রষ্টার প্রশংসায় মেতে উঠেন:

তুমি নাথ দয়াময় পাপীজন মুক্তিদাতা
তুমি নাথ সর্বময় জীবের জীবনধাতা
একমনে তব নাম,
লইয়া হে গুণদাম,
মরি মরি হায় হায়, কাঁদিতেছি অবিরত।[৫০৬]

---

৫০৪. *আল-কুরআন*, ১ : ১-৩

৫০৫ . কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫০৩

মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি আদি তিনিই অনন্ত। তাঁর কুদরতের সীমা-পরিসীমা নাই। তাঁর শক্তি ও সাহায্য সমগ্র বিশ্বজাহানে ছড়িয়ে আছে। সকল শক্তির আঁধার তিনি। তিনি যেমন অনন্ত শক্তির আঁধার তেমনি দয়া ও করুণার মহাসমুদ্র। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[৫০৭]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

মহান আল্লাহ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। কবি কায়কোবাদ অসীম করুণাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বলেন:

সর্বশক্তিমান সেই গফুরে রহিম
তাহার অনন্ত লীলা, লীলাময় তিনি
অসীম করুণা তাঁর- কোদ্‌ৎরত অসীম।[৫০৮]

একজন নিষ্টাবান, কৃতজ্ঞ বান্দা তাঁর স্রষ্টার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে থাকে। আর এরকম হওয়াই বিবেকের স্বাভাবিক দাবি। কবি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি মহান স্রষ্টার শক্তি সকল কিছুতে আবলোকন করে থাকেন। এই পৃথিবীর ফুলে-ফলে, জলে-স্থলে, অন্তরীক্ষে মহান স্রষ্টাকেই তিনি দেখতে পান। কবি বলেন:

তুমি গন্ধে, তুমি ফুলে
তুমি পত্রে, তুমি মূলে
তুমি বিশ্বে, নভোমন্ডলে
বিশ্বরূপী তুমি।
বিশ্ব তব রূপ তুমি তাঁর ভূপ
এ শৌর জগতে
যা আছে সকল তুমি
তোমা ভিন্ন নাই আমি।
তোমারে নমি।[৫০৯]

---

৫০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৩

৫০৭. *আল-কুরআন*, ৩ : ১৬৫

৫০৮. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৩৯

মহান স্রষ্টার প্রশংসায় কবি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর হৃদয়ের অর্গল খুলে মহান প্রভুর স্তুতি বর্ণনা করেছেন। কবি এ বিশ্বের সকল কিছুতেই মহান স্রষ্টার সাক্ষ্য ও অপূর্ব মহিমা অবলোকন করেন। কবি বলেন:

এ নিখিল বিশ্বে, তোমারি মহিমা
গাইছে সতত, তপন-চন্দ্রিমা
গ্রহ-উপগ্রহ জ্যোতিষ্ক মন্ডল
তোমারি করুণা শিশিরের বিন্দু
তোমারি জ্যোতিতে পূর্ণিমার ইন্দু
এত সমুজ্জল।[৫১০]

মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা সৃষ্টি জগতকে করুণার বারিধারা দিয়ে সিক্ত করে রেখেছেন। যে দিকেই তাকানো যায় সে দিকেই মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ ও নিয়ামতই পরিলক্ষিত হয়। কবি যথার্থ বলেছেন:

তুমি প্রেমময়, করুণা নিলয়
তব দ্বারে কেহ নিরাশ ত নয়
.....
তুমি নিরাকার, অথচ সাকার
তুমি সর্বব্যাপী, তুমি মূলাধার
অনাদি অনন্ত তুমি।
তব স্নেহ ক্রোড়ে লইলে আশ্রয়
না থাকে জীবনে মরনে ভয়
তুমি নাথ, ভকত বৎসল।[৫১১]

---

৫০৯. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. বিয়াল্লিশ

৫১০. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৫১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৩

ইসলামের অন্যতম একটি অনুসঙ্গ হচ্ছে সদা সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। আকাশ ও পৃথিবী তথা বিশ্বের মালিক তিনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[৫১২]

"বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া নও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি উজ্জত দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

আল্লাহ তায়ালা মহাক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সকল ক্ষমতার আঁধার। আকাশ ও পৃথিবী তথা সমগ্র পৃথিবীর মালিক তিনিই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ[৫১৩]

"সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও অকৃতজ্ঞ হইও না।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ[৫১৪]

---

৫১২. *আল-কুরআন*, ০৩: ২৬

৫১৩. *আল-কুরআন*, ২ : ১৫২

৫১৪. *আল-কুরআন*, ২ : ১৮৬

"আমার বান্দাগন যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিত পারে।" সুতরাং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনাই যুক্তিযুক্ত। এজন্যই শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আল-কুরআনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[৫১৫]

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ লইবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

আশ্রয়দাতা হিসেবে আল্লাহর চেয়ে আর কেই বা আছে। আল্লাহ তা'আলাই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতা। তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আশ্রয় চাইতে হবে। সুরা ফাতিহায় তিনি বলেন:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[৫১৬]

"আমরা শুধু তোমারই 'ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।"

কবি কায়কোবাদ মহান স্রষ্টাকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই কবি বলেছেন:

তুমিই আমার স্বামী, পথ ভ্রান্ত পথিক আমি
হাত ধরে প্রভু তুমি,
কোলে তুলে নেও!
যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীরা ফেলে কাঁচ তুলে
ভিখারী সেজিছি আমি
আমার সে ভুল প্রভু
তুমি ভেঙে দেও।[৫১৭]

---

৫১৫. *আল-কুরআন*, ৭ : ২০০

৫১৬. *আল-কুরআন*, ০১ : ০৪

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টি নিচয়ের মধ্যে মানুষই সবচেয়ে বেশি মযার্দার অধিকারী। তবে মানুষ যদি স্রষ্টার হুকুম পালন না করে, তাহলে সবচেয়ে নিকৃষ্ঠ প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ[৫১৮]

"তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু তদ্দারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্দারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্দারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট। উহারাই গাফিল।"

তা হলে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা? সাধারণত মানুষ সবাই সমান এবং শ্রেষ্ঠ হবে সেই ব্যক্তি যে, সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ[৫১৯]

"তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার কর্মে- বংশে নয় বর্ণেও নয়। উন্নত নৈতিক চরিত্রই মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ বলে গণ্য করে থাকে। হযরত বেলাল (রা.) ক্রীতদাস ছিলেন। তার গায়ের রং ছিল কালো। কিন্তু তিনি কতই না সম্মানিত সাহাবী ছিলেন তিনি। রাসুল (স.) ও তাঁর সাহাবীরা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আল্লাহর রাসূল (স.) মানুষের মর্যাদার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন।

কবি কায়কোবাদ এটা জানতেন এবং মানতেন। কবি মনে করেন, যে মহান স্রষ্ঠা রাজা-বাদশাহকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই নিঃস্ব অসহায় দীন দরিদ্রদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন তিনি নদী-গিরি-বন। আবার তিনিই সৃষ্টি করেছেন উষর মরুভূমি। কবি বলেন:

---

৫১৭. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫১৮. *আল কুরআন*, ৭ : ১৭৯

৫১৯. *আল-কুরআন*, ৪৯ : ৫

যে ঈশ্বর গড়িয়াছে তোমারে রাজন,
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে অই ভিখারিণী
যে ঈশ্বর গড়িয়াছে সমুদ্র ভীষণ
সে ঈশ্বর গড়িয়াছে মহা মরুভূমি![৫২০]

কবি বিশ্বাস করেন মহান স্রষ্ঠার অসীম ভান্ডারে যা আছে তার মধ্যে সবাই সমান অধিকারী। রাজায়-প্রজায় কোন ভেদাভেদ এখানে নেই। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো সকলের স্রষ্টা যেমন এক তেমনি সকল মানুষের মর্যাদায় সমান। সকল মানুষের শারীরিক এবং আভ্যন্তরীণ অবয়ব একই রকম। সব মানুষের রক্ত লাল। যে মানুষ জন্মেছে সে মৃত্যু বরণ করবে। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। কবি যথার্থই বলেছেন:

তার এ ভান্ডারে আছে যে সব রতন,
সে সকলে সকলেরি সম অধিকার!
রাজায় প্রজায় নাহি প্রভেদ কখন,
তবে কেন মোহবশে এত অহংকার?[৫২১]

কবি মনে করেন সম্পদ ও ক্ষমতা কারো কাছে চিরকাল থাকে না। যে ধনী বা ক্ষমতাবান সে ব্যক্তি, হতদরিদ্র ক্ষমতাহীন মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করেছে, আবার সেই দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন মানুষটি একদিন অঢেল সম্পদের অধিকারী ও বিশাল ক্ষমতার মালিক হয়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে ধনী ও ক্ষমতাবান মানুষটি সব হারিয়ে পথের ফকিরে পরিণত হতে পারে। কবি বলেন:

আজি যে তোমার ধারে অন্ন তরে
জঘন্য দাসত্ব বৃত্তি করেছে গ্রহণ,
সংসার আবর্তনে কিছুদিন পরে,
হতে পারে সে তোমার প্রভু শ্রেষ্ঠতম![৫২২]

---

৫২০. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৫২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৫২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের স্তম্ভসমূহের বিবরণ

ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে মহানবী (স:) ইরশাদ করেন:

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة و حخ البيت وصوم رمضان[৫২৩]

"ইসলাম পাঁচটি খুঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত। একথার উপর সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসুল। সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা ও রমজানের রোজা রাখা।"

একাত্মবাদের বর্ণনা

আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। ইসলামের এটা মূলবাণী। পবিত্র কুরআনে এসেছে:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ[৫২৪]

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।"

আল কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ[৫২৫]

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক"

কবি বলেন:

ঈমানের পঞ্চ অঙ্গ - কলেমা নমাজ
হজ্ব ও জাকাত রোজা; এ মহা সৌধের
স্তম্ভ-ভিত্তি একমাত্র পবিত্র ঈমান।[৫২৬]

---

৫২৩. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ খ্রি.), খ. ১, ৫ম সং, পৃ. ১৬

৫২৪. *আল-কুরআন*, ১১২ : ১

৫২৫. *আল-কুরআন*, ৩ : ২

ইসলামে মূলবাণীই আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। এটি ইসলামের মৌলিক আকীদা। কবি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর একত্বতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর কাব্যে আল্লাহর একত্ববাদের জয়গান গেয়েছেন। কবি বলেন

এক ভিন্ন অন্ন নাই উপাস্য এ ভবে
এ পবিত্র মহামন্ত্রে হইল দীক্ষিত
ভ্রমান্ধ ভারতবাসী, হইল তখন
ভারতে নতুন যুগ, সেই দিন হতে
ভারতে ইস্লাম ভিত্তি হইল পক্ষণ[৫২৭]

কবি শুধু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন এমন নয় তিনি মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল ও সুদৃঢ় আস্থা রাখতেন। কবি তাঁর স্রষ্টার নিকট সব কিছু সঁপে দিয়ে বলেন:

তোমার দুয়ারে, আজি রিক্ত করে,
দাঁড়ায়েছি প্রভো, সপিতে তোমারে,
শুধু আঁখি জল,
দেহ হৃদে বল[৫২৮]

কবি স্রষ্ঠার প্রতি সর্বদাই ভরসা করেছেন। তিনি কখনো ভুলেননি তাঁর মহান প্রভুকে। সুখে-দুঃখে তিনি তাকেই স্মরণ করেছেন। কবি বলেন:

দারিদ্র- পেষনে, বিপদের ক্রোড়ে,
অথবা সমুদ্রে, সুখের সাগরে
ভুলিনি তোমারে এক পল,
জীবনে মরনে, শয়নে স্বপনে
তুমি মোর সাথের সম্বল,
দেহ হৃদে বল![৫২৯]

---

৫২৬. *কায়কোবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৫২৭. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬
৫২৮. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

সালাত ও আযানের বর্ণনা

ঈমানের পর সালাতের অবস্থান। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে ৮২ বার তাগিদ দেয়া হয়েছে। একজন মুসলমানের বাহ্যিক পরিচিতির অন্যতম বিষয় হল সালাত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ[৫৩০]

"হে মুমিনগণ ধৈয্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

সালাত সম্পর্কে কবি কায়কোবাদ বলেন:

....
আজানের রবে
প্রতিদিন পঞ্চবার মোস্লেম নিচয়
আসিত ছুটিয়া যেথা, আপনি সম্রাট
আসিয়া যে স্থানে নিত্য ভজনের তরে
দাঁড়াইত সমভাবে ভিখারীর সনে
ইস্লামের সাম্য ভাব করি প্রদর্শন।[৫৩১]

ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ আযান। দৈনিক পাঁচবার যেমন সালাত আদায় করতে হয় তেমনি পাঁচবার আযান প্রদান করতে হয়। প্রতিদিন পাঁচবার মুয়াজ্জিন সালাতের আহবান জানান। কবি কায়কোবাদ আযান সমন্ধে যে কবিতা লিখেছেন বাংলা ভাষায় এর সমকক্ষ আর কোন কবিতা পরিলক্ষিত হয়নি। আযান কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নে পেশ করা হলো:

কে অই শুনালো মোরে
আজানের ধ্বনি
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল হইল প্রাণ বাজিল ধমনী
কি মধুর
আজানের ধ্বনি[৫৩২]

---

৫২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৫৩০. *আল-কুরআন*, ০২ : ১৫৩

৫৩১. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

কবি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। নিয়মিত সালাত আদায় করতেন। মসজিদ ছিল তাঁর প্রিয় স্থান। আর আজানের ধ্বনি তার হৃদয় মনে আবেগের ঝড় বইয়ে দিতো। সুমধুর আজানের ঝংকারে কবি হৃদয়ে ভক্তির ঢেউ উঠে যেতো। তিনি ছুটে যেতেন মসজিদ পানে। কবি বলেন:

আমি তো পাগল হয়ে
সে মধুর তানে
কি যে এক আকর্ষণে ছুটে যাই মুগ্ধ মনে
কি নিশীথে কি দিবসে
মসজিদের পানে
হৃদয়ের তারে তারে, প্রাণের শোনিত ধারে
কি যে এক ঢেউ উঠে
ভক্তির তুফানে
কত সুধা আছে সেই মধুর আজানে।[৫৩৩]

মদিনা মুনাওয়ারায় মসজিদে নববী অবস্থিত। যেখানে মহানবী (স.) এর রওযা মোবারকও অবস্থিত। সে নগরীতে আজও পঠিত হয় কুরআনুল কারীম। আর মসজিদ থেকে ভেসে আসে সেই সুমধুর আজানের ধ্বনি। কবি পবিত্র মদিনা নগরীর বর্ণনা দিতে গিয়েও আজানের কথা উল্লেখ করতে তিনি কার্পণ্য করেননি। কবি বলেন:

অই যে মসজিদ চারু মোশ্লেম গৌরব
আহবানি মোশ্লেমবৃন্দে ভক্ত মোয়াজ্জিন
প্রত্যহ আজান দেয় মধুর সুস্বরে
দাঁড়ায়ে সে মস্‌জিদের সুউচ্চ মিনারে।
শুনিলে তা কার মন না হয় মোহিত?
অভ্যন্তর মুখারিত দিবস রজনী
কোরানের পুণ্য শ্লোকে মধুর ঝঙ্কারে।[৫৩৪]

---

৫৩২. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৫-১৭৬

৫৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

হজ্বের বর্ণনা

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো হজ্জ সম্পাদন করা। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজীগণ মক্কা-মুকার্‌রমায় একত্রিত হন। মকবুল হজ্জ সম্পাদনকারীর কোন গুনাহ থাকে না। নিস্পাপ হয়ে উঠে একজন নিষ্ঠাবান হাজী। কবি কায়কোবাদ তাঁর কবিতায় হজ্জ এবং এতদ্ববিষয়ে বর্ণনা পেশ করেছেন। কবি বলেন:

যেই স্থানে হজ্জ আসে প্রতি বর্ষে বর্ষে
লক্ষ লক্ষ মুসলমান হয় একত্রিত
দুর দুরান্ত হইতে এসে দলে দলে
ভক্তি ভরে এই সেই মক্কা মোয়াজ্জামা।[৫৩৫]

হাজীগণ মক্কায় হজ্জ পালন করার পর মদীনায় যান এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর রওজা মোবারক যিয়ারত করেন। পবিত্র শহর মদীনার যথেষ্ঠ গুরুত্ব রয়েছে। কবি মদীনা নগরী সমন্ধে বলেন:

এই সেই নগরী
মোস্তাফার লীলাক্ষেত্র যার পূর্ণ স্মৃতি
মদিনার অঙ্গে অঙ্গে বৃক্ষ পল্লবে
ফুলে ফলে জলে স্থলে পবন হিল্লোল
হয়েছে মিশিয়া সদা।[৫৩৬]

অন্যত্র কবি বলেন:

যে নগরী মোস্তফার রওজা মোবারক
ধরি বক্ষে, অতুলিত গৌরব সম্মান
লভিয়া হয়েছে মহাতীর্থে পরিণত।[৫৩৭]

---

৫৩৪. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯

৫৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫
৫৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮
৫৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

সাওম ও রমযানের বিবরণ

পবিত্র কুরআন অবর্তীণ হয়েছে রমজান মাসে এসম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ[৫৩৮]

"রামযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎ পথের সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবর্তীন হইয়াছে।"

রমজান মাস কুরআন অবর্তীণ হয়েছে। আর এটি মানুষের জন্য হিদায়াত। সাওম শুধু মুসলিম জাতির জন্যই ফরজ নয়, অন্যান্য জাতির উপরও এটি ফরজ ছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত বাণী প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[৫৩৯]

"হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

এ মাসে মুসলিম সমাজ সিয়াম পালনের সাথে সাথে কুরআন পাঠ, অধ্যয়ন ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করে থাকে। আর তারাবীর সালাতে পবিত্র কুরআন খতম করতে সচেষ্ট হয়। ঘরে ঘরে মসজিদে মসজিদে ইবাদাত বন্দেগীর জোয়ার বয়ে যায়। কবি এ সম্পর্কে বলেন:

যেখানে রমজান মাসে নিশীত সময়ে
তারাবির প্রতিশব্দ বায়ু স্তরে স্তরে
ভ্রমিয়া, উদাস প্রাণ প্রকৃতি হৃদয়ে
ঢালিত অমৃত, সৃষ্টি আকুলিত করে।[৫৪০]

---

৫৩৮. *আল-কুরআন*, ২ : ১৮৫

৫৩৯. *আল-কুরআন*, ২ : ১৮৩

৫৪০. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

কবি কায়কোবাদ বহু কবিতায় সাওম ও তারাবীহ বিষয়টি উঠে এসেছে। রমজান মাস আসলে মুসলিম সমাজে ইবাদাতের যে একটি চিত্র ফুটে, তা তিনি তাঁর বহু কবিতায় তুলে ধরতে সচেষ্টা হয়েছেন। কবি বলেন:

পবিত্র রমজান মাসে নিশীথ সময়ে
তারাবীর সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
প্লাবিয়া মসজিদ গৃহ কেমন মুধুরে
উঠিত আকাশ পথে, কুরআনের শ্লোকে
কি এক অতৃপ্তিময় মাধকতাপূর্ণ
আত্মবিস্মৃতির সুধা করিত বর্ষণ
ধর্মপ্রাণ মোস্লেমের হৃদয় কন্দরে।[৫৪১]

কবি অন্যত্র বলেন:

যেখানে রমজান মাসে নিশীথ সময়ে
তারাবির প্রতি শব্দ বায়ু স্তরে স্তরে
ভ্রমিয়া উদাস প্রাণ প্রকৃতি-হৃদয়ে
ঢালিত
অমৃত, সৃষ্টি আকুলিত করে।[৫৪২]

৫৪১. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯
৫৪২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু ও পরকালীন জীবনের বর্ণনা

এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ক্ষণস্থায়ী। এরপর আখিরাত অনন্তকালের এক জীবন। আর মৃত্যুর পর সকলকে আখিরাতে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[৫৪৩]

"যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, আমরাতো আল্লাহরই এবং নিশ্চিত ভাবে তাঁহার দিকেই প্রর্ত্যাবর্তনকারী।"

মৃত্যু অনিবার্য এক মহাসত্য। পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল বর্ণের মানুষের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। কবি কায়কোবাদ এ বিষয়ে বিশ্বাস রাখেন যে, আমাদের অবশ্যই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে, কবি বলেন:

রবি শশী গ্রহ তারা অনন্ত গগন,
চেয়ে আছে এক প্রাণে সদা উধ্বা কার্ন
অই স্থানে জীবাত্মার পূর্ণ-সংমিলন:
জীবনের শেষ স্মৃতি, মুক্তির সোপান,[৫৪৪]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ[৫৪৫]

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে"

অনত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ-وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ[৫৪৬]

"ভূপৃষ্টে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিময়, মহানুভব।"

---

৫৪৩. *আল-কুরআন*, ২ : ১৫৬

৫৪৪. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫৪৫. *আল-কুরআন*, ৩ : ১৮৫

৫৪৬. *আল-কুরআন*, ৫৫: ২৬-২৭

এ বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর প্রাণী মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। কবি কায়কোবাদ এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন। তিনি কুরআনের আয়াতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন:

এই খেয়া ভিন্ন আর নাহিক উপায়
রাজা কিংবা মহারাজা
অথবা দরিদ্র প্রজা
সকলেরি এই পথে যেতে হবে হায়।[৫৪৭]

মৃত্যু মানব জীবনের এক অনিবার্য মহাসত্য। যার জন্ম আছে তার মৃত্যু অবধারিত। আর জন্ম এবং মৃত্যুতে মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। মৃত্যুর পর ধন-সম্পদ ধনী ব্যক্তির কোন কাজে আসে না তেমনি দরিদ্র ব্যক্তিরও তা কোন কাজে আসে না। ধনী ব্যক্তিকে যে বেশে সমাহিত করে দরিদ্র ব্যক্তিকে একই বেশে সমাহিত করে - এক্ষেত্রে কোন ব্যবধান নেই। তাই কবি বলেন:

মাতৃ-গর্ভ হতে বিশ্বে লভেছ জনম
একই বেশে তুমি আর অই ভিখারিনী
শ্মশানে একই বেশে করিবে শয়ন
কোথা রবে তোমার এধন রত্নমনি?[৫৪৮]

কবির উপলব্ধি হচ্ছে, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ মুক্তি পাবে না এবং মৃত্যু যবনিকার মধ্য দিয়ে ধনী-দরিদ্রের চিহ্ন মুছে যাবে। কবরস্থান অথবা শ্মশানে কে ধনী কে দরিদ্র তা তুলনার কোন উপায় নাই। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কোন সহায়তাকারী থাকবে না - না ধনীর না দরিদ্রের থাকবে শুধু নিজ আমল। কবি বলেন:

উভয়ের মৃতদেহ রাখিলে শ্মশানে,
কে চিনিতে তুমি রাজা, সে যে ভিখারিণী?
রাজার কি চিহ্ন বল থাকিবে সেখানে
কে চিনিবে সে দরিদ্র, তুমি মহাধনী?[৫৪৯]

---

৫৪৭. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
৫৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩
৫৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

জগতে এমন মানুষ বহু আছে যারা ফুলশয্যায় রাত্রি যাপন করে, যখন মৃত্যু বরণ করে তখন কিন্তু সাথে সাথেই তাকে খাটিয়ার মধ্যে রাখা হয়। বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত-সুখী ব্যক্তি যেমন খাটিয়ায় সওয়ার হয়, তেমনি হতদরিদ্র ব্যক্তিও একই নিয়মে একই বেশে খাটিয়ায় চরে কবরস্থানে চলে যায়। এখানে কোন ভেদাভেদ নেই। কবি যথার্থই বলেছেন:

মরণের পরে ভাই, রাখিবে একই স্থানে
সম্রাটের দেহ, আর
ভিক্ষুকের দেহ।
কে ছিল সম্রাট? আর কে ছিল ভিক্ষুক ভাই
শত দেখে তাহাদেরে
চিনিবে না কেহ![৫৫০]

মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের কোন সহায় সম্বল থাকবে না, থাকবে শুধু তাঁর আমল-কৃতকর্ম। এসর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ[৫৫১]

"কেহ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে।"

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের দিকে লক্ষ্য করে কবি কায়কোবাদ বলেন:

সাধনা তপস্যা যত সকলই নিষ্ফল
জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কর্ম
আপনার কর্মগুলি সাথের সম্বল।[৫৫২]

উপর্যুক্ত পঙক্তিগুলির মধ্যে আমরা কবির আধ্যাত্মিক মানসিকতার পরিচয় পাই। কবি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ছিল ইসলাম। যা তিনি তাঁর কাব্যের পরতে পরতে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন।

---

৫৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮
৫৫১. *আল-কুরআন*, ৯৯ : ৭-৮
৫৫২. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে একদিন সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। অত:পর অন্ধকার কবর হবে ঠিকানা। কবি কবরের জীবনের বাস্তবতাকে গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। তবে কবির মনে সাহস ছিল। তিনি কবরকে ভয় পেতেন না বরং ভালবাসতেন। কবি মনে করতেন এটা তাঁর বাসস্থান, এখানে তাকে যেতেই হবে। এই কঠিন বাস্তাবতা কবিকে কবরের সাথে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। কবি যথার্থই বলেছেন:

সমাধি তোমারে আমি কত ভালবাসি
জীবনের কত সাধ কত বাদ বিসম্বাদ,
কত সুখ-কত দু:খ, কত কান্না হাসি,
অহংঙ্কার দর্প গর্ব তোমাতেই হয় খর্ব
রাজায় রাজত্ব যায় তোমাতেই মিশি[৫৫৩]

৫৫৩. *আবুল ফজল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিম পর্বসমূহের বর্ণনা

মুসলিম পর্বের প্রতি কবি কায়কোবাদের যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। তিনি এই পর্বগুলোর বিবরণ তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যসমূহের বহুস্থানে বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানের দিবস ও রজনীর কথা ভক্তি ভরে উল্লেখ করেছেন।

ঈদের বর্ণনা

মুসলিম পর্বগুলোর মধ্যে ঈদ উৎসব অন্যতম। ঈদ মানুষের মাঝে আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে। সে সর্ম্পকে কবি বলেন:

কুহেলির অন্ধকার সরাইয়া ধীরে ধীরে ধীরে
উঠেছে ঈদের রবি উদয়-অচল গিরি-শিরে?
অই হের বিশ্বভূমে কি পবিত্র দৃশ্য সুমহান!
প্রকৃত আনন্দময়ী চারিদিকে মঙ্গলের গান![৫৫৪]

কবি ঈদের আনন্দকে শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ করতে রাজি নয়। তিনি মনে করেন ঈদের আনন্দে মেতে উঠবে কুল কায়েনাত তথা সমগ্র সৃষ্টি নিচয়। কবি বলেন:

'ঈদ ঈদ বলে আজি বিশ্ব মাঝে পড়ে গেছে সাড়া,
জীবজন্তু পশুপাখী সবি যেন সুখে আত্মহারা!
কুসুমিত কুঞ্জবন- ফুলে ফুলে শ্যামল পল্লবে
সাজায়ে রেখেছে গৃহ অতিথি আসিবে আজি ভবে![৫৫৫]

তবে তিনি এও বলেছেন যে, ঈদ শুধু আনন্দের বিষয় নয় এ হচ্ছে এক জাতীয় সম্মিলন। ঐক্য সৃষ্টির জন্যই মহান স্রষ্টা এ ঈদ উৎসবের প্রবর্তন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا[৫৫৬]

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।"

---

৫৫৪. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৫৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
৫৫৬. *আল-কুরআন*, ৩৩ : ১০৩

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون [৫৫৭]

"মুমিনগন পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর। যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"

পবিত্র কুরআনের এই অমিয় বাণী আজ মুসলিম জাতি বিস্মৃত হয়েছে। শতধা বিভক্তি এই শ্রেষ্ঠ জাতিকে দুর্বল থেকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে । আর এজন্য প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। ঈদ উৎসব প্রতি বছর এই ঐক্যেরই আহবান জানায়। কবি বলেন:

এ ত নহে শুধু ভবে আনন্দ উৎসব ধূলাখেলা,
এ শুধু জাতীয় পূণ্য মিলনের এক মহামেলা!
জাগাইতে মোহমুগ্ধ স্বার্থপর নরনারীগণ
এই "ঈদ" বিধাতার বিশ্বব্যাপী উদ্বোধন।[৫৫৮]

কবির আশা এই ঈদের সম্মিলনে সবাই একিভূত হয়ে এক মন, এক প্রাণ নিয়ে পবিত্র ইসলামের গৌরবময় অতীত ফিরিয়ে আনবে। সুমহান ইসলামের গৌরবোজ্জল অতীত ঐতিহ্য আজ অশ্রুজলে ভাসছে। এহেন পরিস্থিতির মুলোৎপাটন ও অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার উপায় হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। ঈদ উৎসব প্রতি বছর দু'বার আমাদেরকে এই ঐক্যের আহবান জানায়। কবির সর্বশেষ আকাঙ্খা এভাবেই ফুটে উঠেছে:

আজি এ ঈদের দিন হ'য়ে যাবে এক মনঃপ্রাণ
জাগায়ে মোশ্লামেয় সবে গাহ আজি মিলনের গান।
ডুবিবে না তবে আর ঈদের এ জ্যোতিস্মান রবি,
জীবন সার্থক হবে, ধন্য হইবে এ দরিদ্র কবি।[৫৫৯]

---

৫৫৭. *আল-কুরআন*, ৪৯ : ১০

৫৫৮. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬- ৪৭

৫৫৯. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৭

শবে কদরের বিবরণ

শবে কদর মুসলিম পর্বের অন্যতম অনুসঙ্গ। এমনকি শবে কদরই সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী। এই রজনী হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কিত একটি স্বতন্ত্র সুরাই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ[৫৬০]

"নিশ্চয়ই আমি একে (পবিত্র কুরআন) কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। আপনি কি জানেন লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদর হচ্ছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, এ রাত্রে জিব্রাইল (আ:) ও ফেরেশতারা প্রত্যেক কাজে অবতীণ হয় তাদের রবের ইচ্ছায়। আর শান্তিই শান্তি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।"

হাদীসেও এ রাত্রির বহু ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ রাত তালাশ করার জন্য মহানবী (স.) মুসলিম জাতিকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন। এ রাতের মর্যাদার কারণ হচ্ছে পবিত্র কুরআন এ রাতেই অবর্তীণ হয়।

কবি কায়কোবাদ এ রাত্রের মহিমায় কবিতা রচনা করেছেন। এ রাতে যেন সকল মুসলিম নর-নারী ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে সওয়াব অর্জন করে পরকালের নাজাতের ব্যবস্থা করে, সে জন্য কবি ব্যকুল হয়ে সবাইকে আহবান করেছেন। কবি বলেন:

আজি-শুভ রজনীর, পুণ্য মুহূর্তে
আসিবে সে জন
অবনীতলে!
ব্যজনিতে তারে ঝুরু ঝুরু ঝুরু,
সমীর বহিবে ছলে!
গ্রহ-উপগ্রহ, তারকামণ্ডল
সবাই হইবে
আপনহারা![৫৬১]

---

৫৬০. *আল-কুরআন*, ৯৭ : ১-৫

কবি তার হতভাগ্য জাতিকে শবে কদর থেকে উপকার গ্রহণ করতে ব্যকুল হৃদয়ে এ ভাবেই ডেকে উঠেন:

আজি, পুণ্য প্রেমের পুণ্য পরশে
বহিবে জগতে
অমিয়-ধারা!
হতভাগ্য নর!
আজি, -জড় ও অজড়, ধন্য হইবে
তাহারি চরণ চুমে!
তোরা কেন আজ, ঘুমের আলসে
রহিলি পড়িয়া ভূমে?[৫৬২]

অতঃপর কবি মুসলিম জাতিকে সকল আলস্য ছেড়ে লাইলাতুল কদরে ইবাদতের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য হাসিলের আহবান জানান। কবি যেন লাইলাতুল কদরের মহিমা দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছেন। কবি বলেন:

দীনতা-হীনতা, শঠতা-নীচতা,
উঠ্ রে সজোরে, ঠেলি!
অই যে তোদের হৃদয়ের ধন
অই যে তোদের বাঞ্ছিত রতন
দেখ্- দেখ্-দেখ্
তোরা-দেখ্‌রে নয়ন মেলি![৫৬৩]

তারাবীহ সম্পর্কে কবি বলেন:

তারাবীর সুধাস্বরে মধুর আজানে
কোরানের পূণ্য শ্লোকে লালিত ঝঙ্কারে
কত সুধা ঢেলে দিতে মোশ্লেমের প্রাণে
আজি তা কোথায় হায় জিজ্ঞাসিব কারে?[৫৬৪]

---

৫৬১. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৮-৪৯
৫৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯
৫৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

কবি অন্যত্র বলেন:

তারাবীর সুধাস্বর তরঙ্গে তরঙ্গে
প্লাবিয়া মস্‌জিদ গৃহ কেমন মধুরে
উঠিত আকাশ পথে, কোরানের শ্লোকে
কি এক অতৃপ্তিময় মাদকতাপূর্ণ
আত্মবিস্মৃতির সুরা করিত বর্ষণ
ধর্মপ্রাণ মোস্লেমের হৃদয়-কন্দরে।[৫৬৫]

রমজান মাস ইবাদত-বন্দেগীর মাস। এ মাসে রাসূল (সা.) এর ইবাদত ও দানের মাত্রা অন্যান্য মাসের চেয়ে হাজার গুণ বেড়ে যেতো। কবি রমযান মাসে রাসূল (সা.) এর পদাংক অনুসরণ করে মুসলিম সমাজকে বেশি বেশি দান-খয়রাত ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকার আহ্বান জানান। কবির ভাষায়:

পবিত্র রমজানে আর ঈদ মোহরামে
ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত মোশ্লেমসকল
সানন্দে করিত দান দীন দু:খীজনে
সাধ্য মত;[৫৬৬]

ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহমের বিবরণ

মুসলিম সমাজ তার পূর্ববর্তী সাধক পুরুষদের সম্মান ও মযার্দা দিতে কার্পণ্য করে না। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জীলানী (রহ.) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ। তাঁর তিরোধান দিবসকে ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম বলা হয়ে থাকে। এ দিনেও মুসলিম সমাজ নানাবিদ ইবাদাতে লিপ্ত হয়ে মহান খোদার সান্নিধ্য কামনা করে। কবি এ দিনটির স্মরণ করেছেন এ ভাবে :

ফাতেহা দোয়াজ দাহমে, এ পবিত্র দিনে
রাজ-গৃহে – নগরের প্রতি ঘরে ঘরে
মৌলুদ হইত পাঠ, ভক্ত মুসলমান
সারা রাত্রি জেগে জেগে পড়িত কোরান এক মনে,[৫৬৭]

---

৫৬৪. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৫৬৫. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭
৫৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
৫৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উপকার ও কল্যাণ কামনা

মানুষ সামাজিক জীব এবং সৃষ্টির আদি থেকে সমাজবদ্ধ ভাবেই বসবাস করছে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ পরস্পর একে অন্যের প্রতি বেশ কিছু অধিকার রয়েছে। মানুষের উপর মানুষের প্রথম অধিকার হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখা। একজন প্রকৃত মানুষ সম্পদ ও ক্ষমতাবলে অন্য কোন মানুষকে অপমান, অবহেলা ও হেয় করতে পারে না। কবি মনে করেন একজন মানুষ অন্য মানুষের উপকার ও কল্যাণ কামনা করবে- এটাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। কবি বলেন:

জ্বেলে দেও ওহে সাকি ঈমানের নূর;
হাসিয়া উঠুক ধরা,
দুরে যা'ক জ্বরা মরা,
স্বর্গ ও মরতে যেন নাহি থাকে দূর![৫৬৮]

কবি মনে করেন মানুষ মানুষের জন্য, কে ধনী কে দরিদ্র এটা বিবেচ্য বিষয় নয়, নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে অন্যের উপকারে এগিয়ে আসাই মানব ধর্ম। ক্ষমতা ও অর্থের অহঙ্কার কোন প্রকৃত মানুষের মাঝে থাকতে পারে না। কবি বলেন:

ভু'লে গিয়ে আত্মপর
ধনরত্ন বাড়ী ঘর
বলি দিয়া পরার্থে সে স্বার্থের অসুর!
পথে ঘাটে দিবা নিশি,
থাকি যেন ধূলে নিশি,
মায়া মোহ হিংসা দ্বেষ সবি করে চুর।[৫৬৯]

---

৫৬৮. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৫৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

মানুষের কল্যাণে কাজ করা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। মানুষ মানুষের উপকার করবে –এটাই স্বাভাবিক বিষয়। কেননা একজন মানুষ আরেকজনের ভাই। মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'আলা অন্যের কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লা তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ[৫৭০]

"তোমরাই উত্তম জাতি এবং মানুষের কল্যাণে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে।"

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন,

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ[৫৭১]

"আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে দু:খ ক্লেশে ও সংগমে-সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা, যাহারা সত্যপরায়ন এবং ইহারাই মুত্তাকী।"

কবি কায়কোবাদ মানুষের কল্যাণকামীতায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। মানবসেবাকে তিনি মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

অতএব ধর বাক্য - ত্যাজি অহঙ্কার
প্রাণপণে সকলের কর উপকার।
পরম ধরম - ধন করহ সঞ্চয়,
থাকিতে থাকিতে ত্বরা থাকিতে সময়।[৫৭২]

---

৫৭০. *আল-কুরআন*, ৩ : ১১০

৫৭১. *আল-কুরআন*, ২ : ১৭২

৫৭২. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩

মানুষের উপকার করতে না পারলে, অপকার করতে নেই। অন্যের অনিষ্ট পাপ বৈ কিছুই নয়। আবার পরোপকার করতে যেয়ে যেন অন্যায় ও অপরাধকারীকে প্রশ্রয় দেয়া না হয়। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

পরের অনিষ্ট - চেষ্টা মহাপাপ ভবে,
পর উপকার ধর্ম, কিন্তু তাই বলি
দুষ্টরে প্রশ্রয় দিতে শাস্ত্রে নাহি বলে!
দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন
ইহাই শাস্ত্রের বিধি।[৫৭৩]

সাধারণভাবে মানুষ মনে করে সুখ হচ্ছে অর্থবিত্ত আর ক্ষমতায়। কিন্তু প্রকৃত সুখ সম্পদ ও ক্ষমতায় পাওয়া যায় না। প্রকৃত সুখ হচ্ছে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে পরের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে পারলে সুখী হওয়া যায়। এ সম্পর্কে কবি তাঁর উপলব্ধি নিম্নের পঙক্তিতে ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন:

ধনরত্ন সুখৈশ্বর্য্য কিছুতেই সুখ নাই,
সুখ পর-উপকারে, তারি মাঝে খোঁজ ভাই
"আমিত্ব"কে বলি দিয়া স্বার্থ ত্যাগ কর যদি,
পরের হিতের জন্য ভাব যদি নিরবাধ।
নিজ সুখ ভুলে গিয়ে ভাবিলে পরের কথা,
মুছালে পরের অশ্রু- ঘুচালে পরের ব্যাথা।[৫৭৪]

নিজেকে যারা পরের জন্য বিলিয়ে দিতে পারবে তারাই সুখ পাবে এবং সুখী মানুষের অভিধায় অভিহিত হবে। কবি বলেন-

আপনাকে বিলাইয়া দীন দু:খীদের মাঝে,
বিদুরিলে পর দু:খ সকালে বিকালে সাঁঝে!,
তবেই পাইবে সুখ আত্মায় ভিতরে তুমি,
যা রুপিবে - তাই পাবে, এ সংসার কর্মভূমি![৫৭৫]

---

৫৭৩. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
৫৭৪. *আবুল ফজল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

মানুষের প্রতি দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শন ইসলামের অন্যতম অনুসঙ্গ। এমনকি পরাজিত শত্রুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন করাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। মহানবী (স.) বদর যুদ্ধে বন্দী মুশরিকদের প্রতি যার পর নাই দয়া প্রদর্শন করেন। নিজেরা না খেয়ে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এক পর্যায়ে মুক্তিপণের মাধ্যমে তাদের মুক্তিও দিয়েছেন। কবি কায়কোবাদ এ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। কবি বলেন:

কহিলা ভৎর্সনা করি এ নহে বীরত্ব,
পরাজিত সৈন্যদলে হত্যা করা প্রাণে?
মরার উপর খাড়া? –কোন্ শাস্ত্রে আছে?
পরাজিত সৈন্য পরে করে যে আঘাতে
পশু সে, মানব নহে; এ পশু বিধান
পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে- নাহি কোন কালে![৫৭৬]

ইসলামের যুদ্ধনীতি সর্ম্পকে কবি কায়কোবাদের যথেষ্ট জানাশুনা ছিল। তাই তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন। পরাজিত শত্রু সৈন্যের উপর আঘাত করা ইসলাম সমর্থন করে না। এটা বীরত্বের অংশও নয়। কবি এটা জানতেন ও মানতেন। তাই উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিতে তা পরিদৃষ্ট হয়েছে। এখানে কবি আহমদ শাহ আবদালীর বাচনিক ভঙ্গিতে পরাজিত মারাঠা সৈন্যদের হত্যা করতে বারণ করেছেন।কবি বলেন:

কেনরে পাষাণ্ডগণ মোস্লেম হইয়া
পাপ কার্য্যে এত লিপ্ত? জানিস্‌নে তোরা
ইসলাম ধর্ম্মের বিধি? স্নেহ ও মমতা
দয়া ধর্ম্ম সব কিরে হয় তেয়াগিতে
যুদ্ধার্থে সৈনিক ব্রত করিলে গ্রহণ?[৫৭৭]

---

৫৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
৫৭৬. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
৫৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২

আহমাদ শাহ আবদালী যখন জানতে পারেন, পরাজিত মারাঠাদের উপর কতিপয় সৈনিক আক্রমণ করে মৃত্যু মুখে নিক্ষেপ করতে সচেষ্ট হয়েছে। তখন তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজ সৈন্যদের ভর্ৎসনা করেন। তিনি তার যুদ্ধনীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন:

কতদিন যুদ্ধকালে বলেছি তোদেরে
করিস্ নে অস্ত্রাঘাত পারাজিত জনে।
রমণী বালক আর মৃত দেহ পরে
করিস্ নে অত্যাচার, পরাজিত দেশে
করিস্ নে প্রপীড়িত নিরীহ প্রজারে।
তাহাদের শস্য ক্ষেত্র, ফলবান তরু
করিস্ নে নষ্ট কভু, নিস নে লুণ্ঠিয়া
ধন রত্ন, সে কথা কি গিয়াছিস্ ভুলে?[৫৭৮]

কবি কায়কোবাদ মনে করেন মানবজীবন অনর্থক নয় - এটা শুধু ফাঁকি নয়। এ জীবনে অনেক কিছু করার আছে। জীবনটা সুন্দর ও সুষমাময় করতে প্রয়োজন ত্যাগের মানসিকতা। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্রের পাশে দাঁড়াতে হবে, দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও তাদের জন্য সাধ্যমতো উপকার করতে হবে - তবেই জীবন হয়ে উঠবে অর্থবহ। কবি বলেন:

প্রতিবেশী, আত্মীয়ের দেশবাসী দরিদ্রের
সাধ্য মত উপকার
ক'র সদা তুমি।
মানব জীবন হায়, নিশায় স্বপন প্রায়,
পশ্চাতে থাকিবে প'ড়ে
তব কর্ম্ম-ভূমি![৫৭৯]

ইয়াতিমের অধিকার ও মর্যাদা প্রদানে ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا[৫৮০]

৫৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১২-৩১৩

৫৭৯. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

"তোমরা আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না, এবং পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"

কবি কায়কোবাদ সাধারণ মানুষের কবি ছিলেন। তিনি দীনহীন ও দরিদ্র মানুষকে নিয়ে ভেবেছেন। ভেবেছেন পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের নিয়ে। তিনি সমাজকে মানব সেবায় সচেতন করতে যেয়ে বলেন:

পিতৃ-মাতৃহীন শিশু, যাহাদের কেহ নাই
পথে ঘাটে প'ড়ে কাঁদে
অনাহারে থাকি?
তাদের আদর ক'রে খে'তে দিও পেট ভরে,
হাত বুলাইয়া শিরে
কাছে এ'নে ডাকি।[৫৮১]

কবি বিশ্বাস করতেন পরোপকার করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই বরং এর মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠে। অন্যের উপকারের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ তার সংক্ষিপ্ত জীবনকে স্বার্থক করে তুলতে পারে। কবি বলেন:

সাধ্য মত তুমি তার
কর উপকার!
সার্থক হইবে তবে
জীবন তোমার!
সৃষ্টিকর্তা তুষ্ট হবে
তব কর্ম দেখি
মানব জীবন ভাই
নহে শুধু ফাঁকি![৫৮২]

---

৫৮০. *আল-কুরআন*, ৪ : ৩৬

৫৮১. এম.এ. মজিদ, *মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

৫৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইসলামের কতিপয় অনুশাসনের বিবরণ

ইসলাম মানব জাতিকে সমাজের শৃংখলা বিধানের জন্য অনেক অনুশাসন নির্ণয় করে দিয়েছে। এই অনুশাসনগুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমে একটি জাতি সভ্যতার চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হবে। কুরআন ও হাদীসে এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কবি কায়কোবাদের কাব্যেও তা অকৃত্রিমভাবে ফুটে ওঠেছে।

মদ্যপান হারাম

আল্লাহ তা'আলা মদ্যপান হারাম করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ[৫৮৩]

"লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক। লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কী তাহারা ব্যয় করিবে, বল, যাহা উদৃত্ত। এইবাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[৫৮৪]

"হে মুমিনগন, মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফল কাম হইতে পার।"

---

৫৮৩. *আল-কুরআন*, ০২ : ২১৯

৫৮৪. *আল-কুরআন*, ০৫: ৯০

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[৫৮৫]

"শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?"

কবি কায়কোবাদ ইসলামী শরীরাহ একজন খাঁটি অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাব্য ইসলামী অনুশাসনের বিষয়টিও ফুটে উঠেছে। 'শিব মন্দির' কাহিনী কাব্যের অন্যতম চরিত্র সদরুদ্দীনের উক্তির মাধ্যমে কবির মনোভাবে প্রতিফলন আমরা লক্ষ্য করেছি। কবি বলেন:

তোমরা মুসলিম জাতি; কোরানের বিধি
না মানিয়া, কেন ছি ছি বিধর্মীর মত
কর পাপ আচরণ? ভয় নাহি মনে?
মোস্লেম হইয়া, ছি ছি জাননা তোমরা
পবিত্র ইস্লাম ধর্মে-মদিরা হারাম।[৫৮৬]

আত্মহত্যা কবিরা গুনাহ

ইসলামী শরীয়াহ আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا[৫৮৭]

"আল্লাহ্ যাহারা হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছেই।"

---

৫৮৫. *আল-কুরআন*, ৫ : ৯১
৫৮৬. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
৫৮৭. *আল-কুরআন*, ৪ : ২৯-৩০

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا[৫৮৮]

"এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তি ভোগ করিবে।"

কবি তার 'শিব মন্দির' কাব্যে বিষয়টি পাঠকদের সামনে নিয়ে এসেছেন। কবি বলেন:

তারি দোষে ভার্যা তার অভিমানভরে
করি আত্মহত্যা হায় পাপের সাগরে
ডুবিয়াছে চিরতরে; সে যদি তখন
বুঝিত, অধর্ম-পথে করি বিচরণ
না বাড়া'ত এত পাপ।[৫৮৯]

নারীর মর্যাদা

নারী অর্ধেক পৃথিবী, অর্ধেক সভ্যতা, অথচ যুগে যুগে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম নারীদের মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, কন্যা সর্বোপরি একজন মানুষ হিসেবে তার সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কুরআনে নারীকে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করে, ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا[৫৯০]

৫৮৮. *আল-কুরআন*, ২৫ : ৬৮
৫৮৯. কায়কোবাদ, *শিব মন্দির*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
৫৯০. *আল-কুরআন*, ৪ : ০১

"হে মানব মন্ডলী। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন। যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী ছড়াইয়া দেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর তাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রশ্ন কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে কবি কায়কোবাদ সোচ্চার ছিলেন। তিনি ব্যক্তি জীবনেও নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর জীবনে যে সব নারী এসেছিল তাদের প্রতি তিনি আজীবন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্রতিটি নারীর মাঝে মা, ভাগিনী, স্ত্রী ও কন্যার ছায়ারূপ দেখতে পেতেন। কবি বলেন:

মা তুমি; ভগিনী তুমি
তুমি দারা মেয়ে।
নিয়তির চক্রদোষ, ভাঙিলে প্রাণের দোর
থাক তুমি হৃদি মাঝে
প্রাণখানি ছেয়ে।[৫৯১]

কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানব জাতির পক্ষ থেকে মাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন এবং মাতৃজাতির অনিঃশেষ ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন:

শৈশবে জননী তুমি
রেখে হৃদি পর।
শূন্য দিয়ে পাল জীবে,
কয়টি বছর।
তুমি যদি না জন্মিতে, এ অমিত্য অবনীতে
হত না মানব সৃষ্টি
ত্রিদিবের ফুল।[৫৯২]

---

৫৯১. *আবুল ফজল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
৫৯২. কায়কোবাদ, *কবি ও কবিতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

কবির ধারণা মানব সভ্যতায় নারী জাতির অসীম অবদান। স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা নারী জাতির অনিবার্য গুণ। আর এ গুণের অস্তিত্বও আজ বিশ্ব চরাচরে খুঁজে পাওয়া যেতো না যদি না নারী জাতির সৃষ্টি না হতো। কবি বলেন:

স্নেহ প্রীতি দয়ামায়া, বিধির করুণা ছায়া
থাকিত না রশ্মিমাঝে
ধরণী হইত তবে
মরা সমতল।[৫৯৩]

কবি কায়কোবাদ নর-নারীকে আলাদা করে দেখতেন না। তিনি উভয়কে দেখতেন সমান হিসেবে। একই বৃন্তে দু'টি ফুলের মতো নারী ও পুরুষ। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে কাজ পুরুষ করতে পারে তা সমান ভাবে নারীও তা করতে পারবে। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

পুরুষ রমণী দু-ই মানব-সন্তান
কি প্রভেদ এ উভয়ে ঈশ্বর সমীপে?
যে কার্যে পুরুষ দক্ষ, সে কার্যে কি কভু
রমণী জাতির দ্বারা হয় না সাধিত?[৫৯৪]

কবি মনে করেন বহু নারী এমন আছে যারা পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং ইহিতাসের পরতে পরতে এমন নারী আছে যারা মানব সভ্যতায় অনবদ্য অবদান রেখেছে। কবি এও মনে করেতেন যে, নারী শুধু কামের পুতুল নয়, ভোগ বিলাসের বস্তুনয় এবং বনফুলের মতো ঝরা বস্তুও নয়। নারী মানব সভ্যতার এক অনিবার্য আরাধ্য বস্তু ও অংশীদার। কবি যথার্থই বলেছেন:

নারী জাতি নহে বন-ফুল
ঝরিয়া পড়িবে ঝড়ে, গলিয়া যাইবে
সূর্য করে, কিংবা নহে কামের পুতুল
ভোগ বিলাসের বস্তু, দেবী তারা ভবে!

---

৫৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
৫৯৪. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

পুরুষের মত তারা এ বিশ্ব জগতে

সাধিতে আপন কার্য নহে হীনবল।[৫৯৫]

নারী জাতির প্রতি কবির অনিঃশেষ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় তার প্রায় প্রতিটি সাহিত্য কর্মেই পাওয়া যায়। বিশেষত তার কাহিনী কাব্য সমূহ নারীর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি পরিদৃষ্ট হয়। কবি মহরম শরিফ কাহিনী কাব্যে ইমাম হাসান (রহ.) এর বাচলিত ভঙ্গিতে বলেন:

সব কার্যে কিছুতেই লোভ নাহি রাখা,

ইন্দ্রিয়কে জয় করা, স্ত্রী জাতিরে ভাবা

মাতৃ সম, পর পুত্রে নিজ পুত্র সম।[৫৯৬]

দেশ প্রেম

মুসলিম মনীষীবৃন্দ বলেন, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশের প্রতি ভালোবাসা রাখা সুন্নতও বটে। মহানবী (স.) হিজরতের সময় তার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা মোকাররমার দিকে বার বার ফিরে তাকাচ্ছিলেন এবং পবিত্র চোখ মোবারক দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরে পড়েছিলো।কবি কায়কোবাদও নিজের দেশকে ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর কবিতায় দেশের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রিয় মাতৃভূমির জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করে কবি তাদের প্রশংসা করেন। আর যারা মাতৃভূমির দুর্দিনে অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসে না তাদের ভর্ৎসনা করে কবি বলেন:

ধিক্ সে পামরগণে শত শত ধিক্

দেশের লাগিয়া যেই, না দেয় জীবন

তার সম এ জগতে পাতকী অধিক,

আছে কি আছে, কি আর? বঙ্গবাসীগণ।[৫৯৭]

---

৫৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

৫৯৬. কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩. পৃ. ৩৮

কবি তার প্রিয় জন্মভূমির নানাবিদ সমস্যা অবলোকন করত: যার পরনাই ব্যথিত ও মর্মাহত হন। তার হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায় প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দশা দেখে। কবি বলেন:

মাতঃ জন্মভূমি

তোমার এ দুরদর্শা করি দর্রশন

আপন হৃদয় হায়, বিগলিয়া যায়

কি আর বলিব মাগো, শেষ নিবেদন

রেখে মনে, দীনহীন লইনু বিদায়।[৫৯৮]

'মহাশ্মশান' কাব্যের অন্যতম অনুঘটক সুজাউল্লাহর স্ত্রী সেলিনা বেগম দেশ ও জাতির জন্য ভীষণ চিন্তিত। তিনি তার হীরার গহনা তার স্বামীর হাতে তুলে দেন যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করার জন্য। তাঁর কথায় ফুটে উঠে স্বজাতির প্রতিহৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। তাঁর বাচনিক ভঙ্গিতে কবি কায়কোবাদ বলেন:

মোস্লেম সন্তান যিনি, উচিত তাহার
আপনার প্রাণ দিয়া এ ধর্ম–সমরে
রক্ষিতে স্বজাতি-ধর্ম-প্রিয় জন্মভূমি![৫৯৯]

'মহাশ্মশান' কাহিনী কাব্যের অন্যতম চরিত্র অমরেন্দ্ররূপী আতা খাঁ। আতা খাঁ ভালোবাসে হীরণকে। তাদের ভালোবাসায় কোন খাঁদ নেই। স্বর্গীয় ভালোবাসার এক জলন্ত নমুনা তারা। কিন্তু আতা খাঁ দেশ ও জাতির একজন সেবক। তার দেশ ও জাতির শত্রু মারাঠা বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। সে অবস্থায় আতা খাঁ হীরণকে ফিরিয়ে দেয়। সে প্রধান্য দেয় দেশ ও জাতির সঙ্কট মোকাবেলাকে। তাঁর বিশ্বাস দেশের জন্য জীবন দিলে পরকালে প্রিয়তমার সাথে অবশ্যই মিলন হবে। কবির ভাষায়:

জন্মভূমি জননীর তরে
প্রাণ দিলে ধর্মযুদ্ধে পবিত্র প্রেমের
পুরস্কার অবশ্যই পাব পরকালে
জীবনের পরপারে বিধাতার কাছে।[৬০০]

---

৫৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৪

৫৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৪

৫৯৯. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

অষ্টম পরিচ্ছেদ
ইসলামের গৌরব ও জাতীয় ঐতিহ্য

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ[৬০১]

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন"

ইসলাম এসেছিলো আজ হতে চৌদ্দশত বছর আগে। আরব সমাজের অবস্থা ছিলো তখন একেবারেই নাজুক। মহান প্রভুর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর আনীত আদর্শ তখনকার সবচেয়ে মন্দ মানুষটিকেও স্বর্ণ মানবে পরিণত করে।

মহানবী (স.) এর তিরোধানের পর এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুপম আদর্শ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এরপর ইসলাম পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রান্তে ইসলামের অনুসারীরা মহানবী (স.) এর রেখে যাওয়া সুমহান আদর্শ পৌঁছে দেয়।

এই সুদীর্ঘ সময়ে ইসলামের অনুসারীরা বিশ্বব্যাপী এক অনন্য সভ্যতা উপহার দেয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন ও বিচার, সুশাসন ও ন্যায়পরায়ণতা, স্থাপত্য ও সংস্কৃতিতে মুসলিম শাসকগণ এক অনন্য অবদান রাখেন। মুসমিল জাতিসত্ত্বার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিশ্ব মানবতার জন্য আশীর্বাদও বটে। কবি কায়কোবাদ স্বজাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ফলে তাঁর কবিতায় বিষয়টি ফুটে উঠেছে। কবি অতীতের গৌরবের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন:

পড়ে না কি মনে সেই অতীত গৌরব?
সুদূর আরব ভূমে যেই বীর জাতি
মধ্যাহ্নে মার্তণ্ড প্রায় প্রচণ্ড বিক্রমে
অতিক্রমি সে অনন্ত বালুকা সাগর
যাইত ছুটিয়া কত দেশ দেশান্তরে।[৬০২]

---

৬০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭
৬০১. *আল-কুরআন*, ৩: ১৯

কবি আমাদের পূর্বসুরী মুসলমানদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তাদের বীরত্ব, দয়া, সত্যতা, ন্যায় পরায়ণতা, ইসলামে একনিষ্ঠতার কথা কবি জাতির সামনে পেশ করেছেন এভাবে:

ছিল তারা বীর,
ভীরুতা কি বিন্দুমাত্র, জানিত না কভু
সেই জাতি, ভোগ-লিপ্সা ছিল না তাদের,[৬০৩]

ইসলামের সূচনালগ্নের মুসলিম জাতির সদস্যগণ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পেতেন না। সত্যের পক্ষে অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁরা কখন পিছু-পা হতেন না। আল্লাহর প্রতি অবিচল ও সুদুর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে তারা দ্বিধা করতেন না। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন:

করে অসি কটিদেশে বাঁধিয়া খর্জুর
আরবের মরুভূমে বালুকা প্রান্তরে
স্থাপিয়াছে ধর্মরাজ্য, সে মহা মরুর
প্রান্তে প্রান্তে তীরবেগে যাইত ছুটিয়া
একটু ইঙ্গিতে,[৬০৪]

ইসলামের আগমনের পর মুসলিম জাতি কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই প্রায় অর্ধপৃথিবী ইসলামের সুমহান আদর্শ এবং অনন্য শক্তি ও সাহসবলে জয় করে নিয়ে ছিলো। সেই ধারাবাহিকতায় ভারতবর্ষ মুসলিমদের করতলগত হয়। কবি এদিকে ইঙ্গিত করে বলেন:

মোস্লেমের বিজয় কেতন
উড়াইয়া ছিল যবে ভারত অম্বরে;
সেই কেতনের বক্ষে স্বর্ণবিমণ্ডিত
'অর্ধচন্দ্র' মোস্‌লেমের কি শক্তি ভীষণ
করেছিল বিঘোষিত সমগ্র জগতে।[৬০৫]

---

৬০২. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৬০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
৬০৪. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকগণ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, ধর্মানুরাগী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্টপোষক। এসকল শাসক ভারতবর্ষে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। অবহেলিত, নিপীড়িত ও দলিত ভারতবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কবি ভারতের তৎকালীন চিত্রটি এভাবে তুলে ধরেছেন:

যাহার সুশুভ্র চারুমর্ম্মর চড়বে
অগণিত ছাত্রবৃন্দ সানন্দ হৃদয়ে
পঠিত কোরান গ্রন্থ সুমধুর স্বরে।
কত যে পারশী কাব্য; দর্শন বিজ্ঞান
হইত পঠিত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে।[৬০৬]

কবি মনে করেন মুসলিম সমাজ স্বধর্ম ভুলে কাফির মুশরিকদের সাথে মিলে ইসলামের সুমহান আর্দশ কে জলাঞ্জলি দিয়েছে। তারা বিস্মৃত হয়েছে তাদের জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্য। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

মোস্লেম সন্তানগণ ভুলি নিজ ধর্ম কর্ম সব,
হারায়েছে বিশ্বব্যাপী আপনার জাতীর গৌরব!
কাফেরের সনে মিশি করি সদা পাপ অনুষ্ঠান,
ডুবায়েছে চিরতরে ইস্লাম ধর্মের পূণ্য নাম।[৬০৭]

অথচ ইসলামের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিশ্বনবীর সাহাবীগণ ইসলামের সুমহান গৌরবকে উচ্চকীত করেছিলেন। তারা সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ হিসেবে ইসলামকে পরিচিত করে তুলেছিলেন। কবি বলেন:

সহস্র বৎসর গত, একবার ভেবে দেখ তুমি,
অমৃতে ছিল সিক্ত আরবের তপ্ত মরুভূমি।
যে অমৃত পাস করি মহাবীর খালেদ ওমর,
গড়েছিল ইস্লামের অভ্রভেদী চূড়া মনোহর।[৬০৮]

---

৬০৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

৬০৬. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

৬০৭ . কায়কোবাদ, সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *কায়কোবাদ রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮৯

উপসংহার

কবি কায়কোবাদ বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্য সাধনাই ছিল তাঁর ব্রত। দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন–সবটুকুই সাহিত্য সাধনায় ঢেলে দিয়েছেন। কাব্যই রচনা করেছেন বেশি, কবিতাই ছিল তাঁর প্রণয়ী। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি । শৈশব থেকেই কাব্যের প্রতি অনুরাগ। তেরো বছর বয়সেই প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ। শৈশবেই পিতা-মাতা হারিয়ে অনাথ হয়ে যান। জীবন ও জীবিকার তাগিদে চাকুরিতে যোগদান করেন। দারিদ্র্য আর কর্মজীবনের শত ব্যস্ততা কাব্য রচনায় কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি কাব্য সাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন। দারিদ্র্য, প্রেমে ব্যর্থতা ও আগলা পূর্বপাড়া গ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্য এবং ইছামতি নদীর ঢেউ আর তাঁর কবিতা নির্মাণে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এক সময় তিনি শক্তিমান কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হন। রচনা করেন অশ্রুমালার মতো অসাধারণ কাব্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে সাহিত্য বোদ্ধামহল। কবি, সাহিত্যিক ও সমালোচকগণ একে প্রাণের ধন বলে গৌরববোধ করেন। কবি সকলের নিকট প্রশংসিত হন। এরপর প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনীকাব্য ‘মহাশ্মশান’। তিনি সৃষ্টি করলেন এক নতুন ইতিহাস। এরপর শুধু কাব্যের ঝরণাধারা। সাহিত্যসাধক এ কবি মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সমকালে নেতৃত্বদানে বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। সমকালে একটি ধারণা ছিল শিক্ষিত হিন্দুরাই কেবল কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত। মুসলিম কবিগণ শুদ্ধ বাংলায় কাব্য রচনায় পারদশী নয়। কিন্তু কায়কোবাদের অশ্রুমালা প্রকাশিত হওয়ার পর এ ধারণা চিরতরে অপনোদন হয়ে যায়। মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম শুদ্ধ বাংলায় কাব্য রচনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তাঁর আরেকটি কৃতিত্ব হচ্ছে, কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের যথার্থ ব্যবহার। মধ্যযুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর অনন্য কাব্য গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে আরবী শব্দ ব্যবহার করেন। এর পরবর্তী প্রথিতযশা কবিগণ তাঁদের কাব্যে আরবী শব্দের ব্যবহার অব্যাহত রাখেন। চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে জনজীবনে বহুল ব্যবহৃত আরবী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বৃটিশ শাসনামলে বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একদল কবি-সাহিত্যিক আরবী-ফার্সী শব্দ বর্জন করতে থাকে। সমকালীন মুসলিম সাহিত্যিকসহ বাংলা সাহিত্যের

---

৬০৮ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১

প্রথিতসশা কবি-সাহিত্যিকগণ আরবী-ফার্সী শব্দ তাঁদের কাব্যে ও সাহিত্যে প্রয়োগ করতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহার করেছেন। সতেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদ সচেতনভাবেই তাঁদের রচনায় আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তবে এক্ষত্রে কায়কোবাদ তাঁদের অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনিই মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি দুভাষী পুথি সাহিত্যের ভেতর থেকে মুসলিম বাংলা সাহিত্যকে শুদ্ধ বাংলায় নিয়ে আসেন। সেই সাথে তিনি আরবী শব্দের সার্থক প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার গৌরব অর্জন করেন।

আরব বিশ্বে কালজয়ী আদর্শ ইসলামের আগমনের পূর্বেই আরবী সাহিত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইসলামের আগমনের সাথে আরবী সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের প্রভাব নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য বিনির্মাণ হতে থাকে। অতঃপর ইসলামী আদর্শ পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লে বিজিত এলাকায় শুধু আরবী ভাষা নয় আরবদের নবজাগরণের ভাবধারা তথা ইসলামী ভাবধারাও অন্যান্য সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে নেয়। এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মুসলিম কবি-সাহিত্যকগণ এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রারম্ভিক অধিকাংশ মুসলিম কবি ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ঠ ছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা পারস্য কবিদের দ্বারা প্রভাবান্নিত ছিলেন। ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য সাধনা করে যাঁরা খ্যাতির উচ্চ শিখরে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন, কায়কোবাদ তাদের অন্যতম। তিনি সমকালীন মুসলিম কবিদের মধ্যে সাহিত্যে আরবী শব্দ প্রয়োগের পাশাপাশি ইসলামী ভাবধারাপূর্ণ সাহিত্য সাধনায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে কবি কায়কোবাদের সাহিত্যে আরবী শব্দের ব্যবহার ও ইসলামী ভাবধারা বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আশা করি, বিদগ্ধ পাঠক এ অভিসন্দর্ভ পাঠ করে এ দুটি বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করবে-ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. আল কুরআনুল কারীম, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৭ খ্রি.) ৫৬তম সংস্করণ।

৩. কায়কোবাদ, মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা, এম. এ. মজিদ সম্পাদিত (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২১ জুলাই ২০০৯ খ্রি.) ২য় সংস্করণ।

৪. আবদুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.)।

৫. আবদুল জলীল, কবিও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৬ খ্রি .) ৩য় সংস্করণ।

৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৩ খ্রি.) ৩য় সংস্করণ।

৭. আবুল ফজল (সম্পাদিত), কায়কোবাদ কাব্য সংকলন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)।

৮. আবুল ফজল, কায়কোবাদ, কাব্য পরিচিতি (ভূমিকাংশ) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ)।

৯. আবদুল লতিফ চৌধুরী, কবি কায়কোবাদ, (ঢাকা: ওরিয়েন্ট পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৫ খ্রি.) ২য় সংস্করণ।

১০. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, সহীহ বুখারী।

১১. আলী আহমদ, বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.)।

১২. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারাকপুরী, অনু. খাদিজা আখতার রেজায়ী, আর রাহিকুল মাখতুম (লন্ডন: আল কুরআন একাডেমী লন্ডন, ২০১৩ খ্রি.), ২১ তম সংস্করণ।

১৩. আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), কায়কোবাদ রচনাবলী (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.) খ. ৩।

১৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, কায়কোবাদ রচনাবলীর ভূমিকা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭ খ্রি.)।

১৫. আব্দুল লতিফ চৌধুরী, কায়কোবাদ (খুলনা: অরিয়েন্টাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৫৫ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

১৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৩ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ।

১৭. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, কায়কোবাদ রচনাবলী, ভূমিকা (কুসুম কানন কাব্যের শৈশব কাহিনী কবিতা) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.)।

১৮. এম. এ. মজিদ, মহাকবি কায়কোবাদ (ঢাকা: নাজিম এন্টারপ্রাইজ এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.)।

১৯. এম. এ. মজিদ, মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা, (ঢাকা: নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

২০. এম. এ. মজিদ, মহাকবি কায়কোবাদ, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন: কায়কোবাদ-নজরুল সাক্ষাতকার।

২১. এ কে এম আমিনুল ইসলাম, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য (ঢাকা: বুক স্টল, ১৯৬৯ খ্রি.), ২য় সংস্করণ।

২২. কাজী দীন মুহাম্মদ, সাহিত্য সম্ভার (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫ খ্রি.)

২৩. কায়কোবাদ, কবির কথা, ইসলামিয়া কলেজ ম্যাগাজিন (কলকাতা: ইসলামিয়া কলেজ, ১৯৩৮)।

২৪. কায়কোবাদ, প্রেমের রাণী (উৎসর্গপত্র অংশ) (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

২৫. কায়কোবাদ, ভূমিকা (২য় সং), শিব মন্দির, তৃতীয় সংস্করণ, (ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন)।

২৬. কায়কোবাদ, শ্মশান-ভস্মের ভূমিকাংশ (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ২য় সংস্করণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

২৭. কায়কোবাদ, প্রেম-পারিজাত, ভূমিকাংশ (ঢাকা: পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) ১ম সংস্করণ।

২৮. কায়কোবাদ, গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জের ভূমিকা (ঢাকা: আবুল হেনা সাদউদ্দীন, ১৯৭৯)।

২৯. কায়কোবাদ, কাব্য-কবি ও সমালোচক, সম্পা. এম এ মজিদ, মহাকবি কায়কোবাদ ও তাঁর অশ্রুমালা।

৩০. দেওয়ান আবদুল হামিদ, আবদুস সাত্তার (সম্পাদিত), ছোটদের জীবনীগ্রন্থ' (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ)।

৩১. ফাতেমা কাওসার, কায়কোবাদ: কবি ও কবিতা (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮ খ্রি.)।

৩২. বদিউর রহমান, সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, তা. বি.)।

৩৩. বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, তা, বি.)।

৩৪. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মহাকবি কায়কোবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, ২৫ জুলাই, ১৯৬৬ খ্রি.।

৩৫. মুফতী মুহাম্মদ শফী, পবিত্র কুরআনুল কারীম, অনু.ও সম্পা. মুহিউদ্দিন খান (মদীনা মেনাওয়ারা:খাদেমুল-হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্দ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, তা,বি.)

৩৬. মুহাম্মদ ফজলুর রহ্মন, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.)।

৩৭. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, চরিত্র গঠনের উপায়, ৩য় সং, (ঢাকা: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স, ২০১৮ খ্রি.)।

৩৮. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম (কায়রো: দারুইয়াহ ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.)।

৩৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.)।

৪০. মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা সমকালের দর্পণে (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯১ খ্রি.)।

৪১. শামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন (সম্পাদিত), চরিতাভিধান, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রি.)।

৪২. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), খ. ৭।

৪৩. সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.), খ. ৯।

৪৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১ খ্রি.), ২য় সংস্করণ, খ. ৩।

৪৫. সুকুমার সেন, বঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা: ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ), ৩য় সংস্করণ, খ. ২।

৪৬. সৈয়দ আলি আহসান, সতত স্বাগত (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩ খ্রি.)।

পত্রিকা ও জার্নাল

৪৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, বর্ষ: ২৩, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪।

৪৮. সওগাত, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

৪৯. মাসিক মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫০. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫১. ইসলামিয়া কলেজ ম্যাগাজিন (কলকাতা: ইসলামিয়া কলেজ, ১৯৩৮)।

৫২. মাসিক মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫৩. নবনূর, ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।

৫৪. সাহিত্যিক, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

৫৫. বঙ্গবাণী, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩২ বঙ্গাব্দ।

৫৬. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫৭. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৫১ খ্রি./ ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫৮. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৫৯. মাহে নও, তৃতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৬০. মাসিক মোহাম্মদী, মঈনুদ্দীন, মহাকবি কায়কোবাদ সম্পর্কে দু'টি কথা।

৬১. মাসিক মোহাম্মদী, কায়কোবাদ সম্বর্ধনা, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ।

৬২. মাসিক মোহাম্মদী, ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

৬৩. মাসিক মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৬৪. মাসিক মোহাম্মদী, ১৩শ বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

৬৫. মাসিক মোহাম্মদী, মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, মহাশ্মশানের কবিকে, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৬৬. মাহে নও, ৩য় বর্য়, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৬৭. সওগাত, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩২৬।

৬৮. মাসিক মোহাম্মদী, ২২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

৬৯. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বার্ষিকী, ১৬শ সংখ্যা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

৭০. নবনূর, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

৭১. মাসিক মোহাম্মদী, ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

৭২. ঢাকা গেজেট, ২৮ চৈত্র, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।

৭৩. নবনুর, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১১ বঙ্গাব্দ।